আধুনিক মৌখিক বাংলা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

[নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য]

লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য এম. এ., বি. টি.

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক, মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন (মেন),
কলিকাতা। আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা দীপিকা,
মৌখিক বাংলা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

জগদীশচন্দ্র বসু বি. এ. (অনার্স) ; বি. টি.

শিক্ষক, নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ, কোন্নগর ; প্রাক্তন শিক্ষক, মথুরানাথ জগদীশ
বিদ্যাপীঠ কলিকাতা। আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা,
মধ্যশিক্ষা বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা দ্বিতীয় পত্র,
আধুনিক ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

অলকা ভট্টাচার্য এম. এ., বি. টি., সাহিত্য ভারতী

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষিকা, সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয় ও শিল্পশিক্ষা
সদন, কলিকাতা। সাহিত্য কণিকা, মৌখিক বাংলা প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা।

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৭-সি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নিবেদন

গ্রন্থারম্ভের সূচনায় ভূমিকা লেখার একটা রেওয়াজ আছে। শুধুমাত্র সেই রীতির অনুগামী হয়ে নয়, বর্তমান গ্রন্থটির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যর কথা স্মরণ রেখেই দু'একটি কথা বলতে বসেছি।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক প্রবর্তিত বাংলার নতুন পাঠ্যক্রমে (syllabus) ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং এই নতুন বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করবার জন্য আমরা এই পুস্তক রচনায় ব্রতী হয়েছি।

শিক্ষাবিদ্‌গণ গবেষণা করে দেখেছেন, ছাত্র-ছাত্রীর জ্ঞান এবং বুদ্ধির সঠিক পরিমাপ করতে গেলে একমাত্র লিখিত পরীক্ষাই যথেষ্ট নয়। লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি মৌখিক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্তিও প্রয়োজন। অধীত বিষয়ের ওপর ছাত্র-ছাত্রীদের সত্যিকারের জ্ঞান কতটুকু জন্মালো, পড়া জিনিসের কতোটাই বা তারা আত্মস্থ করতে পারলো তার বিচার হতে পারে একমাত্র মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। ছাড়া মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের ফলে পরীক্ষার হলে 'দেখে দেখে লেখা'র প্রবণতা যে শুধু কমবে তা নয়, অপরের লেখা মুখস্থ করবার ভয়াবহ প্রবণতাও লুপ্ত হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'না বুঝে বই মুখস্থ করে পাস করা কি চুরি করে পাস করা নয়? পরীক্ষাগারে বইখানা চাদরের মধ্যে নিয়ে গেলেই চুরি আর মগজের মধ্যে নিয়ে গেলে তাকে কী বলব?' এই মন্তব্য স্মরণযোগ্য।

ভারত গণতান্ত্রিক দেশ; সমাজতন্ত্রে উত্তরণের দিকে এদেশ এগিয়ে চলেছে। অতএব এমন একটি দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকরা যাতে কর্মে, মননে ও ব্যক্তিত্বে দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে পারে, যাতে তারা কর্মজীবনে যে কোনও বিষয়ে উদ্যোগ ও নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে, সেদিকে চিন্তা করেই মৌখিক বিষয়কে (আবৃত্তি, পাঠ, বিতর্ক অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে আলোচনা, সাধারণ আলোচনা, কথোপকথন, প্রভৃতি) সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সিলেবাসে কর্মশিক্ষাকে (Work Education) আবশ্যিক করা হয়েছে। মৌখিক বাংলার সিলেবাস্-কর্তারা কর্মশিক্ষার কথা মনে রেখেই মৌখিক বাংলার এই সিলেবাস তৈরী করেছেন। বিদ্যালয়ে নানাপ্রকার উৎসব সারা বৎসর অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সেগুলোর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করে থাকে। সিলেবাস্ কর্তাদের ইচ্ছা যে, এইসব অনুষ্ঠানে কোন না কোন উপায়ে ছাত্ররাই মুখ্য অংশ গ্রহণ করুক।

আমরা উল্লিখিত বিষয় মনে রেখে এই পুস্তকটি রচনা করেছি। শুধু যান্ত্রিক ভাবে কিছু কবিতা, কিছু পদ্যাংশ, কিছু নাট্যাংশ, কয়েকটি আলোচনা, কিছু কথোপকথন, কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েই আমাদের কর্তব্য শেষ করিনি; সিলেবাসের উদ্দেশ্যকে স্মরণ রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের উপরিউক্ত বিভিন্ন বিষয়ে কর্মমুখর করে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়েছি। তাদের আমরা বিভিন্ন বিষয়ের কর্ম-কেন্দ্রে স্থাপন করার চেষ্টা করেছি। ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের বইটি পড়ে নিজেরাই কবিতা আবৃত্তি, নাটক ও গদ্য পাঠ, বিতর্ক, আলোচনা প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে এবং বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।

মৌখিক বাংলার নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে বইটি লিখেছি। কিন্তু পাঠ্যক্রমে কেবলমাত্র বিষয়ের নামোল্লেখ আছে, কোনরূপ ব্যাখ্যা নেই। বিস্তৃত পরিসর না থাকায় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও মৌখিক বাংলা ঠিক কি পদ্ধতিতে পড়াবেন সে সম্বন্ধে সংশয়াম্বিত। সুতরাং ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের কথা ভেবেই আমরা এই পুস্তক রচনায় ব্রতী হয়েছি আমরা বিশ্বাস করি যে, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও এই বইটির সাহায্যে অনায়াসে ছাত্রছাত্রীদের সিলেবাসের বিষয় অনুসারে বাংলা মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হবেন।

এদুটি দিক থেকে বিচার করলে আমাদের বইটিকে এই বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক বলে দাবি করা যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সিলেবাস্-কর্তারা নবম ও দশম শ্রেণীতে মৌখিক বাংলায় বাংলা প্রথম পত্রের সঙ্গে ২০ নম্বর ও দ্বিতীয় পত্রের সঙ্গে ২০ নম্বর মোট ৪০ নম্বর বরাদ্দ করেছেন; কিন্তু তাঁরা মৌখিক বাংলা সিলেবাসে ১ম ও ২য় পত্র অনুসারে বিভক্ত করে দেন নি। এতে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ খুব অসুবিধা বোধ করছেন। এবং বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী স্বয়ং পত্র-বিভাগ করেছেন।

বোর্ডের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত বা প্রথম স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার প্রশ্ন করার পদ্ধতি না দেখে এই বিষয়ে কিছু বলা সঙ্গত নয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে মৌখিক পরীক্ষার বিচার পদ্ধতি যেন যথাযথ হয়।

আর একটি কথা বলার আছে। আমাদের বইটি নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য লিখিত। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রকাশিত পাঠ্যক্রমে (syllabus) নবম ও দশম শ্রেণীর মৌখিকের পাঠ্যক্রম একসঙ্গে দেওয়া আছে। অর্থাৎ মৌখিক পাঠ্যক্রমের কোন্ অংশ নবম শ্রেণীতে পড়াতে হবে এবং কোন্ অংশ দশম শ্রেণীতে পড়াতে হবে, পাঠ্যক্রমে তার কোন উল্লেখ নেই। ফলতঃ কোন বিদ্যালয় ইচ্ছা করলে পাঠ্যক্রমের কিছু অংশ নবম শ্রেণীতে এবং কিছু অংশ দশম শ্রেণীতে পড়াতে পারে। আবার কোন বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের প্রতিটি বিষয়েরই কিছু অংশ নবম ও কিছু অংশ দশম শ্রেণীতে পড়াতে পারে। সুতরাং নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য দুটি স্বতন্ত্র পুস্তক নির্বাচন স্কুল এবং ছাত্রছাত্রী উভয়ের পক্ষেই অসুবিধাজনক; তাছাড়া সেক্ষেত্রে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশও লঙ্ঘন করা হয়। এই সমস্ত দিক চিন্তা করে আমাদের মনে হয়েছে নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য মৌখিক বাংলার একটি বই হওয়া উচিত।

বইটির অপর একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। কেবলমাত্র পাঠ্যক্রমের আলোচনা ও ব্যাখ্যা নয়, ছাত্র-ছাত্রীরা আলোচ্য বই থেকে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ করবে।

এই পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা অধ্যক্ষ শ্রীসুধাংশু-শেখর ভট্টাচার্য আমাদের অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন বলেই আলোচ্য পুস্তকটি প্রকাশ করা সম্ভব হল। তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

আশা করি, পুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রী-মহলে সাদরে গৃহীত হবে।

বিনীত

গ্রন্থকারগণ

॥ বিষয় সূচী ॥

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

সহায়ক পাঠ-সংক্রান্ত বিশেষ প্রশ্নোত্তর

মৌখিক বাংলার সিলেবাস্

(নবম-দশম শ্রেণী)

কবিতা, নাট্যাংশ ও গদ্যের আবৃত্তি ও পাঠ, বিতর্ক, আলোচনা, কথোপকথন, প্রশ্নোত্তর এবং সহায়ক পাঠ, (গদ্য এবং কবিতা) হইতে প্রশ্নোত্তর।

পরীক্ষকমণ্ডলীর সুবিধার্থে বাংলা মৌখিক পরীক্ষার অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের বিচার পদ্ধতির একটি সাধারণ নির্দেশন নিচে দেওয়া হল ঃ
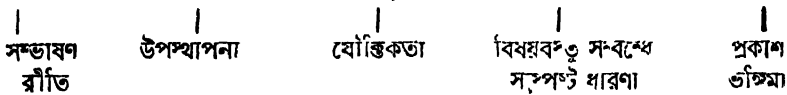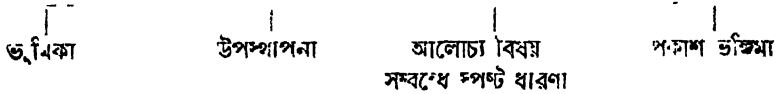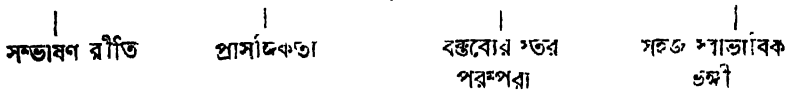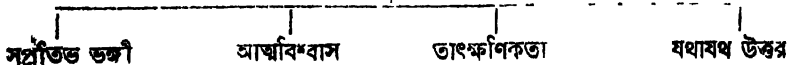
আধুনিক মৌখিক বাংলা

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

॥ কবিতা ॥

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের একটি বাণীতে বলা হয়েছে ঃ

যদি জোটে মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি।
দুটি যদি জোটে তার একটিতে
ফুল কিনে নিও, হে অনুরাগী।। (অনুবাদ ঃ সত্যেন্দ্রনাথ)

জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন সর্বাগ্রে—এ তো সত্যি কথা, কিন্তু এই জৈব প্রয়োজন পূর্ণ হলেই মনুষ্যত্ব তৃপ্ত হয় না। মানুষের যেহেতু সৌন্দর্য-তৃষ্ণা এবং বিশুদ্ধতর কামনা-বাসনা আছে, তাই সে নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ করতে চায়—প্রকাশিত হতে দেখতে চায়। সৃষ্টির আদিম যুগে মানুষ ইংগিতে-আভাসে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছে, কারণ তখনো ভাষার জন্ম হয়নি। তারপর গুহা-মানব অর্থাৎ আদিম মানুষ গুহাতে, শিলালিপিতে বিভিন্নভাবে তার মনোভাব খোদিত করেছে। আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়ে স্থায়িত্বদান করতে এই ভাবেই সে ধীরে ধীরে শিখেছে।

তারপর ভাষার জন্ম হয়েছে—সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্য। পরে এসেও সাহিত্য যে প্রাধান্য পেয়েছে তার কারণ, একমাত্র সাহিত্যেই সমস্ত মানুষকে পাওয়া যায়। মানুষের প্রবাহ তো থেমে নেই। কিন্তু সংগীত, চিত্র, দর্শন কিংবা বিজ্ঞান মানুষের এই প্রবাহকে ধরে রাখতে পারে নি, পেরেছে সাহিত্য। সাহিত্যই মানুষের সমস্ত সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা তার সমস্ত জীবন এক কথায় এই বিরাট পৃথিবীতে যা কিছু মানুষের জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত, সব কিছুকে ধরে রেখেছে। এই ভাবে মানুষের হৃদয় ও সৌন্দর্য-চর্চার সার্থক বাহন হয়ে উঠেছে সাহিত্য। সাহিত্য পাঠ করার পর তাই আমরা দেখি, সাহিত্যের ঐ প্রকাশে আমাদের ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং সর্বোপরি হৃদয় কতটুকু পরিতৃপ্ত হলো, কতখানি আনন্দ পেলাম। এই আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।

'সাহিত্য' এই শব্দটি 'সহিত' শব্দ থেকে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সাহিত্য অর্থেই একত্র থাকিবার ভাব—মানবকে স্পর্শ করা, মানবকে অনুভব করা'। সাহিত্যই সেই যোগসূত্র, যার সাহায্যে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগসাধন হয়।

পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষার মতো বাংলা সাহিত্যেও কবিতাকে আশ্রয় করেই সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়। তারপর নাটক, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি রচিত হতে থাকে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কবিতার আবেদন সর্বজনীন। এর কারণ কবিতার ভাষা প্রধানতঃ আবেগের ভাষা—যুক্তির ভাষা নয়।

।। কবিতা কাকে বলে ।।

যথোপযুক্ত শব্দ অনিবার্য বাণী-মূর্তিতে বিন্যস্ত হলে কবিতা* হয়ে ওঠে। কবি যখন কবিতা লিখতে বসেন, তখন তাঁর মনে অজস্র শব্দ ভিড় করে আসে। সেই শব্দ প্রাচুর্য হতে ভাবানুযায়ী সঠিক শব্দটি চয়ন করেন তিনি—রসাত্মক ছন্দোময় বাণী-মূর্তিতে ঐ শব্দগুলি বিন্যস্ত করেন; তারপর ঐ বস্তু-উপাদানের ওপর কল্পনার দীপ্ত প্রতিফলিত হলেই তা' কবিতার রূপ গ্রহণ করে।

অন্যদিক থেকে বলা চলে, বহির্জগতের রূপ রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ বা নিজের মনের ভাবনা-কল্পনা লেখকের অনুভূতির রঙে রাঙা হয়ে ছন্দোবদ্ধ বাণী-শ্রী লাভ করলে তাকে আমরা কবিতা বলি। রবীন্দ্রনাথ কবিতার জন্ম-কথা এবং উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন—

> অন্তর হতে আহরি বচন,
> আনন্দ লোক করি বিরচন
> গীতরসধারা করি সিঞ্চন
> সংসার ধূলিজালে ....

এইভাবে যে কবিতার সৃষ্টি হয়, সেই কবিতা পাঠ করে কবি-প্রাণের 'আনন্দ-বিষাদ, আশা উৎসাহ, বিস্ময়-কৌতুক' পাঠক মনেও সঞ্চারিত হয়। কবিমনের অনুভূতি সার্থকভাবে কোন কবিতায় প্রকাশ পেয়ে পাঠকের প্রাণে ঢেউ তুললে, তা উৎকৃষ্ট কবিতা বলে বিবেচিত হয়।

গল্পপাঠের যে উদ্দেশ্য, কবিতা পাঠের উদ্দেশ্য তা থেকে ভিন্নতর। এই কারণে কবিতা পড়বার নিয়মও স্বতন্ত্র। কবিতা কেমন করে পড়তে হয় সেই বিষয়ে বিখ্যাত কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর মতামত স্মরণযোগ্য ঃ

আমরা গল্প যে উদ্দেশ্যে পড়ি, কবিতা সে উদ্দেশ্যে পড়ি না; এজন্য কবিতা পড়বার নিয়মও স্বতন্ত্র।

প্রথমতঃ, ছন্দ রয়েছে বলে কবিতা আবৃত্তি করে পড়তে হয়। কবিতার ভাব-অর্থ বোঝবার আগে তাকে কানে শুনতে হবে। আবৃত্তি কানে শুনতে শুনতেই কবিতার

* কবিতার কয়েকটি বিখ্যাত সংজ্ঞা :

(১) Best words in the best order.—Coleridge.

(২) Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings; it takes its origin from emotion recollected in tranquillity.—Wordsworth.

(৩) শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যং

ভাবটি মনের মধ্যে প্রবেশ করে—অন্ততঃ কবিতাটির ভাব-অর্থ বোঝবার মত অবস্থা ঐ ভাষার আওয়াজ শুনেই মনের মধ্যে জাগে। অবশ্য কবিতা আবৃত্তি করতে যে ভাল লাগে তার কারণ কেবল ছন্দই নয়—শব্দের ধ্বনিগুণে ছন্দ আরও মধুর হয়ে ওঠে। অতএব, কবিতা ভাল করে পড়তে হবে। এখানে ভাল করে পড়ার নামই—ভাল করে বোঝা। কারণ, কবিতার ভাবটাই আসল; অর্থ বা শিক্ষার বিষয় যতই তাতে থাকুক—তার মূলে যে ভাবটি আছে সেই ভাবটি আমাদের প্রাণে সঞ্চারিত হওয়া চাই। এজন্য শুধু অর্থ নয়—কথার সৌন্দর্যও বুঝতে পারা চাই।

কথার সৌন্দর্য যে কত বিভিন্ন রকমের হতে পারে, তা কবিতা ভাল করে পড়লেই আমরা বুঝতে পারি। কবিরা শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে ভীষণ সাবধানী, কারণ, ছন্দের সঙ্গে মিলে শব্দের আওয়াজটি মধুর হওয়া চাই; আবার এক একটি কথাতেই, যা সাধারণতঃ অল্প থাকে, ভাবটি খুব যথার্থ ও সুন্দরভাবে প্রকাশিত হওয়া চাই: কথা যত অল্প হয় তার ভাব তত গভীর হয়ে থাকে। অতএব গদ্য পড়বার সময় ভাষার যে দিকটাতে লক্ষ্য রাখতে হয়, কবিতা পড়বার সময় ঠিক সে দিকে না—আর একদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে; কথার কেবল অর্থ নয়, তার ধ্বনির সৌন্দর্য এবং তাদের অপূর্বতা আরও ভাল করে অন্তরে গেঁথে নিতে হয়। ছাত্রছাত্রীদের মনে রাখতে হবে, কবিতা পড়বার সময় প্রথমেই কথার অর্থের জন্য অভিধান দেখা উচিত নয়—আগে যে সমস্ত কথাটি, যে লাইন বা লাইনগুলো পড়বামাত্র ভাল লেগেছে, তখনই সেগুলোকে পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে; পরে ভাল লাগবার কারণ খুঁজে দেখাও একান্ত উচিত। তাহলে দেখা যাবে শব্দের পাশে আর একটি শব্দ যেভাবে বসেছে যে, তাতেই কথাগুলো শুনতে যেমন মিষ্টি, অর্থও তেমনি সুন্দর হয়েছে; হয়ত বা কথাটি একটি নতুন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—তাতেই এমন মনে লাগছে।

এমনি করে কবিতার ভাষা ও ভাব—দুইয়েরই সৌন্দর্য বুঝে নতুন ও সুন্দর কথাগুলো কণ্ঠস্থ করতে হবে। যে লাইনগুলো খুব ভাল লেগেছে তাও স্মরণে রাখা উচিত। কবিতাটির মূল ভাব ছাত্রছাত্রীরা তাদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী যতটুকু বুঝতে পারবে, আপাততঃ তাই যথেষ্ট; তারপর আবশ্যক হলে কৌতূহলী মন শিক্ষক মহাশয়ের কাছে আরও স্পষ্ট করে বুঝে নেবে।

।। কাব্যপাঠে আবৃত্তির স্থান কোথায় ।।

কবিতার রস উপভোগ করবার জন্য আবৃত্তির প্রয়োজন আছে। বস্তুতঃ আবৃত্তি হচ্ছে একটি বিশেষ ভঙ্গীময় সরব পঠন। কবিতা সরবেও পাঠ করা যায়, নীরবেও পাঠ করা যায়। কিন্তু আবৃত্তি সর্বদাই সরব পাঠ। পঠন যে জাতীয়ই হোক, তার কৌশল পাঠককে অর্জন করে নিতে হয়। নানারকম দৈহিক এবং মানসিক ক্রিয়ার সাহায্যে এই পঠন-শক্তির সৃষ্টি হয়।

আমরা বলেছি, কবিতাকে ভালো ভাবে অনুভব করতে হলে আবৃত্তির প্রয়োজন আছে। নীরবে পাঠ করে বা যুক্তি দিয়ে কবিতার ব্যাখ্যা করে, কবিতার অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু রসস্বাদনা অর্থাৎ 'কবি কি বলতে চাইছেন' বা কবির মনোভাব বোঝা সম্পূর্ণই অনুভূতির ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'কবিতা বোঝবার নয়,

বাজবার।' আবৃত্তির সরব ধ্বনি কবির মনের আবেগকে পাঠকের মনে পৌঁছে দেয়—এর ফলে পাঠকের হৃদয় ধীরে ধীরে কবির অন্তরের স্পর্শ পেতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, অখণ্ডতা কাব্যরস আস্বাদন করবার অন্যতম উপায়। যুক্তি বিশ্লেষণে এর হানি ঘটে। আবৃত্তির মধ্য দিয়ে এই অখণ্ডতা তথা কবিতাটির সামগ্রিক আবেদন পাঠকের কাছে ধরা পড়ে। ফুলকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে উদ্ভিদ বিদ্যার জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্যের আবিষ্কার করা যায় না।

তৃতীয়তঃ, কবিতা পাঠ করে কল্পনায় আমরা কবির সঙ্গে এক হয়ে যেতে চাই কবি ও পাঠকের এই মিলনেই কাব্যসৃষ্টির যথার্থ মূল্য। বলাবাহুল্য, যথাযথ সরব পাঠ তথা আবৃত্তি এই যোগাযোগে সাহায্য করে।

সর্বশেষে ছন্দের কথা। ছন্দকে আশ্রয় করে কবিতা অনেকখানিই দাঁড়িয়ে থাকে। সৃষ্টির শুরু থেকেই ছন্দের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ লক্ষ্য করি। এই ছন্দ কবিতা-দেহের প্রধান ধর্ম। বাংলা-সাহিত্যের অধিকাংশ কবিতার গতি-প্রবাহ ছন্দকে আশ্রয় করেই মুখর হয়ে উঠেছে। ছন্দের যে লীলাময় তরঙ্গধ্বনি নৃত্যমুখী ভঙ্গিতে আমাদের শ্রুতিকে আনন্দ দান করে, একমাত্র সরব আবৃত্তির মধ্য দিয়েই তার আস্বাদন আমরা পেতে পারি।

এই সমস্ত কারণে কাব্যরস আস্বাদনে আবৃত্তির মূল্য অতুলনীয় বলে মনে করা হয়েছে। সার্থকভাবে আবৃত্তি করতে পারলে কবিতার ভাব অনেকখানিই পাঠকের মনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

॥ আবৃত্তি করবো কি ভাবে ॥

সার্থক আবৃত্তির দুটি দিক আছে। একটি তার (ক) বহিরঙ্গ দিক, অন্যটি (খ) অন্তরঙ্গ দিক। বহিরঙ্গ দিকের মধ্যে পড়ছে, যে আবৃত্তি করছে তার উপস্থিতি (appearance), আর অন্তরঙ্গ দিকের মধ্যে রয়েছে কি ভাবে সে কবিতাটিকে তুলে ধরছে।

(ক) প্রথমে আমরা বহিরঙ্গ দিকটি নিয়ে আলোচনা করবো। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথমে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, যে আবৃত্তি করতে আসছে—তার উপস্থিতি। স্থির ভাবে ঋজু ভঙ্গীতে আবৃত্তি করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে; এসে সহজ ভাবে দাঁড়িয়ে হাত দুটি দুপাশে স্বাভাবিক ভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। দর্শক তথা শ্রোতাদের নমস্কার করে কবিতার এবং কবির নাম উচ্চারণ করে আবৃত্তি শুরু করতে হবে।

(খ) এরপর আবৃত্তির অন্তরঙ্গ দিক—কি ভাবে সরবে পাঠ করে আবৃত্তির মধ্য দিয়ে কবির মনোভাবকে তুলে ধরতে পারা যায় তারই আলোচনা।

আবৃত্তিযোগ্য কবিতাটি প্রথমেই বারবার পাঠ করতে হবে। এই পাঠ এমন ভাবে করতে হবে যেন নিজের কানে শব্দগুলো পৌঁছয়। পড়তে পড়তে মুখস্থ হয়ে যাবে অনেকটা। এই সুস্পষ্ট পাঠ আবৃত্তির পক্ষে প্রথম প্রয়োজনীয় বস্তু। এর পর লক্ষ্য করতে হবে প্রতিটি শব্দ আমাদের জানা আছে কিনা। শব্দসমূহ এবং তার অর্থের সঙ্গে পরিচিত হলে ভালো আবৃত্তি করা যাবে। প্রতি শব্দেরই বিশিষ্ট উচ্চারণ ভঙ্গী আছে। বিশুদ্ধ ভাবে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করলে শ্রোতাদের কাছে কবিতাটিকে অনেকটা স্পষ্ট করে দেওয়া হবে।

হয়তো সাময়িক ভাবে বিমুগ্ধ করা যায়, কিন্তু কবিতার মূল অর্থ তাদের কাছে তুলে ধরা যায় না। সুতরাং এই পদ্ধতিও পরিত্যাজ্য।

॥ ছন্দ ॥

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, সাধারণ কথাকে ছন্দ অনেকটা চিরন্তনতা দান করে বস্তুতঃ কথাবস্তু এবং ছন্দের ঘনিষ্ঠ সমন্বয়েই সার্থক কবিতা হতে পারে।

ছন্দ কথাটির ব্যাপক অর্থ 'গতিসৌন্দর্য'। আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ অর্থ 'ভাষাগত ধ্বনিসৌন্দর্য', 'একটি পূর্ণ ধ্বনি প্রবাহের সুসমঞ্জস ও তরঙ্গায়িত ভঙ্গি।' এক কথায় বলা চলে, ছন্দ হচ্ছে পরিমিত পদবিন্যাস, যাহার গুণে বাক্যের সঙ্গে বাক্যের বন্ধন সঙ্গীত-মধুর ও তরঙ্গঝংকৃত হইয়া উঠে।'

'যে কোন কবিতার ছন্দসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে চরণকে আশ্রয় করিয়া একটি পূর্ণ ধ্বনি প্রবাহ আত্মপ্রকাশ করে। এই ধ্বনি প্রবাহকে তরঙ্গায়িত করিয়া তোলে কয়েকটি পর্ব এবং এই পর্বগুলির সামঞ্জস্য বিধায়ক হইতেছে নির্দিষ্ট পরিমাণের মাত্রা। ছন্দের আলোচনা মুখ্যত কবিতার চরণ-অন্তর্গত বিভিন্ন বাক্যাংশের ঐক্যসূত্রেরই আলোচনা।'

ছন্দের আলোচনায় কয়েকটি বিশেষ ধরনের শব্দ (Term) ব্যবহার করা হয়। ঐ সমস্ত শব্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে দেওয়া হলো।

(ক) **অক্ষর**—বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাকে অক্ষর বলে। অক্ষর এবং বর্ণের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন—'মহাভারত' এই শব্দটিতে বর্ণ আছে দশটি—ম্ + অ + হ্ + আ + ভ্ + আ + র্ + অ + ত + অ। কিন্তু অক্ষর চারটি—ম + হা + ভা + রত্। অক্ষর দুই জাতীয়ঃ স্বরান্ত ও হলন্ত। ওপরের উদাহরণে ম, হা, ভা স্বরান্ত অক্ষর, কিন্তু রত্ হলন্ত বা ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর।

(খ) **মাত্রা**—বাংলা কবিতার ছন্দে মাত্রার হিসাব অত্যন্ত জরুরী। কারণ বাংলা কবিতার চরণ-অন্তর্গত পর্বসমূহ নির্দিষ্ট মাত্রার উপাদানেই গঠিত। পরিমিত মাত্রা দিয়ে যদি পর্ব গঠন না করা হয় তবে ছন্দপতন ঘটে। মাত্রা শব্দটির মূল অর্থ কাল পরিমাণ।। অক্ষর উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে, তাই অনুসরণ করে মাত্রা স্থির করা হয়। বাংলা কবিতার ছন্দের প্রকৃতি বা ঢঙ্ অনুসারে মাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়। পরিমিত মাত্রার পর্বসমন্বিত চরণ বাংলা ছন্দের একটি মূল বৈশিষ্ট্য।

(গ) **ছেদ**—ধ্বনিগত সমগ্র অংশ বা অর্থাংশ প্রকাশের প্রয়োজনে ধ্বনি প্রবাহে যে উচ্চারণ বিরতি আবশ্যক হয় তার নাম ছেদ।

(ঘ) **যতি**—যতির অর্থও উচ্চারণ বিরতি। কিন্তু যতি পড়ে এক একবারের ঝোঁকে চরণের যতখানি অংশ উচ্চারিত হয় সেই অনুযায়ী। এই সময় ধ্বনির প্রবাহ থাকে, তবুও তার মধ্যে জিহ্বা বিশ্রাম করে।*

---

* ছেদ ও যতির উদাহরণ—

ধনঞ্জয়* আনন্দাশ্রু* বর বরিষণ*।
তোমার* আমার* আজি / ভগ্নী সুভদ্রার /
সার্থক জীবন*। (নবীনচন্দ্র সেন)

এই উদাহরণটিতে * দিয়ে ছেদ এবং '/' চিহ্ন দিয়ে যতির অবস্থান দেখানো হয়েছে।

(ঙ) **পর্ব**—উপযতি-প্রধান খণ্ডিত ধ্বনিপ্রবাহকে পর্ব বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এক উপযতি পর্যন্ত একত্রিত শব্দসমষ্টিকে পর্ব বলে। কবিতা পড়ার সময় বাগ্‌যন্ত্রের এক ঝোঁকে যে সমস্ত শব্দ উচ্চারিত হয়, সেগুলির সমষ্টিই পর্ব।

যেমন, একটি চারমাত্রার পর্ব ঃ

রাত পোহালো/ফরসা হোলো/ফুটল কত/ফুল

(চ) **চরণ**—কয়েকটি পর্বের সমষ্টিকেই চরণ বলা হয়। পর্বানুযায়ী একটি চরণকে দুই, তিন বা চার ছত্রে সাজানো হতে পারে। কবিতার ছত্র অনুযায়ী চরণ হয় না, ভাবের পরিসমাপ্তি অনুযায়ী হয়। যেমন—মহাভারতের কথা / অমৃত সমান [দু পর্বের চরণ]।

(ছ) **স্তবক**—দুই বা দুয়ের বেশী চরণ সুশৃংখল ভাবে সন্নিবিষ্ট হলে স্তবক হয়।

(জ) **মিত্রাক্ষর**—যে ছন্দে পর পর বিভিন্ন চরণের শেষে অথবা চরণের পর্বে বা পর্বান্তে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির মিল ঘটে তাকে মিত্রাক্ষর বলে। যেমন ঃ

প্রথম শীতের মাসে
শিশির লাগিয়া ঘাসে
হু হু করে হাওয়া আসে ...

(ঝ) **অমিত্রাক্ষর ছন্দ**—'যে পয়ার বা মহাপয়ারের চরণের শেষে পূর্ণযতির সঙ্গে অর্থদ্যোতক ছেদের বা ভাবযতির মিত্রতা অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী নয়, সেই পয়ার বা মহাপয়ারকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলা হয়। এই ছন্দের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত ছন্দে মোটামুটি তিনটি শ্রেণী বা ঢঙ লক্ষ্য করা যায় ঃ

১। **ধ্বনিপ্রধান ছন্দ ঃ** এই ছন্দে পর্বগুলিতে প্রতিটি অক্ষরধ্বনিই প্রাধান্য লাভ করে। ঐ ধ্বনি থেকেই মাত্রা ঠিক করতে হয়। এর লয় বিলম্বিত—তার মানে পংক্তিগুলো টেনে টেনে পড়তে হয়। যেমন—

গাঁথিছ ছন্দ / দীর্ঘ হ্রস্ব
মাথা ও মুণ্ড / ছাই ও ভস্ম
মিলিবে কি তাহে / হস্তী অশ্ব
না মিলে শস্য / কণা

এই কবিতাংশটি দুই পর্বের ছয় মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দ।

২। **ছড়ার ছন্দ বা স্বরাঘাত প্রধান ছন্দ ঃ** এই ছন্দে প্রত্যেক চরণে প্রত্যেক পর্বের প্রথমে একটি প্রবল স্বরাঘাত অর্থাৎ জোর পড়ে। এর লয় দ্রুত যেমন—

বর এসেছে / বীরের ছাঁদে / বিয়ের লগ্ন / আটটা
পেতল আঁটা / লাঠি কাঁধে / গালেতে গাল / পাট্টা

৩। **তানপ্রধান ছন্দ ঃ** তানপ্রধান ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তান বা টানা সুরের একটা প্রবাহ থাকে। এই ছন্দের মধ্যেই রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ইত্যাদি ছন্দ। এর লয় ধীর। যেমন—

গগনে গরজে মেঘ / ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি / নাহি ভরসা

খুবই সংক্ষিপ্ত ভাবে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। মনে রাখা দরকার কবিতা পাঠে আবৃত্তি প্রসঙ্গে ছন্দের বোধ নিঃসন্দেহে জরুরী। মধুসূদনের কবিতা কি করে পড়তে হয় জানতেন না বলে, কিংবা রবীন্দ্রনাথের নতুন ছন্দ ধরতে পারেন নি বলেই সেই সেই কালে উভয়কে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল। সুতরাং ছন্দ সজাগ রেখে কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি অভ্যাস করতেই হবে।

আবৃত্তি করবার সময় পূর্বলিখিত নিয়মগুলি যথাযথ ভাবে মেনে চলতে তো হবেই তা ছাড়া বিভিন্ন কবিতার ভাবানুযায়ী কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

এইবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবৃত্তিযোগ্য 'দুই বিঘা জমি' নামক বিখ্যাত কবিতাটির প্রতিটি শব্দ এবং পংক্তি বিশ্লেষণ করে কিভাবে আবৃত্তি করতে হবে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আবৃত্তি করতে হবে।
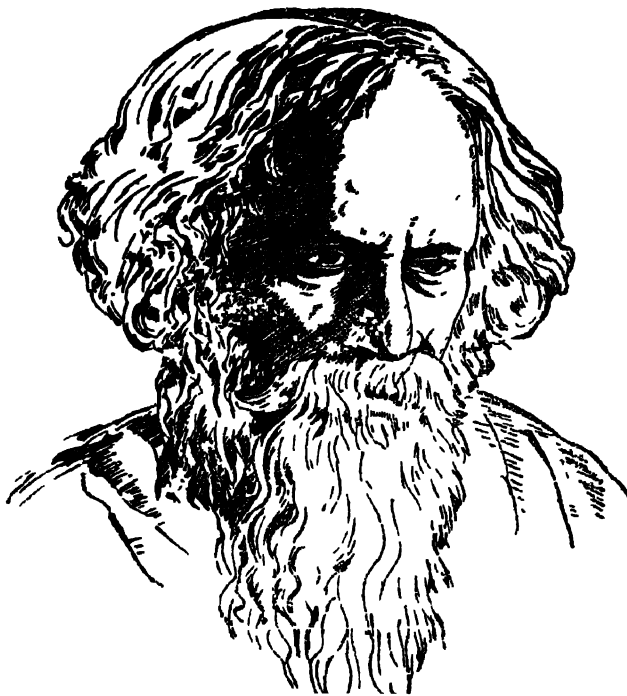
॥ দুই বিঘা জমি ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুধু বিঘে দুই / ছিল মোর ভুঁই, / আর সবি গেছে / ঋণে।
বাবু বলিলেন, / "বুঝেছ উপেন, / এ জমি লইব কিনে।"
কহিলাম আমি, / 'তুমি ভূস্বামী, / ভূমির অন্ত / নাই,
চেয়ে দেখো মোর / আছে বড়ো জোর / মরিবার মতো / ঠাঁই।"
শুনি রাজা কহে, "বাপু জান তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা—
ওটা দিতে হবে।" কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজলচক্ষে, "করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।
সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!"
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, "আচ্ছা সে দেখা যাবে।"

কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি   ক্ষুধাহরা সুধারাশি ;
যত হাস আজ, যত কর সাজ,   ছিলে দেবী, হলে দাসী ।*

বিদীর্ণ হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া   চারি দিক চেয়ে দেখি,
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে   সেই আমগাছ একি !
বসি তার তলে নয়নের জলে   শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে   বালক-কালের কথা ।
সেই মনে পড়ে, জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে   রাত্রে নাহিক ঘুম —
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি,   আম কুড়াবার ধুম ,
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর,   পাঠশালা-পলায়ন —
ভাবিলাম, হায়, আর কি কোথায়   ফিরে পাব সে জীবন ।
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস   শাখা দুলাইয়া গাছে ;
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল   আমার কোলের কাছে ।
ভাবিলাম মনে, বুঝি এতখনে   আমারে চিনিল মাতা
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে   বারেক ঠেকানু মাথা ॥

হেনকালে হায় যমদূতপ্রায়   কোথা হতে এল মালী,
ঝুঁটি বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে   পাড়িতে লাগিল গালি ।
কহিলাম তবে, "আমি তো নীরবে   দিয়েছি আমার সব,
দুটি ফল তার করি অধিকার,   এত তারি কলরব !"
চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধরে   কাঁধে তুলি লাঠিগাছ ;
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ সাথে   ধরিতেছিলেন মাছ ।
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন,   "মারিয়া করিব খুন !"
বাবু যত বলে পারিষদ দলে   বলে তার শতগুণ ।
আমি কহিলাম, "শুধু দুটি আম   ভিখ মাগি মহাশয় !"
বাবু কহে হেসে, "বেটা সাধুবেশে   পাকা চোর অতিশয় !"
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি,   এই ছিল মোর ঘটে '
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ,   আমি আজ চোর বটে ॥

প্রথমেই আবৃত্তির প্রস্তুতি হিসাবে যা যা করণীয় তা করতে হবে (যথা সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে মুখস্থ)। তারপর কবিতাটির মূল অর্থ বুঝতে হবে।

'দুই বিঘা জমি' কাহিনীধর্মী কবিতা। এতে গল্পরসও আছে, ভাবরসও আছে, আরো রয়েছে নাট্যরস। ধূর্ত জমিদার কেমন ভাবে দরিদ্র প্রজাকে উৎপীড়ন করে তাকে বাস্তুচ্যুত করেছে তার করুণ কাহিনী এখানে পাওয়া যাবে। অন্যদিকে বাঙালীর বাস্তুপ্রীতি এবং সেই প্রসঙ্গে জন্মভূমির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও মমতা কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে। আবৃত্তি করবার সময় কণ্ঠই আমাদের একমাত্র আশ্রয়।

* এই স্তবকটি পাঠসংকলনে (১ম খণ্ড) বর্জন করা হয়েছে ।

দুঃসহ হয়ে উঠেছিল, উপেন ফিরে এসে দেখল সেই বাস্তুজননী আজ ফুলে-ফলে গরবিণী। সম্পূর্ণ স্তবকটিতেই উপেনের কণ্ঠে এই ধিক্কার ফুটিয়ে তুলতে হবে।

পঞ্চম স্তবকেও প্রায় একই সুর। কেবল উপেনের মনে বাল্যকালের মধুময় স্মৃতি জেগে উঠেছে। বাহান্ন থেকে পঞ্চান্ন লাইনে ('একে একে মনে···ফিরে পাব সে জীবন') হৃদয় থেকে পুরনো স্মৃতি টেনে আনার ব্যাকুল ভাবটি (যাকে বলা হয় (nostalgia) তুলে ধরতে হবে। এই লাইনগুলোর মধ্যেই একদিকে বালক উপেনের দুরন্তপনা এবং অন্যদিকে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের ছাব আছে। আবৃত্তিকারকে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। সাতান্ন থেকে ষাট লাইনে ('সহসা বাতাস ··ঠেকানু মাথা') উপেনের কণ্ঠে বাস্তুভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতার ছোঁয়া যেন আভাসিত হয়।

শেষ স্তবকের প্রথমাংশে ('হেনকালে হায়···কলরব') কিছু নাটকীয়তা আছে। বিন্দুমাত্র অঙ্গসঞ্চালন না করে আবৃত্তিকার এই চিত্র তার কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলবে। বাষট্টি তেষট্টি লাইনে ('কহিলাম তবে ...কলরব') ফুটে উঠবে ধিক্কারজনিত বিস্ময়। চৌষট্টি লাইন দ্রুত ভঙ্গিতে পড়েই পরের লাইনে কিছুটা বিলম্বিত লয় আনতে হবে। একটু যেন ব্যঙ্গের ভাব ফুটে উঠবে তখন। পরবর্তী লাইনে বাবুর ক্রোধ ('মারিয়া করিব খুন') সাতষট্টি ও আটষট্টি লাইন ('আমি কহিলাম....চোর অতিশয়') অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে আবৃত্তি করতে হবে। উপেনের কণ্ঠের ('শুধু দুটি আম ভিখ্ মাগি মহাশয়') সংলাপটি, আবৃত্তির মধ্যে তার অতিরিক্ত বিনয় এবং Sentimental ভাব যেন আবৃত্তিকারের গলায় কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে ঝরে পড়ে। পরমুহূর্তে বাবুর উক্তির ('বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়') মধ্যেকার রূঢ় ভঙ্গীটি শ্রোতাদের হৃদয়ে পেঁছে দেওয়া চাই। উপেন এবং বাবু— এই দুটি চরিত্রের বিপরীতধর্মিতা যেন আবৃত্তিকারের কণ্ঠে ফুটে ওঠে।

এবার কবিতার শেষ দুটি লাইন। উপেন নিজের ভাগ্যবিপর্যয় দেখে এবং বাবুর সাধুতার ছদ্মবেশ দেখে একই সঙ্গে হেসেছে এবং কেঁদেছে। আবৃত্তিকার যখন বলবে, 'আমি শুনে হাসি, আঁখি জলে ভাসি'—তখন উপেনের ভাগ্য এবং মনোভাবের সঙ্গে তাকে এক হয়ে যেতে হবে—কণ্ঠে হাসি-কান্নায় দ্বৈত মিশ্রণে অসহায় ভাবটি ফুটে উঠবে। উপেনের শেষ উক্তির ('তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে') মধ্যে 'মহারাজ' বলার সময় আবৃত্তিকারের কণ্ঠে শ্লেষ ঝরে পড়বে। কবিতার এই শেষ দুটি লাইনে একই সঙ্গে কারুণ্য আর ব্যঙ্গ ফুটিয়ে তুলতে পারলে দর্শক তথা শ্রোতার মনে কবিতার মূল সুরটিকে পেঁছে দেওয়া যাবে।

'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি কিভাবে আবৃত্তি করতে হবে তা বিস্তৃতভাবে দেখিয়ে দেওয়া হল। এই ভাবে প্রতি শব্দে, প্রতি পংক্তিতে মনোযোগ দিয়ে এবং পংক্তিগুলির মূলভাব বুঝে আবৃত্তি করলে আবৃত্তি রসগ্রাহী হয়ে উঠবে।

॥ কবিতার প্রকারভেদ ॥

সমস্ত কবিতাই এক শ্রেণীর নয়। কবিতা বিভিন্ন প্রকারের। কোন কবিতায় কবি হয়তো কোন বস্তুর রূপ বর্ণনা করেছেন ; কোনটিতে এমন একটি চরিত্র বা

ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা আমাদের মনে বিস্ময়, প্রশংসা অথবা কৌতুকের ভাব জাগায়; কোনটিতে-বা একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকা হয়েছে। কেবল বাইরের সৌন্দর্যই নয়—সে দৃশ্য দেখে কবির অন্তরে যে বিশেষ ভাবটি জেগেছে, তা হয়তো ব্যক্ত হয়েছে কোন কবিতায়। কোন কবিতা পাঠ করে মানুষের জীবনে কোন মহৎ আদর্শের পরিচয় লাভ করে আমরা অনুপ্রাণিত হই। ন্যায়-অন্যায়, মঙ্গল-অমঙ্গল সম্বন্ধে কোন কবিতা আমাদের মনকে সজাগ করে, উপমা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ণ নানা উপদেশে আকীর্ণ কবিতাও আমরা পাঠ করে থাকি। উল্লিখিত নানা রকমের কবিতাকে আমরা নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করব :

(১) নিসর্গ বিষয়ক কবিতা,
(২) দেশাত্মবোধক কবিতা,
(৩) শ্রদ্ধাঞ্জলিমূলক কবিতা,
(৪) অধ্যাত্মচিন্তামূলক কবিতা,
(৫) অবহেলিত জনগণের স্বীকৃতিসূচক কবিতা,
(৬) ভক্তিমূলক কবিতা,
(৭) নীতি কবিতা,
(৮) হাস্যরসাত্মক কবিতা,
(৯) বিবিধ কবিতাবলী।

উল্লিখিত কবিতা-বিভাগ ছাত্রছাত্রীদের আবৃত্তির পাঠক্রমের দিকে দৃষ্টি রেখে করা হলো। পাঠ-সংকলন বইয়ে যে সব কবিতা আছে, সেগুলো এ বইয়ে পুনর্মুদ্রিত হলো না; প্রাসঙ্গিক স্থলে নাম উল্লেখ করা হলো মাত্র। উদাহৃত প্রতিটি কবিতার মূল ভাব, ছন্দ-বিভাগ এবং কিভাবে আবৃত্তি করতে হবে তা' কবিতার ওপরে লেখা থাকবে।

॥ নিসর্গ কবিতা ॥

॥ আষাঢ় ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা এবং গান বর্ষাকে অবলম্বন করে রচিত। নীচের কবিতায় বর্ষার একটি চিত্র অংকিত হয়েছে। পল্লীপ্রকৃতি এবং পল্লীজীবনের সৌন্দর্য এখানে সহজেই প্রস্ফুটিত। কবি ঘরের বাইরে যেতে প্রত্যেককে বারণ করছেন, আর যারা বাইরে আছে তাদের ঘরে ডাকছেন। কবিতাটিতে একদিকে যেমন বর্ষাপ্রকৃতি ধরা পড়েছে, তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কবির মমতা ও আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে।

কবিতাটি যে আবৃত্তি করবে তার কণ্ঠে এই আন্তরিকতা ও আকুল আবেদনের ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে হবে। কবিতাটির প্রতিটি পর্ব ছয় মাত্রার; ছন্দ ধ্বনিপ্রধান; লয়

বিলম্বিত। প্রতি পর্বের সমাপ্তিতে কণ্ঠস্বরকে যথাযথ বিশ্রাম দিয়ে কবির মনোভাবকে শ্রোতার কানে পৌঁছে দিতে হবে।।

নীল নবঘনে/আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর/নাহি রে।
ওগো, আজ তোরা/যাস নে ঘরের/বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউশের ক্ষেত/জলে ভরভর,
কালিমাখা মেঘে/ও পারে আঁধার/ঘনিয়েছে, দেখ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।।

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন, ধবলীরে আনো গোহালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি,
রাখাল বালক কী জানি কোথায় সারাদিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।।

শোনো শোনো ওই পারে যাবে বলে কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।
পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দু কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদর বেগে জলে পড়ি জল ছল ছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।।

ওগো, আজ তোরা যাস নে গো, তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর নাহি রে।
ঝরঝর ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘনঘন পথ পাশে দেখ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।।

॥ ঝরনা ॥

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিখ্যাত প্রকৃতি-কবিতা। তিন পর্বের ছ'মাত্রার ধ্বনি-প্রধান ছন্দে কবিতাটি রচিত। ঝরনার নৃত্যচপল ছন্দোময় ভঙ্গী এই ছন্দকে আশ্রয় করে সহজেই আবৃত্তিকারের কণ্ঠে উল্লসিত হয়ে উঠবে।]

ঝরনা! ঝরনা /সুন্দরী ঝর/না
তরলিত চন্/দ্রিকা! চন্দন/বর্ণা
অঞ্চল সিঞ্চ/চিত গৈরিক/স্বর্ণে
গিরি-মল্লিকা/দোলে কুন্তলে/কর্ণে,
তনু ভরি, যৌবন, তাপসী অ/পর্ণা।
ঝরনা!

পাষাণের স্নেহধারা! তুষারের বিন্দু!
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু।
মেঘ হানে জুঁইফুলী বৃষ্টি ও অঙ্গে,
চুমা-চুমকির হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধূলো-ভরা দ্যায় ধরা তোর লগি ধরণা!
ঝরনা!

এসো তৃষ্ণার দেশে এসো কলহাস্যে—
গিরি-দরী—বিহারিণী হরিণীর লাস্যে।
ধূসরের ঊষরের করো তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও-পরশে করো গো শ্রীমন্ত,
ভরা ঘট এসো নিয়ে ভরসায় ভরণা:
ঝরনা!

শৈলের পৈঠায় এসো তনুগাত্রী!
পাহাড়ের বুক-চেরা এসো প্রেমদাত্রী!
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,
স্বর্গের সুধা আনো মর্তে সুপর্ণা!
ঝরনা!

মঞ্জুল ও-হাসির বেলোয়ারী আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা! তোর পথ হ'ল ছাওয়া যে।
মোতিয়া মতির কুঁড়ি মুরছে ও-অলকে;
মেখলায়, মরি মরি, রামধনু ঝলকে!
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা।
ঝরনা!

———

॥ বর্ষাসুন্দরী ॥

মানকুমারী বসু

['বর্ষাসুন্দরী' কবিতায় আমরা নিবিড় ঘনঘোর বর্ষার একটি মনোমুগ্ধকর লিপিচিত্র পাই। বর্ষাকালের পৃথিবী—আকাশ, মাটি, ফুল-ফলের যথাযথ অবস্থা কবির তুলিকায় ধরা পড়েছে। কালে কালে পৃথিবীর সবই ডুবে যাবে, এই সত্য অনুভব করে কবি বর্ষার বিষণ্ণতার মধ্যেও জীবনের আনন্দ অনুসন্ধান করেছেন। এই কবিতার প্রতি চরণে দুটি করে পর্ব (৮+৮)। প্রতি ৮ মাত্রার পরে অর্থাৎ প্রতি পর্বের পর কণ্ঠস্বরকে অল্প বিশ্রাম দিতে হবে।]

রাত দিন ঝমু ঝমু/রাত দিন টুপ্-টাপু,
কি সাজে সেজেছ রাণি ! / এ কী আজ অপরূপ।
আননে বিজলী-হাসি, / গলায় কদম হার,
আঁচলে কেতকী-ছটা—/ এ আবার কি বাহার !
শিখী নাচে, ভেকে গায়, মেঘে গুরু গরজন,
বসুধা আনন্দ ভরে কত করে আয়োজন।
ডুবেছে রবির ছবি, ডুবেছে চাঁদিয়া তারা,
আকাশ গলিয়া পড়ে তরল রজত-ধারা।
জলদ বিজলী তা'রা এ উঁহার কর ধ'রে
চলেছে পিছল পথে, পা যেন পড়ে না স'রে।
ভিজে গেল—ভেসে গেল—ডুবে গেল ধরাখান,
গ'লে গেল, মেতে গেল মানবের ক্ষুদ্র প্রাণ।
প্রকৃতি ঢেকেছে মুখ শ্যামল সুন্দর বাসে,
চাহিলে তাহার পানে কত কী যে মনে আসে !
সসীমে অসীমে আজ হ'য়ে গেল মিশামিশি,
বুঝিনে আপন পর চিনিনে সে দিবানিশি !....
সবই তো ডুবিছে, রাণী, আমিও ডুবিয়া যাব,
চির সাধনার ফল তোমাতে ডুবিলে পাব।

॥ অশোকতরু ॥

দেবেন্দ্রনাথ সেন

[আলোচ্য কবিতাটি একটি সার্থক সনেটের উদাহরণ। গঠনানুগামী ইংরেজীতে একে সনেট বলে—বাংলায় মধুসূদন দত্ত এর নাম দিয়েছেন 'চতুর্দশপদী কবিতা'। সনেট রচনার সময় কবিকে কবিতার ভাবসংহতি এবং বাক্‌সংযমের প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হয়। সনেট রচনার সময় কবিকে নানা নিয়ম মেনে চলতে হয়। বাংলা সনেট পয়ার ছন্দের (মাত্রা বিভাগ ৮, ৬) চোদ্দ লাইনেই রচিত হয়। খাটি সনেট দুই ভাগে বিভক্ত—৮ লাইন ও ৬ লাইন—প্রতি চরণে দুটি পর্ব; মাত্রা ৮/৬। পংক্তির মিল সাধারণতঃ এই রকম হয়ঃ ক-খ-খ-ক + ক খখ ক + গ ঘ ঙ + গ ঘ ঙ অথবা ক খ ক খ + ক খ ক খ + গ ঘ গ + ঘ-গ-ঘ কিংবা গ ঘ ঙ + ঘ গ ঙ। সমস্ত সনেটে অবশ্য এই নিয়ম রক্ষিত হয় না। শেষের দু'-লাইনের মিলও ইচ্ছামত হতে পারে।

সনেটের এই কঠিন বন্ধন, ঘন-পিনদ্ধ ভাবটি আবৃত্তিকারের মনে রাখা চাই। ভাবগম্ভীর কণ্ঠে অথচ সুললিত ভঙ্গিতে সমগ্র কবিতাটি আবৃত্তি করতে হবে। এই সনেটের প্রথম আট লাইনে কবি উপমার ডালি সাজিয়ে অশোকতরুকে তার হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করছেন; আর শেষ ছয় লাইনে সেই জিজ্ঞাসারই একটি গভীর কবিত্বময় উত্তর দিয়েছেন। যে আবৃত্তি করবে, প্রশ্নোত্তরের এই ভঙ্গিটি তাকে মনে রাখতে হবে।]

হে অশোক, কোন্ রাঙা / চরণ চুম্বনে — ক
মর্মে মর্মে শিহরিয়া / হলি লাজে লাল ? — খ
কোন্ দোল পূর্ণিমার / নব বৃন্দাবনে — ক
সহর্ষে মাখিলি ফাগ / প্রকৃতি দুলাল ? — খ
কোন্ চির সধবার / ব্রত উদ্‌যাপনে — গ
পাইলি বাসন্তী শাড়ী / সিন্দুর বরণ ? — ঘ
কোন্ বিবাহের রাত্রে / বাসর ভবনে — গ
একরাশ ব্রীড়া হাসি / করিলি চয়ন ? — ঙ
বৃথা চেষ্টা !—হায় ! এই অবনী মাঝারে — ঘ
কেহ নহে জাতিস্মর—তরু জীব প্রাণী ! — চ
পরাণে লাগিয়া ধাঁধা আলোক আঁধারে, — ঙ
তবুও গিয়াছে ভুলে অশোক কাহিনী ! — চ
শৈশবের আবছায়ে শিশুর দেয়ালা !— — ছ
তেমতি, অশোক, তোর লালে লাল খেলা ! — ছ

॥ চিত্র শরৎ ॥

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[সত্যেন দত্তের এই কবিতায় শারদ প্রকৃতির চিত্র অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে পরিস্ফুট হয়েছে। কবি ছোট ছোট ছবি এঁকে শারদ প্রকৃতির আন্তররূপ ধরতে চেয়েছেন। চিত্ররসে কবিতাটি আদ্যন্ত পরিব্যাপ্ত। কবিতাটির শেষ স্তবকে কবি শরৎ-প্রকৃতির গভীরে প্রবেশ করেছেন।

প্রতি পংক্তিতে ৪টি পর্ব, ৪ মাত্রার প্রতি পর্ব; ছড়ার ভঙ্গীতে প্রতিটি পর্ব উচ্চারণ করতে হবে। শব্দের নৃত্য-চপল ভঙ্গিমা আবৃত্তিকারের কণ্ঠে কবিতাটির সর্বত্রই ফুটে উঠবে।]

এই যে ছিল / সোনার আলো / ছড়িয়ে হেথা / ইতস্ততঃ
আপনি খোলা / কমলা কোয়ার / কমলা ফুলি / রোয়ার মতো,
এক-নিমেষে / মিলিয়ে গেল / মিশমিশে ওই / মেঘের স্তরে,
গড়িয়ে যেন / পড়ল মসী / সোনার লেখা / লিপির পরে।

আজ সকালে অকালেরি বইছে হাওয়া ডাকছে দেয়া
কেওড়া জলের কোন্ সায়রে হঠাৎ নিশাস্ ফেললে কেয়া।
পদ্মফুলের পাপড়িগুলি আসছে ভেসে আলোক বিনে ;
অকালে ঘুম নামলো কি হায় আজকে অকাল বোধন দিনে।

হাওয়ার তালে বৃষ্টিধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে,
অবছায়াতে মূর্তি ধরে হাওয়ায় হেলে ডাইনে বামে ;
শূন্যে তারা নৃত্য করে শূন্যে মেঘের মৃদং বাজে
শাল ফুলেরি মতন ফোঁটা ছড়িয়ে পড়ে পাগল নাচে।

তাল বাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,
সুর বাহারের পর্দা দিয়ে গড়ায় তরল সুরের পারা !
দিঘির জলে কোন পোটো আজ আঁশ ফেলে কি নক্সা দেখে,
শোলপোনাদের তরুণ পিঠে আলপনা সে যাচ্ছে এঁকে।

ডালপালাতে বৃষ্টি পড়ে শব্দ বাড়ে ঘাড়িক ঘাড়,
লক্ষ্মীদেবীর সামনে কারা হাজার হাতে খেলছে কড়ি !
হঠাৎ গেল বন্ধ হয়ে মধ্যিখানে নৃত্যখেলা,
ফেঁসে গেল মেঘের কানাৎ উঠল জেগে আলোর মেলা।

কালো মেঘের কোলটি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে।
মিশির জমি জমিয়ে ঠোঁটে শরৎরাণী পান খেয়েছে।
মেশামেশি কান্নাহাসি মরম তাহার বুঝবে বা কে '
এক চোখে সে কাঁদে যখন আরেকটি চোখ হাসতে থাকে।

—

॥ ঘাস ॥

জীবনানন্দ দাশ

[জীবনানন্দ দাশ আধুনিক কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য। আলোচ্য কবিতাটিতে কবির নিবিড় মর্তপ্রীতি তথা প্রকৃতিপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। সবুজ ঘাসের সঙ্গে পৃথিবী-মায়ের জন্মান্তরীণ সম্বন্ধ; কবির তীব্র আকাঙ্ক্ষা তিনি যেন ঘাস হয়ে জন্মান।

কবিতাটি গদ্য কবিতা। এই জাতীয় কবিতায় তথাকথিত ছন্দের নিয়ম মানবার প্রয়োজন হয় না। কবির মনোভাব, তাঁর আবেগ-উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা-বেদনা অনুযায়ী আমাদের থামতে হবে। কিন্তু কবিতার অর্থ না বুঝলে এই জাতীয় কবিতা আমরা পড়তেই পারব না। কবিতাটির যে সমস্ত স্থানে '**' (দুটি তারকা) চিহ্ন দেওয়া হয়েছে সেখানে একটি পর্ব শেষ হলো ভেবে কণ্ঠস্বরকে একটু বেশী বিশ্রাম দিতে হবে; আর যেখানে '*' (একটি তারকা) চিহ্ন রয়েছে, সেই সমস্ত স্থানে কণ্ঠস্বর অল্প একটু বিশ্রাম নেবে। কোন সময়েই কণ্ঠ একেবারে বিশ্রাম যেন না নেয়—সমগ্র কবিতাটিতে ধ্বনির একটা প্রবাহ আবৃত্তিকারের কণ্ঠে ধ্বনিত হওয়া চাই।]

কচি লেবুপাতার মতো ** নরম * সবুজ * আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে ** এই ভোরের বেলা ;

কাঁচা বাতাবির মতো ** সবুজ ঘাস ** তেমনি সুঘ্রাণ—
হরিণেরা ** দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।

আমারও ইচ্ছা করে ** এই ঘাসের ঘ্রাণ ** হরিৎ মদের মতো
গেলাশে-গেলাশে ** পান করি,

এই ঘাসের * শরীর ছানি ** চোখে চোখ ঘসি,
ঘাসের পাখনায় ** আমার পালক,

ঘাসের ভিতরে ** ঘাস হয়ে জন্মাই ** কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের ** সুস্বাদ * অন্ধকার থেকে নেমে।

নিসর্গমূলক নিম্নোক্ত কবিতাগুলির জন্য পাঠ-সংকলন (১ম খণ্ড) দ্রষ্টব্য :

১। মধ্যাহ্নে—অক্ষয়কুমার বড়াল
২। কালবৈশাখী—মোহিতলাল মজুমদার

॥ দেশাত্মবোধক কবিতা ॥

॥ আমার দেশ ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[এটি একটি বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক কবিতা কবিতাটি দ্বিজেন্দ্রগীতি হিসাবেও মর্যাদা পেয়েছে। এই কবিতাটি আবৃত্তির সময় লক্ষ্য রাখতে হবে কণ্ঠে যেন গানের ঝোঁক না এসে যায়; আবার পর্বগুলি উচ্চারণের সময় ভাবলেশহীন কণ্ঠ হলেও চলবে না। ভাবানুযায়ী দ্রুত বা বিলম্বিত লয়ে কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

আবৃত্তিকারকে মনে রাখতে হবে, কবি এই কবিতায় প্রাচীন ইতিহাস পরিক্রমা করে পরাধীন বাঙালীকে একতাবদ্ধ হতে বলে তাদের স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।]

বঙ্গ আমার ! / জননী আমার ! / ধাত্রী আমার ! আমার দেশ !
কেন গো মা তোর / শুষ্ক বদন, / কেন গো মা তোর / রুক্ষ কেশ !
কেন গো মা তোর / ধূলায় আসন, / কেন গো মা তোর / মলিন বেশ ?
সপ্তকোটি / সন্তান যার / ডাকে উচ্চে—"আমার দেশ !"

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ ?
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন—'আমার দেশ' !

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্ধ জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর !
অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি শেষ,
তুই কিনা মাগো তাদের জননী, তুই কিনা মাগো তাদের দেশ ?

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ ?
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে, ডাকে যখন—"আমার দেশ" !
একদা যাহার বিজয় সেনানী, হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণব-পোত, ভ্রমিল ভারত সাগরময় ;

সন্তান যার তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কিনা এই ধূলায় আসন, তার কিনা এই ছিন্ন বেশ !
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ ?
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন—"আমার দেশ" ?

উদিল যেখানে মুরজ-মন্ত্রে, নিমাই কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস যেথা গাহিল গান,
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুই ত' মা সেই ধন্য দেশ !
ধন্য আমার যদি এ শিরায়, থাকে তাদের রক্তলেশ !

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ ?
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে, ডাকে যখন—"আমার দেশ" ।

॥ স্বাধীনতা ॥

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

[রঙ্গলালের এই কবিতাটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের একটি দেশপ্রেমের কবিতা। এই কবিতাটি একসময় বাঙালীর মুখে মুখে ফিরত। স্বাধীনতা ভিন্ন জীবনধারণের যে কোন মূল্য নেই তা এই কবিতায় বিধৃত। দেশ-প্রেমের জন্য মৃত্যুও শ্রেয়।

আবৃত্তিকারের কণ্ঠে এই দেশপ্রেমের সুরটি বেজে ওঠা চাই। বস্তুতঃ এটি একটি সঙ্গীত—কণ্ঠস্বরে তাই একটা সুরের প্রবাহ থাকা চাই। প্রতি চরণে তিনটি পর্ব। মাত্রা বিভাগ ৮/৮/৬। কবিতাটির আবৃত্তি একটু দ্রুত লয়ে হবে।]

স্বাধীনতা-হীনতায় / কে বাঁচিতে চায় হে, / কে বাঁচিতে চায় ।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল / কে পরিবে পায় হে, / কে পরিবে পায় ॥

কোটি-কল্প দাস থাকা / নরকের প্রায় হে, / নরকের প্রায় ।
দিনেকের স্বাধীনতা, / স্বর্গসুখ তায় হে / স্বর্গসুখ তায় ॥

অই শুন ! অই শুন ! ভেরীর আওয়াজ হে, ভেরীর আওয়াজ ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে, সাজ সাজ সাজ ॥···

সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে, বাহু-বল তার ।
আত্মনাশে করে যেই দেশের উদ্ধার হে, দেশের উদ্ধার ॥··

অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে, চল ত্বরা যাই ।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে, তুল্য তার নাই ॥

॥ মায়ের প্রতি ॥

কুসুমকুমারী দাশ

[পরাধীন শৃংখলাবন্ধ ভারতমাতার দুর্দশায় কবি ব্যথিত। তিনি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে মাকে তাপসী মূর্তিতে জেগে উঠতে বলছেন। তিনি মাকে তাঁর সন্তানদের এমন দিব্যমন্ত্রে দীক্ষিত করতে বলছেন যাতে আপামর ভারতবাসী জেগে উঠতে পারে।

আবৃত্তির সময় কবির এই মনোভাবটি স্মরণ রেখে আবৃত্তি করতে হবে।]

তোমার বন্দিনী মূর্তি / ফুটিল যখন / দীপ্ত দিবালোকে,
সহস্র ভায়ের প্রাণ / উঠিল শিহরি / ঘৃণা লজ্জা শোকে,
পবিত্র বন্দন মন্ত্রে / কম্পিত বাঙ্গালী / দূর আর্যভূমি,
মুক্তকণ্ঠে যুক্তকরে / ডাকিছে তোমায় / হে লজ্জাবারিণী—

সাধনার ধন তুমি ভারতবাসীর,—সহস্র পীড়নে,
উপবাসে অনশনে ভোলে নাই তোমা, দুর্বল সন্তানে।
দিব্য মন্ত্রে, দিব্য স্নেহে দাও স্থান আজি মন্দিরে তোমার,
যাক্ যাক্ থাক্ প্রাণ সে মন্ত্র শুনিয়া জাগিব আবার।

হিমাচল হতে দূরে কুমারিকা পার কাননে প্রান্তরে,
নগরে নগরে ক্ষুদ্র পল্লীতে পল্লীতে প্রাসাদে কুটীরে,
কোটি কোটি মৃত প্রাণ হোমাগ্নির প্রায় উঠুক জাগিয়া,
মা তোর তাপসী মূর্তি, পূজিবে সন্তান হিয়া রক্ত দিয়া।

॥ আবার আসিব ফিরে ॥

জীবনানন্দ দাশ

[জীবনানন্দ আধুনিক কবি। কবিতাটিতে জন্মভূমির প্রতি কবির আন্তরিকতা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মৃত্যুর পরেও আবার এই গ্রামবাংলায় ফিরে আসতে চান—শংখচিল, শালিক কিংবা কাক—যে কোন রূপ গ্রহণ করে।

কবিতাটির আবৃত্তি কঠিন। কিছুটা গদ্যভঙ্গিতে এটি রচিত। মূল অর্থ না বুঝলে, ঠিক মত স্থানে থামতে না পারলে কবিতা পাঠ ব্যর্থ হবে। যে যে স্থানে '*' (তারকা) চিহ্ন দেওয়া হয়েছে সেখানে অল্প বিরতি দেওয়া দরকার এবং যেখানে '**' চিহ্ন দেওয়া হয়েছে সেখানে পংক্তির শেষে একটু বেশী বিরতি দরকার। কিন্তু কোন সময়েই সম্পূর্ণ থেমে যাওয়া চলবে না—ধ্বনির একটা প্রবাহ আবৃত্তিকারের কণ্ঠে তুলে ধরা চাই। এই কথাগুলি মনে রাখলে এই কবিতার আবৃত্তি সর্বাঙ্গসুন্দর হবে।].

আবার আসিব ফিরে * ধানসিড়িটির তীরে * এই বাংলায়।
হয়তো মানুষ নয় * হয়তো বা শংখচিল শালিকের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে * এই কার্তিকের * নবান্নের দেশে।

কুয়াশার বুকে ভেসে * একদিন আসিব * এ কাঁঠাল ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হব * কিশোরীর * ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে * কলমীর গন্ধ ভরা * জলে ভেসে ভেসে ;
আবার আসিব আমি ** বাংলার নদী মাঠ খেত * ভালোবেসে
জলঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা * বাংলার * এ সবুজ ডাঙায় ;

হয়তো দেখিবে চেয়ে * সুদর্শন উড়িতেছে * সন্ধ্যার বাতাসে ;
হয়তো শুনিবে এক * লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে * শিমুলের ডালে ;
হয়তো খইয়ের ধান * ছড়াতেছে শিশু এক * উঠানের ঘাসে ;
রূপসার ঘোলা জলে * হয়তো কিশোর এক * সাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙ্গা বায় ** রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে * অন্ধকারে আসিতেছে ** নীড়ে
দেখিবে ধবল বক ** আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে--

।। আহ্বান ।।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে, একতার ডাকে আজ সারা পৃথিবীর শোষিত, অবহেলিত মানুষ নতুন যুগের দিকে যাত্রা করেছে। কবি শত্রুকে সরে দাঁড়াতে বলে সাধারণ মানুষের মনে অকুতোভয়তার সঞ্চার করতে চাইছেন।

আবৃত্তিকারকে কবিতাটির মধ্যেকার জ্বলন্ত spirit-টিকে কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলতে হবে। কবির মনোভাব বুঝে পংক্তির অর্থানুযায়ী থামতে হবে, কোনো শব্দ দ্রুত উচ্চারণ করতে হবে, কোনো অংশে বা কণ্ঠস্বরে তীব্রতা আনতে হবে।]

হাতেতে হাত / মেলাও,
ভাই ভাই / সারা দুনিযাই / আজ
জোরসে পা / চালাও।
পথ কি / অনেক দূর, দুর্গম বন্ধুর ?
আলো নাই থাক, / ভয় নাই তবু,
প্রাণের দীপ / জ্বালাও।

নূতন যুগের / দ্বার রোধে কে / পাহারাদার ?
কার লোভে করে প্রভাত আড়াল ?
তফাত সরে / দাঁড়াও।
আকাশ ঘন / ঘটায়
মিছেই ভয় / দেখায়,
কিছু নাই যার / কি হারাবে তার ?
কে বা হবে / পিছপাও ?

পাঠ-সংকলনের বন্দে মাতরম্, ভারতবর্ষ, মা আমার, বাঙালীর মা, জন্মভূমি, আমরা, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার দেশাত্মবোধক কবিতা।

॥ শ্রদ্ধাঞ্জলি-জ্ঞাপক কবিতা

॥ কাশীরাম দাস ॥

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[কাশীরাম দাস সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় প্রথম মহাভারতের অনুবাদ করে বাঙালীর যে মহৎ উপকার করেছিলেন, তারই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি মধুসূদনের এই কবিতায়।

এই কবিতার গঠনানুযায়ী একে ইংরেজীতে 'সনেট' (Sonnet) বলা হয় —বাংলায় বলা হয় 'চতুর্দশপদী কবিতা'। সনেটের গঠনে কঠিন বন্ধন; পয়ার ছন্দের চোদ্দ লাইনে বাংলা সনেট রচিত হয়। খাঁটি সনেটের দুটি ভাগ ৮ লাইন ও ৬ লাইন; প্রতি চরণে দুটি পর্ব; মাত্রা ৮/৬। ভাবের সংহতি এবং বাক্‌সংযম সনেটকে মর্যাদা দান করেছে। সনেটের এই বৈশিষ্ট্যের কথা আবৃত্তিকারকে স্মরণ রেখে শ্রদ্ধাঞ্জলির ভাবটি কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলতে হবে।]

চন্দ্রচূড় জটাজালে / আছিলা যেমতি	ক
জাহ্নবী, ভারত-রস / ঋষি দ্বৈপায়ন,	খ
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে / রাখিলা তেমতি;	ক
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ / করিত রোদন।	খ
কঠোরে গঙ্গায় পূজি / ভগীরথ ব্রতী,	ক
(সুধন্য তাপস ভবে, / নর-কুল-ধন!)	খ
সগর বংশের যথা / সাধিলা মুকতি;	ক
পবিত্রিলা আনি মায়ে, / এ তিন ভুবন;	খ
সেইরূপে ভাষা-পথ / খননি স্ববলে	গ
ভারত-রসের স্রোতঃ / আনিয়াছ তুমি	ঘ
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা / সে বিমল জলে।	গ
নারিবে শোধিতে ধার / কভু গৌড়ভূমি।	ঘ
মহাভারতের কথা / অমৃত সমান।	ঙ
হে কাশী! কবীশদলে / তুমি পুণ্যবান্!	ঙ

[পরবর্তী কবিতা দুটি চিত্তরঞ্জন এবং শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। কবিতা দুটি প্রসঙ্গস্থলে প্রায়ই উধৃত হয়। দুটি কবিতাই পয়ার ছন্দে লেখা। মাত্রাবিভাগ ৮/৬। কবিতা দুটির বক্তব্য প্রায় একই : দেশের মানসে, হৃদয়ের মণিকোঠায় যাঁদের স্থান, মৃত্যু তাঁদের কেড়ে নিলেও, তাঁরা চিরজীবী।]

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এনেছিলে সাথে করে / মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি / করি গেলে দান।

॥ শরৎচন্দ্র ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাহার অমর স্থান / প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় / মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে / নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে / রাখিয়াছে বরি।

॥ সাগর তর্পণ ॥

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[সাগরের তর্পণ কবিতাটিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবন তথা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কবিতাটি বিলম্বিত লয়ের ধ্বনিপ্রধান ছন্দে রচিত। ৫ মাত্রার এক একটি পর্ব। ঐ পর্ব অনুযায়ী কণ্ঠে বিরতি দিলে আবৃত্তির সময় সুবিধে হবে। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের দৃঢ়তা এবং কারুণ্য যথাযথভাবে আবৃত্তিকারকে দেখিয়ে দিতে হবে। তাঁর চরিত্রের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে আবৃত্তিকার পংক্তির ভাব অনুযায়ী আবৃত্তি করবে। কবিতায় লক্ষণীয় অংশ : (ক) নিঃস্ব হয়ে ··চিত্ত চমৎকার (দৃঢ়তা এবং কারুণ্য), (খ) সেই যে চটি···নন্দিগায় (আকুলতা), (গ) শাস্ত্রে যারা—নিরন্তর (ব্যঙ্গ)।]

বীরসিংহের / সিংহশিশু / বিদ্যাসাগর / বীর !
উদ্বেলিত / দয়ার সাগর /—বীর্যে সুগম্ / ভীর !
সাগরে যে / অগ্নি থাকে / কল্পনা সে / নয়,
তোমায় দেখে / অবিশ্বাসীর / হয়েছে / প্রত্যয়

নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে এলে দয়ার অবতার !
কোথাও তবু নোয়াও নি শির জীবনে একবার।
দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার
সৌম্য মূর্তি তেজের স্ফূর্তি চিত্ত-চমৎকার"!

নামলে একা মাথায় নিয়ে, মায়ের আশীর্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ আতুর অকিঞ্চনের সাধ ;
অভাজনে অন্ন দিয়ে –বিদ্যা দিয়ে আর—
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার।

বিশ বছরে তোমার অভাব পূরলো নাকো হায়,
বিশ বছরের পুরানো শোক নূতন আজো প্রায়।
তাইতো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর !
কীর্তিঘন মূর্তি তোমার জাগে প্রাণের 'পর।

স্মরণ-চিহ্ন রাখতে পারি শক্তি তেমন নাই,
প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূরৎ নাহি চাই ;
মানুষ খুঁজি তোমার মত,– –একটি তেমন লোক,—
স্মরণচিহ্ন মূর্ত ! –যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক।

রিক্ত হাতে করবে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ—
রাত্রে স্বপন চিন্তা দিনে দেশের দশের হিত,—
বিঘ্ন বাধা তুচ্ছ করে লক্ষ্য রেখে স্থির
তোমার মতন ধন্য হবে,—চাই সে এমন বীর।

তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজব তবে, হায়,
ধুলায় ধুসর বাঁকা চটি ছিল যা ওই পায় ;
সেই যে চটি উচে যাহা উঠত এক একবার
শিক্ষা দিতে অহংকৃতে শিষ্ট ব্যবহার।

সেই যে চটি—দেশী চটি –বুটের বাড়া ধন,
খুঁজব তারে, আনব তারে, এই আমাদের পণ ;
সোনার পিঁড়েয় রাখব তারে, থাকব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগায়।

রাখব তারে স্বদেশ প্রীতির নূতন ভিতের 'পর,
নজর কারো লাগবে নাকো, অটুট হবে ঘর।
উঁচিয়ে মোরা রাখব তারে উচে সবাকার,—
বিদ্যাসাগর বিমুখ হত—অমর্যাদায় যার।

শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ
তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন ;
বিচার যাদের যুক্তি বিহীন অক্ষরে নির্ভর,—
সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরন্তর।

দেখুক এবং স্মরণ করুক সব্যসাচীর রণ,—
স্মরণ করুক বিধবাদের দুঃখ মোচন পণ ;
স্মরণ করুক পাণ্ডারূপী গুণ্ডাদিগের হার,
"বাপ্, মা বিনা দেবতা সাগর মানেই নাকো আর !"

অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর ! মৃত্যু-বিজয় নাম,
ঐ নামে হায় লোভ করেছে অনেক ব্যর্থকাম ;
নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ,
কাজ দেবে না ? নামটি নেবে ?—একি বিষম লাজ ।।

বাংলা দেশের দেশী মানুষ ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
বীরসিংহের সিংহশিশু ! বীর্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয় ।।

।। রবীন্দ্রনাথের প্রতি ।।

বুদ্ধদেব বসু

[সভ্যতা আজ মৃত্যুশয্যায়—লোভ আর হিংস্রতার আক্রমণে সুন্দরের হয়েছে অপমৃত্যু । এই চরম সংকটময় মুহূর্তে কবিকে নরক যন্ত্রণা হতে বাঁচিয়ে রেখেছে রবীন্দ্রনাথের বাণী । তারই প্রেরণায় তিনি জীবনের মূল্যে বিশ্বাসী ।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবির আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস কবিতাটির মূল সুর । এই বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে কবিতার শেষ পাঁচটি পংক্তিতে । "এত দুঃখ··· জয় হবে জানি," এই পংক্তিগুলি আবৃত্তি করবার সময় আবৃত্তিকারের কণ্ঠে ঐ বিশ্বাস ধ্বনিত হওয়া চাই। কবিতার প্রথম দশ পংক্তি আবৃত্তির সময় দেশের দারুণ দুর্দিনের ছবি কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলতে হবে । দুর্দিনের ছবি যেসমস্ত পংক্তিতে আভাসিত সেখানে কণ্ঠস্বরে তীব্রতা আনা চাই । আবার 'হে বন্ধু হে প্রিয়তম' 'প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা কাঁপে থরোথরো জীবনের সোনার হরিণ' 'প্রাণরুদ্ধ গান স্তব্ধ' ইত্যাদি পংক্তিতে কণ্ঠে নমনীয় সুরেলা ভাব আনতে হবে ।]

তোমারে স্মরণ করি/আজ এই দারুণ দুর্দিনে
হে বন্ধু, প্রিয়তম,/সভ্যতার শ্মশান শয্যায়
সংক্রমিত মহামারী/মানুষের মর্মে ও মজ্জায় ।
প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা । / রক্তপায়ী উদ্ধত সঙিনে
সুন্দরেরে বিদ্ধ ক'রে । / মৃত্যুবহ পুষ্পকে উড্ডীন
বর্বর রাক্ষস হাঁকে, / 'আমি শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বড়ো ।'
দেশে-দেশে, সমুদ্রের / তীরে তীরে কাঁপে থরোথরো
উন্মত্ত জন্তুর মুখে / জীবনের সোনার হরিণ ।
প্রাণ রুদ্ধ, গান স্তব্ধ ; / ভারতের স্নিগ্ধ উপকূলে
লুব্ধতার লালা ঝরে । / এত দুঃখ, এ-দুঃসহ ঘৃণা—
এ নরক সহিতে কি / পারিতাম, হে বন্ধু, যদি না
লিপ্ত হত রক্তে মোর / বিদ্ধ হত গূঢ় মর্মস্থলে
তোমার অক্ষয় মন্ত্র ! / অন্তরে লভেছি তব বাণী,
তাই তো মানি না ভয়, / জীবনেরই জয় হবে জানি । (৮+১০)

।। আত্মজীবনী বিষয়ক কবিতা ।।

। আত্মবিলাপ ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

['আত্মবিলাপ' কবি মধুসূদনের ব্যথাহত জীবনের করুণ রাগিণী প্রেম, । যশ এবং অর্থ—এই তিনটি বস্তুর প্রতিই কবির অত্যধিক আসক্তি ছিল, কিন্তু তাঁর সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই ব্যর্থ হয়েছে । জীবনের সমাপ্তি-পথে আত্মবিলাপই সার হল ।

এই কবিতাটি আবৃত্তির পক্ষে উপযুক্ত । কবির মনের হাহাকার আবৃত্তিকারের কণ্ঠে আবেগময় ভঙ্গীতে ধ্বনিত হয়ে ওঠা চাই । ইংরেজী ধরনের স্তবকের মাধ্যমে কবিতাটি রচিত । প্রতি স্তবকের প্রথম চারটি পংক্তির মাত্রা বিভাগ ৮।৮।৬ ; শেষ দুটির মাত্রা ৮।৮ । প্রতি স্তবকে পঞ্চম পংক্তিতে মিল লক্ষণীয় ।]

আশার ছলনে ভুলি / কি ফল লভিনু, হায় ! /
তাই ভাবি মনে । /
জীবন-প্রবাহ বহি / কালসিন্ধু পানে ধায়, /
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুহীন, / হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা / ছুটিল না—এ কি দায় !

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে ?
নীরবিন্দু দূর্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলমলে ?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি ।

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার
জাগে সে কাঁদিতে !
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার,
পথিকে ধাঁধিতে !
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষা-ক্লেশে ;
এ তিনের ছলসম ছল রে এ কু-আশার ।

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে,
কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি !
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে !

বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে,
কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী !
এ বিষম বিষ-জ্বালা ভুলিবি মন, কেমনে ?

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায় !
কব তা কাহারে ?
সুগন্ধ কুসুম গন্ধে অন্ধকীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য বিষদশন, কামড়ে রে, অনুক্ষণ !
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায় ?

মুকুতা-ফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শত মুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু-জল-তলে
ফেলিস পামর !
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে !

। পত্রপুট কাব্যগ্রন্থের 'তিন' সংখ্যক কবিতা ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[আবৃত্তিযোগ্য রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতা। কবিতাটি আবৃত্তি করবার পূর্বে প্রতিটি পংক্তি ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে এক একটি পংক্তি এক এক ভাবে সাজানো। কবি-মনের ভাবানুযায়ী, মানসিক প্রতিফলনের প্রতি লক্ষ্য রেখে আবৃত্তিকারকে তার কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কোথাও কোথাও কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠবে, কোথাও বা কণ্ঠে কারুণ্য এনে দরদ দিয়ে শব্দগুলি উচ্চারণ করতে হবে।

পৃথিবীকে কবি প্রণাম জানাচ্ছেন—পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে। প্রথমাংশে তিনি পৃথিবীর অন্তব স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন আর দ্বিতীয়াংশে পৃথিবীর কাছে বিরাট কিছু চান নি—কেবলমাত্র 'মাটির ফোঁটার একটি মাত্র তিলক' নিয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করতে চেয়েছেন। কবিতাটির মূল বক্তব্য ভালোভাবে না বুঝে আবৃত্তি করা সম্ভব হবে না।]

আজ আমাব / প্রণতি গ্রহণ করো / পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে / অবনত দিনাবসানের / বেদিতলে।
মহাবীর্যবতী / তুমি বীরভোগ্যা,
বিপরীত তুমি / ললিতে কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি / পুরুষে নারীতে ;
মানুষের জীবন / দোলায়িত কর তুমি / দুঃসহ দ্বন্দ্বে।

ডান হাতে / পূর্ণ কর সুধা
বাম হাতে / চূর্ণ কর পাত্র,
তোমার লীলাক্ষেত্র / মুখরিত কব / অট্টবিদ্রূপে ;
দুঃসাধ্য কর / বীরের জীবনকে / মহৎজীবনে / যার অধিকার।
শ্রেয়কে কর দুর্মূল্য,
কৃপা কর না কৃপাপাত্রকে।

তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম,
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।
তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ,
ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে।

* * *

আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসি নি তোমার সম্মুখে
এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্য অমরতার দাবি করব না তোমার দ্বারে,
তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্য প্রদক্ষিণের পথে

যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো একটি আসনের
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে
তবে দিও তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে।
হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি ॥

এতদ্ব্যতীত পাঠ-সংকলন (১ম খণ্ড) থেকে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর "আত্মপরিচয়" কবিতাটি দেখে রাখা উচিত। কবিতাটি মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থের অংশবিশেষ।

॥ অবহেলিত জনগণের স্বীকৃতিসূচক কবিতা ॥

॥ চাষার বেগার ॥

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[কবির দৃষ্টিতে তথাকথিত সাধারণ মানুষের অন্তরের বেদনা ধরা পড়েছে। ক্ষমতাবানের অত্যাচারে সাধারণ চাষীর নিদারুণ বিপর্যয়ের ইংগিত এখানে ধরা পড়েছে, প্রতিবাদের তবু পথ নেই।

আবৃত্তিকার চাষীর মনোভাবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আবৃত্তি করবে কবিতাটি। চাষীর অসহায়তা তার কণ্ঠে ফুটে ওঠা চাই।]

রাজার পাইক / বেগার ধরেছে
ক্ষেতে যাওয়া / বন্ধ হল আজ ;
পরের কাজে / কাটবে সারাদিন, /
রইল প'ড়ে / ঘরের যত কাজ।
আষাঢ় মাসে / চাষের ক্ষেতে,
খাটছে সব / দিনে ও রেতে
শেষ জো'য়েতে / রুইব ব'লে / বেরিয়েছিলেম / আজ ;
পড়ল হঠাৎ / রাজার বাড়ি কাজ !

লোকের ক্ষেতে নূতন চারাগুলি
সবুজ, যেন টিয়ে পাখির পাখা ;
পাটের ডগা লক্‌লকিয়ে উঠে'
বালুরঘাটের বাজার দিল ঢাকা।
গাঙের জল বানের টানে,
আস্‌ল ধেয়ে গ্রামের পানে ;
পল্লীপথ গরুর ক্ষুরে হ'ল যে কাদামাখা ;
শস্যভারে পড়ল চরা ঢাকা।

উপর্ঝরণ দারুণ বাদলে
ভাসছে জলে জীর্ণ কুঁড়েখান ;
মোড়লের ঝি ভাবছে অধোমুখে —
বাঁচবে কিসে ছেলে দুটির প্রাণ !
'শ্যামলা' মোর দুঃখ বুঝে
দাঁড়িয়ে ভেজে চক্ষু বুজে,
সুদের দায়ে দাদা ঠাকুর গোয়ালে দিলে টান ;
রুইতে পেলে হ'ত ক' বিশ ধান।

জীর্ণ চালে হ'ল না আর দেওয়া
কোথাও দুটি পচা খড়ের গুঁজি,
রাজার কাজে বেগার দিতে লোক
মিলল না কি পল্লীখানি খুঁজি ?
সারা সনের অন্ন ছাড়ি'
যেতেই হবে রাজার বাড়ি !
স্বর্ণচূড়ার বর্ণ সেথায় মলিন হ'ল বুঝি।
যাচ্ছি চলো চক্ষু কান বুঁজি !

॥ রানার ॥

সুকান্ত ভট্টাচার্য

['রানার' গ্রামের ডাক হরকরা। তার কাজ খবর পেঁছে দেওয়া—কিন্তু রানারের খবর কেউ রাখে না ; তার পিঠেতে টাকার বোঝা, কিন্তু সে টাকা সে ছুঁতে পারে না। রানার যে কর্তব্যের ভার নিয়েছে, সে কাজে সে অটল। রানারের দায়িত্ববোধ, স্বার্থত্যাগ কবি এ কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজে কোন কাজই যে ছোট নয়, সেই বোধটিও এখানে পাওয়া যাবে। রানারের জীবনের প্রতি আন্তরিকতা ও তার কর্মের মহনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাই কবিতাটির মূল সুর। রানারের অনুভূতির বিভিন্নতা আবৃত্তিকারের কণ্ঠে আবেগমণ্ডিত ভঙ্গিতে ফুটে ওঠা চাই।

কবিতাটি ৬ মাত্রার। প্রতি ৬ মাত্রার পর পর্ববিভাগে অল্প একটু থামলে আবৃত্তি সঠিক হবে।]

রানার ছুটেছে, / তাই ঝুম ঝুম / ঘণ্টা বাজছে / রাতে
রানার চলেছে / খবরের বোঝা / হাতে।
রানার চলেছে, / রানার !
রাত্রির পথে / পথে চলে—কোনো / নিষেধ জানে না / মানার,
দিগন্ত থেকে / দিগন্তে ছোটে / রানার —
কাজ নিয়েছে সে / নতুন খবর / আনার।
রানার ! রানার ! জানা-অজানার
বোঝা আজ তার কাঁধে,
বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে,
রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয়-হয়,
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।

তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে সরে যায় বন,
আরো পথ. আরো পথ— বুঝি হয় লাল ও-পূর্ব কোণ।
অবাক রাতের তারারা আকাশে মিটিমিটি করে চায় ;
কেমন করে এ রানার সবেগে হরিণের মতো যায় !
কত গ্রাম, কত পথ যায় সরে সরে—
শহরে রানার যাবেই পেঁছে ভোরে ;
হাতে লণ্ঠন করে ঠনঠন জোনাকিরা দেয় আলো
মাভৈঃ, রানার, এখনো রাতের কালো।

এমনি করেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে,
পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রানার পেঁাছে দিয়েছে 'মেলে'
ক্লান্ত শ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ মাটি ভিজে গেছে ঘামে,
জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে...
অনেক দুঃখে বহু বেদনায় অভিমানে অনুরাগে
ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।

রানার ! রানার !
এ বোঝা টানার
দিন কবে শেষ হবে ?
রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে ?

ঘরেতে অভাব ; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,
পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া।
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।
কত চিঠি লেখে লোকে—
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে ;
এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোন দিনও,
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ,
এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে,
এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে।
দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি
একে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি —
রানার ! রানার ! কী হবে এ বোঝা বয়ে,
কী হবে ক্ষুধায় ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ?
রানার ! রানার ! ভোর তো হয়েছে—আকাশ হয়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কবে, কেটে যাবে এই দুঃখের কাল ?

রানার ! গ্রামের রানার !
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার ;
শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ ভীরুতা পিছনে ফেলে—
পেঁাছে দাও এ নতুন খবর অগ্রগতির 'মেলে',
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখনি, নেই দেরি নেই আর,
ছুটে চলো, ছুটে চলো আরো বেগে, দুর্দম হে রানার ॥

।। আমি কবি ।।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[এই কবিতাটিতে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি কবির শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। কামার, কাঁসারি, ছুতোর, কুমোর, মুটে মজুরের কর্মময় জীবনের ছবি তিনি তাঁর কাব্যে ফুটিয়ে তুলতে চান। কবি অলস কল্পনার জাল বুনে জীবনের গতিকে নষ্ট করতে চান না। এই কবিতাটি আবৃত্তির সময় কবির এই মনোভাব শ্রোতাদের মনে সংক্রামিত করতে হব।]

আমি কবি যত / কামারের আর / কাঁসারির আর
ছুতোরের মুটে / মজুরের
আমি কবি যত / ইতরের
আমি কবি ভাই / কর্মের আর / ঘর্মের
বিলাস বিবশ / মর্মের যত / স্বপ্নের তরে / ভাই,
সময় যে হায় / নাই !

মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত
সাগর মাগিছে হাল,
পাতাল পুরীর বন্দিনী ঋতু,
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল।
দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়,
নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী—
সময় নাহি যে হায় !

মাটির বাসনা পুরাতে ঘুরাই
কুম্ভকারের চাকা,
আকাশের ডাকে গড়ি আর মেলি
দুঃসাহসের পাখা,
অভ্রংলিহ মিনার-দম্ভ তুলি,
ধরণীর গূঢ় আশায় দেখাই উদ্ধত অঙ্গুলি।

জাফ্রি-কাটানো জানলায় বুঝি
পড়ে জ্যোৎস্নার ছায়া,
প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গ
ঘনায় নিশীথ মায়া।
দীপহীন ঘরে আধো নিমীলিত
সে দুটি আঁখির কোলে
বুঝি দুটি ফোঁটা অশ্রুজলের
মধুর মিনতি দোলে।
সে মিনতি রাখি সময় যে হায় নাই,
বিশ্বকর্মা যেখানে মত্ত কর্মে হাজার করে
সে বাসে চারণ চাই।
আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের মুটে মজুরের,
আমি কবি যত ইতরের।

কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই,
ছুতোরের ধরি তুরপুন
কোন্ সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ।
পাল তুলে দিয়ে কোন সে সাগর,
জাল ফেলি কোন দারিয়ায় ;
কোন্ পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ,
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই
—কুঠার-ঘায়।
সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি
আর খাল কাটি ভাই, পথ বানাই
স্বপ্ন বাসরে বিরহিণী বাতি
মিছে সারারাতি পথ চায়,
হায়! সময় নাই।

॥ জাতির পাঁতি ॥

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[মানুষে মানুষে যে প্রকৃত পক্ষে কোন ভেদ নেই, সেই বোধটি কবি এই কবিতার মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে জাগাতে চেয়েছেন। এখানে তিনি মানুষ নামক জাতিরই জয়গান করেছেন। চার পর্ববিশিষ্ট ছয় মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দে এই কবিতাটি রচিত। এই ছন্দের আশ্রয়ে কবির মনোভাব সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যে কবিতাটি আবৃত্তি করবে, কবির অনুভূতি অনুযায়ী সে তার কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রিত করবে।]

জগৎ জুড়িয়া / এক জাতি শুধু, / সে জাতির নাম / 'মানুষ' জাতি ;
একই পৃথিবীর / স্তন্যে লালিত, / একই রবি শশী / মোদের সাথী।

শীততাপ ক্ষুধা তৃষার জ্বালা— সবাই আমরা সমান বুঝি ;
কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো ক'রে তুলি, বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।

দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো, জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবারি সমান রাঙা।

বাহিরেতে ছোপ আঁচড়ে সে লোপ ভিতরের রং পলকে ফোটে ;
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র কৃত্রিম ভেদ ধুলোয় লোটে।

রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে আসল মানুষ প্রকট হয়
বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।

সেবার ব্রতে যে সবাই লেগেছে, লাগিবে দুদিন পরে ;
মহা-মানবের পূজার লাগিয়া সবাই অর্ঘ্য চয়ন করে।

মালাকার তার মাল্য যোগায়, গন্ধ-বেণেরা গন্ধ আনে,
চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়, নট তারে তোষে নৃত্যে গানে।

স্বর্ণকারেরা ভূষিছে সোনায়, গোয়ালা যোগায় মাখন, ননী,
তাঁতিরা সাজায় চন্দ্রকোণায়, বণিকেরা তারে করিছে ধনী।

যোদ্ধারা তারে সাঁজোয়া পরায়, বিদ্বান্ তার ফোটায় আঁখি,
জ্ঞান-অঞ্জন নিত্য যোগায় কিছু যেন জানা না রয় বাকি।

কেউ হেয় নয়, সমান সবাই, আদি জননীর পুত্র সবে ;
মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কি ফল, জাতির তর্ক কেন গো তবে ?

তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে মহামানবের গাহ রে জয়,
বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ নিখিল ভুবন ব্রহ্মময় !

। ওরা কাজ করে ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত আবৃত্তিযোগ্য কবিতা। এখানে সম্পূর্ণ কবিতাটি উদ্ধৃত করা হয় নি। কৌতূহলী ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের 'আরোগ্য' গ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতাটি দেখতে পারে। কবির বক্তব্য, শক্তি বা ঐশ্বর্যের দম্ভ ক্ষণকালের, কিন্তু যা চিরকালের তা বুঝেছে যারা অতি সাধারণ তারাই। দেশ দেশান্তরে মাঝি, চাষা ইত্যাদি সাধারণ অবহেলিত মানুষই জীবনের প্রকৃত মন্ত্র অনুধাবন করতে পেরেছে—তাই ওরা কাজ করে।

গদ্যছন্দে রচিত এই কবিতাটির প্রথমাংশ বিলম্বিত লয়ে, দ্বিতীয়াংশ দ্রুত লয়ে এবং শেষাংশ আবার বিলম্বিত লয়ে আবৃত্তি করতে হবে।]

ওরা চির / কাল
টানে দাঁড় / ধরে থাকে / হাল ;
ওরা মাঠে / মাঠে
বীজ বোনে, / পাকা ধান / কাটে।
ওরা কাজ / করে
নগরে প্রান্ / তরে।

রাজছত্র ভেঙে পড়ে ; রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে ;
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে ;
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।

ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।
গুরুগুরু গর্জন গুনগুন স্বর
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্র ধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ' পরে
ওরা কাজ করে ॥

———

[এতক্ষণ যে কবিতাগুলি আলোচিত হল, তা ছাড়া নিচের কবিতাগুলিও আবৃত্তির জন্য প্রস্তুত করে রাখা উচিত।

১। পুরাতন ভৃত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। দুইবিঘা জমি – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উল্লিখিত কবিতা দুইটিতে অবহেলিত মানুষের (ভৃত্য ও কৃষক) জীবন কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কবিতা দুটির জন্য পাঠ-সংকলন ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।]

॥ ভক্তিমূলক কবিতা ॥

॥ প্রার্থনা ॥

বিদ্যাপতি

[বিদ্যাপতি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি। ইনি যে ভাষায় কবিতা বা গান রচনা করেছেন, তা বাংলা ভাষারই পূর্ব রূপ। এখানে যে ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেই ছন্দ অনুযায়ী কবিতা পড়তে গেলে যেখানে যুক্ত অক্ষর আছে এবং যেখানে আ-কার, ঈ-কার, এ-কার আছে, সেই সমস্ত স্থানগুলি টেনে টেনে উচ্চারণ করতে হবে।

কবিতাটির মধ্যে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভক্তের আকুল প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে। এই আকুলতা আবৃত্তিকারের কণ্ঠে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়ে যেন শ্রোতার মনকে আপ্লুত করে।]

মাধব, / বহুত মিনতি করি / তোয়।
দেই তুলসী / তিল এ দেহ সম / র্পিলু
দয়া জনু / ছোড়বি / মোয়॥
গণইতে / দোষ গুণ — / লেশ নাহি / পায়বি
যব তুহু / করবি বি / চার।
তুহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখী কুলে জনমিয়ে
অথবা কীট-পতঙ্গে।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে।
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

———

প্রার্থনা

রজনীকান্ত সেন

[কবি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করছেন ভগবান যেন আমাদের মনের কালিমা এবং মলিনতা দূর করেন—আমরা যেন ভগবানকে এই বিচিত্র সৃষ্টির সর্বত্র প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হই। কবির আকুলতা এবং আন্তরিকতা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে কবিতাটির আবৃত্তি ব্যর্থ হবে।]
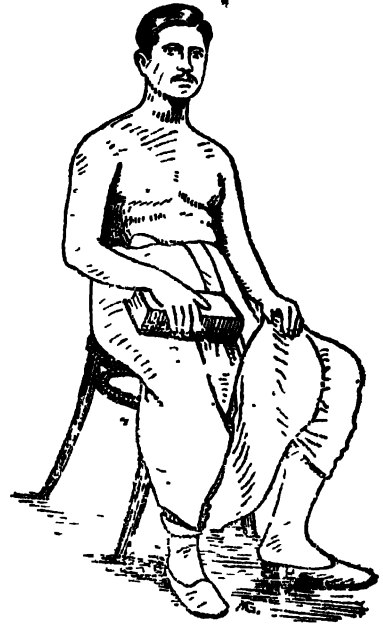
তুমি নির্মল কর, / মঙ্গল করে /
মলিন মর্ম / মুছায়ে ;
তব পুণ্য কিরণ / দিয়ে যাক্ মোর /
মোহ-কালিমা / ঘুচায়ে ॥

লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্
অকূল গরল-পাথারে।

প্রভু, বিশ্ব-বিপদ-হন্তা,
তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণ তলে নিয়ে এস মোর
মত্ত বাসনা গুছায়ে ॥

আছ অনল-অনিলে, চির নভোনীলে
ভূধর-সলিলে-গগনে,
আছ বিটপী-লতায়, জলদের গায়,
শশী-তারকায় তপনে

আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া,
ব'সে আঁধারে মরিব কাঁদিয়া,
আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

॥ সান্ত্বনা ॥

অক্ষয়কুমার বড়াল

[অক্ষয়কুমার বড়ালের এই ভক্তিমূলক কবিতায় ঈশ্বরের প্রতি তাঁর নির্ভর-শীলতা সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। কবির কামনা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রবহমান এই যে জীবন তাতে যতই দুঃখ, বাধা-বিঘ্ন আসুক, ভগবান যেন হাত ধরে নিয়ে যান।

আবৃত্তিকারের কণ্ঠে এই পরম নির্ভরশীলতার ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে হবে। কণ্ঠস্বরে আকুলতা এনে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণের ভঙ্গীটি তুলে ধরতে হবে।]

ধর মোর / কর !
সুখে দুখে / লোভে অহঙ্ / কারে
যদি, দেব / ভুলিয়া তো / মারে
যাই দুরা / ন্তর !
রোগে শোকে / দারিদ্র্যে / সন্দেহে,
ভুলি যদি / তব পুত্র- / স্নেহে
হই স্বত / ন্তর !
ধর মোর / কর।

ধর মোর কর /
দেহ-মন অস্থির সতত,
গড়িতে—ভাঙিতে চায় কত
বিশ্ব-চরাচর !
বার বার পড়ি, উঠি, ছুটি,
কত চাই, কত তুলি মুঠি—
অতৃপ্তি-কাতর !
ধর মোর কর !

ধর মোর কর !
অবসন্ন দেহ মন আজ,
অসমাপ্ত জীবনের কাজ !
মৃত্যু-শয্যা 'পর—
শূন্য দৃষ্টি শীর্ণ বাহু তুলি'
কারে খুঁজি আকুলি' বিকুলি' !
হে চিরনির্ভর
ধর দুটি কর !

॥ সংগতি ॥

অমিয় চক্রবর্তী

[অমিয় চক্রবর্তী আধুনিক কবি। কিন্তু তিনিও ঈশ্বর-বিশ্বাসী। পৃথিবীর সর্বত্র তিনি একই সুরের অনুরণন দেখতে পেয়েছেন ; সমস্ত কিছুই যেন একই সংগতিতে বাঁধা।

ঈশ্বরভক্তির এই প্রয়াস আধুনিক কবিতার আঙ্গিকে প্রকাশিত। পূর্বে উদ্ধৃত ভক্তিমূলক কবিতাগুলির সঙ্গে এর পার্থক্য সহজেই লক্ষণীয়। এই কবিতায় নির্দিষ্ট পর্ববিভাগ বা মাত্রাসমত্ব মেনে চলা হয়নি। অর্থানুযায়ী আবৃত্তিকারকে কণ্ঠের বিশ্রাম নিতে হবে—দ্রুতি আনতে হবে কিংবা উল্লাস থেকে কারুণ্যে যাতায়াত করতে হবে।]

মেলাবেন তিনি / ঝোড়ো হাওয়া / আর
পোড়ো বাড়ীটার /
ঐ ভাঙা দরজাটা /
মেলাবেন।
পাগল ঝাপটে / দেবে না গায়েতে / কাঁটা
আকালে আগুনে / তৃষ্ণায় মাঠ / ফাটা।
মারী-কুকুরের / জিভ দিয়ে খেত / চাটা
বন্যার জল, / তবু ঝরে জল /
প্রলয় কাঁদনে / ভাসে ধরাতল /
মেলাবেন। /
তোমার আমার নানা সংগ্রাম,
দেশের দশের সাধনা, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
মেলাবেন।
জীবন, জীবন-মোহ,
ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ—
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।

দুপুর ছায়ায় ঢাকা,
সঙ্গী হারানো পাখি উড়ায়েছে পাখা,
পাখায় কেন যে নানা রং তার আঁকা।
প্রাণ নেই, তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা
মেলাবেন।
তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন।
মোটর গাড়ির চাকায় ওড়ায় ধুলো
যারা সরে যায় তারা শুধু—লোকগুলো;
কঠিন, কাতর, উদ্ধত, অসহায়,
যারা পায়, যারা সবই থেকে নাহি পায়,
কেন কিছু আছে বোঝানো, বোঝা না যায়—
মেলাবেন।
দেবতা তবুও ধরেছে মলিন ঝাঁটা.
স্পর্শ বাঁচায়ে পুণ্যের পথে হাঁটা,
সমাজ ধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা
ঝোড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়া দরজাটা
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন॥

——————

॥ নীতি-কবিতা ॥

॥ দুই উপমা ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[গতির মধ্যেই জীবন আর স্থিতিতেই মৃত্যু—কবি কবিতাটির মধ্য দিয়ে এই শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন। নদী তার স্রোত হারিয়ে ফেললে শৈবালদামের দ্বারা আকীর্ণ হয়ে মৃত আখ্যা পায়—অনুরূপভাবে অর্থহীন কুসংস্কারে আবদ্ধ জাতি সহজেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পয়ার ছন্দের কবিতা (৮।৬)]

যে নদী হারায়ে স্রোত / চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদাম / বাঁধে আসি তারে;
যে জাতি জীবন হারা / অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে / জীর্ণ লোকাচার।

সর্বজন সর্বক্ষণ / চলে যেই পথে
তৃণগুল্ম সেথা নাহি / জন্মে কোনোমতে ;
যে জাতি চলে না কভু / তারি পথ-'পরে
তন্ত্র মন্ত্র সংহিতায় / চরণ না সরে !

॥ যথার্থ আপন ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এই নীতি-কবিতাটি পয়ার ছন্দে লেখা। আমাদের সত্যিকারের আত্মীয় কে তা আমরা প্রায় সময়েই বুঝতে পারি না—চরম শিক্ষার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা ঐ জ্ঞান লাভ করি। পর্ব দুটি ; মাত্রা ৮'৬]

কুষ্মাণ্ডের মনে মনে / বড়ো অভিমান
বাঁশের মাচাটি তার / পুষ্পক বিমান।
ভুলেও মাটির পানে / তাকায় না তাই,
চন্দ্র সূর্য তারকারে / করে ভাই ভাই !
নভশ্চর ব'লে তার মনের বিশ্বাস,
শূন্যপানে চেয়ে তাই ছাড়ে সে নিশ্বাস।
ভাবে শুধু মোটা এই বোঁটাখানা মোরে
বেঁধেছে ধরার সাথে কুটুম্বিতা ডোরে !
বোঁটা যদি কাটা পড়ে তখনি পলকে
উড়ে যাব আপনার জ্যোতির্ময় লোকে।
বোঁটা যবে কাটা গেল, বুঝিল সে খাঁটি,
সূর্য তার কেহ নয়, সবই তার মাটি।

রক্ষক ও ভক্ষক ॥

কালিদাস রায়

[একটি গল্পের আশ্রয়ে কবি আমাদের নীতি শিক্ষা দিয়েছেন। রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তবে জীবন-মৃত্যু সমান হয়ে ওঠে। একটি বালক একজন রাজার জ্ঞানচক্ষু কিভাবে উন্মুক্ত করেছিলো তা এই কবিতায় দেখতে পাই।

কবিতাটিতে কিছু সংলাপ আছে। ঐ সংলাপগুলি আবৃত্তির সময় কণ্ঠে নাটকীয় ভঙ্গী আনতে হবে। বালকের উক্তিতে ব্যঙ্গের ছোঁয়াচ আবৃত্তিকারের কণ্ঠে যথাযথ রূপে ফুটে ওঠা চাই।]

অনেক কালের / কথা

রাজার হইল / নিদারুণ ব্যাধি, / বুকে দুঃসহ / ব্যথা।
রাজবৈদ্যেরা / বলিলেন—"প্রভু. / অসাধ্য এই / রোগ,
ঔষধে আর / হইবে না কিছু / করুন দৈব / যোগ।"
রাজপুরোহিত / বলিলেন—"প্রভু, / একটি উপায় / আছে
একটি বালকে / বলিদান দিন / মহাশক্তির / কাছে।
শাস্ত্রে যে সব / লক্ষণ আছে / অন্যথা নাহি / হয়,
মিলাইয়া দেখি, / পিতার নিকটে / করিয়া আনুন / ক্রয়।"
বহু সন্ধানে মিলিল বালক, রাশিরাশি ধনদানে
কিনিল নৃপতি কাঙাল জনক-জননীর সন্তানে।
পুরবিচারক দিলেন বিধান, "বালকের বলিদান
ধর্মবিরোধী নয় কোনদিন রাখিতে রাজার প্রাণ।"

অমাবস্যার রাতে

পূজাশেষ হ'ল বহুশত ছাগ মেষের শোণিতপাতে।
সবশেষে হবে বালকের বলি, আসিল তাহার পালা।
যূপে হাত রাখি' দাঁড়াল বালক কণ্ঠে জবার মালা।
খড়্গ হস্তে দাঁড়াল ঘাতক বিলম্ব নাই আর,
বালক হাসিয়া উঠিল সহসা একে একে চারিবার।

বিস্মিত হ'য়ে নৃপতি শুধালো, "কখনো দেখিনি হেন,
খড়্গের তলে দাঁড়ায়ে বালক, কি সুখে হাসিছ, কেন ?"
বলিল বালক, "শোন মহারাজ, মৃত্যুরে নাহি ডরি,
হাসিলাম আমি চারিবার তাই চারিটি বিষয় স্মরি'।
বিশ্বে কেহ ত আপনার নাই জনক-জননী সম,
অর্থের লোভে বেচিল তাহারা এমনি ভাগ্য মম।
হেন বিচিত্র দেখেছ জগতে ? অন্যায় প্রতিকার
করিবার তরে আছে এ-দেশের যাঁহার হস্তে ভার
তিনিই দিলেন বধের বিধান। দেশরক্ষক রাজা
নিখিল প্রজার যিনি আশ্রয় তাঁরি তরে মোর সাজা।
সর্বজীবের যিনি শরণ্য বিশ্বজননী যিনি
বিনা অপরাধে এই বালকের জীবন নেবেন তিনি।
হেন বিচিত্র ব্যাপার রাজন্‌ বিশ্বে দেখেছ কবে ?
এতে যদি হাসি নাহি পায়, বল, কিসে হাসি পাবে তবে ?
মরণ যখন অনিবার্যই হাসিয়াই চলে যাই,
রক্ষক যেথা ভক্ষক সেথা মরা সেত বাঁচিয়াই।"
রাজা বলিলেন, "ঘাতক, বালকে মুক্ত করিয়া দাও,
বালক, এখনি তব জননীর নিকটে ফিরিয়া যাও।
এ নিরপরাধ বালকে বধিয়া জীবন যদি বা পাই,—
অমর ত নই, ক'দিন বাঁচিব ?—সে জীবনে কাজ নাই!"

॥ স্বর্গ ও নরক ॥

সেখ ফজলুল করিম

আলোচ্য কবিতাটিও নীতি-কবিতা। কবি বলতে চেয়েছেন—প্রকৃত স্বর্গ বা নরক বহুদূরে নয়, তা আছে এই মানুষেরই পৃথিবীতে। আমাদের কর্মের দ্বারাই আমরা দেবতা বা দানবে পরিণত হই।

ছয় মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দে এই কবিতাটি রচিত। সুরের প্রবাহ সমগ্র কবিতার মধ্যে প্রবাহিত—আবৃত্তিকার তা যেন না ভোলে।]

কোথায় স্বর্গ / কোথায় নরক ! / কে বলে তা বহু / দূর ?
মানুষের মাঝে / স্বর্গ-নরক / —মানুষেতে সুরা / সুর !
রিপুর তাড়নে / যখনি মোদের / বিবেক পায় গো / লয়,
আত্মগ্লানির / নরক-অনলে / তখন পুড়িতে / হয়।
প্রীতি ও প্রেমের / পুণ্য-বাঁধনে / যবে মিলি পর / স্পরে,
স্বর্গ আসিয়া / দাঁড়ায় তখন / আমাদেরই কুঁড়ে / ঘরে।

॥ উপযুক্ত কাল ॥

রজনীকান্ত সেন

[নীতিমূলক এই কবিতাটির বক্তব্য এই যে, উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজ করলে ফললাভে বিঘ্ন ঘটে না। পয়ার ছন্দে (মাত্রা বিভাগ ৮।৬) কবিতাটি রচিত।]

শৈশবে সদুপদেশ / যাহার না রোচে,
জীবনে তাহার কভু / মূর্খতা না ঘোচে।
চৈত্র মাসে চাষ দিয়া / না বোনে বৈশাখে,
কবে সে হৈমন্তিক / ধান্য পেয়ে থাকে ?
সময় ছাড়িয়া দিয়া / করে পণ্ডশ্রম,
ফল চাহে, সেও অতি / নির্বোধ অধম।
খেয়াতরী চলে গেলে / বসে এসে তীরে ;
কিসে পার হবে, তরী / না আসিলে ফিরে ?

॥ হাস্যরসাত্মক কবিতা ॥

॥ জুতা আবিষ্কার ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এই কবিতায় জুতা আবিষ্কারের কাহিনী হাস্য ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। যেখানে বিখ্যাত পণ্ডিত, রথী-মহারথী বুদ্ধির দৌড়ে পরাজিত হলেন, সেখানে সামান্য একজন চর্মকার জুতা-আবিষ্কার করলো !

কবিতাটি পাঁচ মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দের। কবিতাটি বিলম্বিত লয়ে টেনে টেনে আবৃত্তি করতে হবে। সংলাপাংশ নাটকীয় ভঙ্গিতে আবৃত্তি করতে হবে। অর্থানুযায়ী আবৃত্তিকারের কণ্ঠ হাস্য এবং ব্যঙ্গের ছোঁয়ায় যেন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আবৃত্তিকারকে স্মরণ রাখতে হবে হাস্যমুখর বর্ণনার ক্ষেত্রে সে নিজে যেন হেসে না ফেলে।]

কহিলা হবু, / 'শুন গো গবু / রায়,
কালিকে আমি / ভেবেছি সারা / রাত্র,
মলিন ধুলা / লাগিবে কেন / পায়
ধরণী-মাঝে / চরণ ফেলা / মাত্র।
তোমরা শুধু / বেতন লহ / বাঁটি,
রাজার কাজে / কিছুই নাহি / দৃষ্টি।
আমার মাটি / লাগায় মোরে / মাটি,
রাজ্যে মোর / একি এ অনা / সৃষ্টি।
শীঘ্র এর / করিবে প্রতি / কার,
নহিলে কারো / রক্ষা নাহি / আর !

শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হল খুন,
দারুণ ত্রাসে ঘর্ম বহে গাত্রে।
পণ্ডিতের হইল মুখ চুন,
পাত্রদের নিদ্রা নাহি রাত্রে।
রান্নাঘরে নাহিক চড়ে হাঁড়ি,
কান্নাকাটি পড়িল বাড়ি-মধ্যে,
অশ্রুজলে ভাসায়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গবু হবুর পাদপদ্মে—
'যদি না ধুলা লাগিবে তব পায়ে
পায়ের ধুলা পাইব কি উপায়ে '

শুনিয়া রাজা ভাবিল দুলি দুলি,
কহিল শেষে, 'কথাটা বটে সত্য—
কিন্তু আগে বিদায় করো ধুলি
ভাবিয়ো পরে পদধুলির তত্ত্ব।
ধুলা-অভাবে না পেলে পদধুলা
তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথ্যে,
কেন বা তবে পুষিনু এতগুলা
উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে!
আগের কাজ আগে তো তুমি সারো,
পরের কথা ভাবিয়ো পরে আরো।'

আঁধার দেখে রাজার কথা শুনি,
যতনভরে আনিল তবে মন্ত্রী
যেখানে যত আছিল জ্ঞানী গুণী
দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী।
বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি,
ফুরায়ে গেল উনিশ-পিপে নস্য,
অনেক ভেবে কহিল, 'গেলে মাটি
ধরায় তবে কোথায় হবে শস্য!'
কহিল রাজা, 'তাই যদি না হবে,
পণ্ডিতেরা রয়েছে কেন তবে?'

সকলে মিলি যুক্তি করি শেষে
কিনিল ঝাঁটা সাড়ে-সতেরো লক্ষ,
ঝাঁটের চোটে পথের ধুলা এসে
ভরিয়া দিল রাজার মুখ বক্ষ।
ধুলায় কেহ মেলিতে নারে চোখ,
ধুলার মেঘে পড়িল ঢাকা সূর্য,
ধুলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
ধুলার মাঝে নগর হল উহ্য।
কহিলা রাজা, 'করিতে ধুলা দূর
জগত হল ধুলায় ভরপুর!'

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি।
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
নদীর জলে নাহিক চলে কিস্তি।
জলের জীব মরিল জল বিনা,
ডাঙার প্রাণী সাঁতার করে চেষ্টা।
পাঁকের তলে মজিল বেচা-কিনা,
সর্দিজ্বরে উজাড় হল দেশটা।
কহিল রাজা, 'এমনি সব গাধা
ধুলোরে মারি করিয়া দিল কাদা!'

আবার সবে ডাকিল পরামর্শে,
বসিল পুন যতেক গুণবন্ত—
ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্ষে,
ধুলার হায় নাহিক পায় অন্ত।
কহিল, 'মহী মাদুর দিয়ে ঢাকো,
ফরাশ পাতি করিব ধুলা বন্ধ।'
কহিল কেহ, 'রাজারে ঘরে রাখো,
কোথায় যেন না থাকে কোনো রন্ধ্র।
ধুলার মাঝে না যদি দেন পা
তা হলে পায়ে ধুলা তো লাগে না।'

কহিল রাজা, 'সে কথা বড়ো খাঁটি—
কিন্তু মোর হতেছে মনে সন্ধ,
মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবস রাত্রি রহিলে আমি বন্ধ।'
কহিল সবে, 'চামারে তবে ডাকি
চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী।
ধূলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি
মহীপতির রহিবে মহাকীর্তি।'
কহিল সবে, 'হবে সে অবহেলে,
যোগ্যমতো চামার যদি মেলে।'

রাজার চর ধাইল হেথা হোথা,
ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব কর্ম।
যোগ্যমতো চামার নাহি কোথা,
না মিলে তত উচিতমতো চর্ম।
তখন ধীরে চামার কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ
'বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।'

কহিল রাজা, 'এত কি হবে সিধে!
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশ-সুদ্ধ।'
মন্ত্রী কহে, 'বেটারে শূল বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখো রুদ্ধ!'
রাজার পদ চর্ম আবরণে
ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে।
মন্ত্রী কহে, 'আমারো ছিল মনে—
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে।'
সেদিন হতে চলিল জুতো পরা—
বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল ধরা॥

———

॥ শব্দকল্পদ্রুম ॥

সুকুমার রায়

[বাংলা ভাষার বিশিষ্টতা রয়েছে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে। প্রাকৃতিক নানা প্রকার ধ্বনির অনুকরণের মধ্য দিয়ে এই জাতীয় অনেক শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। এই জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে উপরিউক্ত কবিতাটিতে কবি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে হাস্যরসের সঞ্চার করেছেন।

কবিতাটি যে আবৃত্তি করবে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি (যেমন—ঠাশ্ ঠাশ্, দ্রুম দ্রুম, শাঁই শাঁই, বন বন, ইত্যাদি) তার কণ্ঠে যথোচিত ভঙ্গীতে ফুটে ওঠা চাই। অথ এবং বিরাম চিহ্ন অনুযায়ী কণ্ঠের বিশ্রাম তো দিতে হবেই, তবে 'ঝুপ ঝাপ ঝপা-স কিংবা 'গব গব গবা-স' ইত্যাদি পংক্তিগুলি ব্যবহারের সময় যথাযথ নাটকীয় ভঙ্গিমা আনতে হবে।]

ঠাশ্ ঠাশ্ দ্রুম দ্রাম / শুনি লাগে / খটকা,
ফুল ফোটে ? / তাই বলো ! / আমি ভাবি / পটকা !
শাঁই শাঁই / বন বন, / ভয়ে কান / বন্ধ—
ওই বুঝি / ছুটে যায় / সে ফুলের গন্ধ ?
হুড় মুড় ধুপধাপ—ওকি শুনি ভাই রে।
দেখছো না হিম পড়ে—যেও নাকো বাইরে।
চুপ চুপ ঐ শোন ঝুপ ঝাপ ঝপা-স।
চাঁদ বুঝি ডুবে গেলো ? গব গব গবা—স।
খ্যাঁশ খ্যাঁশ ঘ্যাঁচ, রাত কাটে ঐ রে।
দুড়দাড় চুরমার—ঘুম ভাঙে কই রে।
ঘর্ঘর ভন্ ভন্ ঘোরে কত চিন্তা।
কত মন নাচে শোন—ধেই ধেই ধিন্তা।
ঠুং ঠাং ঢং ঢং কত ব্যথা বাজে রে,
ফট ফট বুক ফাটে তাই মাঝে মাঝে রে।
হৈ হৈ মার মার বাপ বাপ চীৎকার—
মালকোচা মারে বুঝি ? সরে পড় এইবার !

॥ বিবিধ কবিতাবলী ॥

(ক) প্রাচীন ছড়া

[লোক-সাহিত্যের অন্যতম বিভাগ ছড়া। লোক-সাহিত্যের কোন রচয়িতা নেই। ছড়াগুলিরও কোন লেখক নেই। এগুলি কোন ব্যক্তির সৃষ্টি নয়—সমগ্র সমাজ-মানসেরই সৃষ্টি। এই ছড়াগুলি আবৃত্তির সময় কণ্ঠে শিশুসুলভ নমনীয়তা আনতে হবে এবং অত্যন্ত দ্রুত ছন্দে তাল দিয়ে দিয়ে পড়তে হবে।]

(১)

ঘুমপাড়ানি / মাসিপিসি/মোদের বাড়ী / যেয়ো।
বাটাভরা / পান দেব / গাল ভরে / খেয়ো ॥
শান-বাঁধানো / ঘাট দেব / বেশম মেখে / নেয়ো।
শীতল পাটি / পেড়ে দেব / পড়ে ঘুম / যেয়ো।
আম-কাঁটালের / বাগান দেব / ছায়ায় ছায়ায় /যাবে ॥
চার চার / বেয়ারা দেব / কাঁধে করে / নেবে।
দুই দুই / বাঁদী দেব / পায়ে তেল / দেবে ॥
উড়কি ধানের / মুড়কি দেব / নারেঙ্গ / ধানের খই।
গাছপাকা / রম্ভা দেব / হাঁড়ি ভরা দই ॥

(২)

আগডুম্ / বাগডুম / ঘোড়াডুম / সাজে।
ঢাঁই / মিরগেল / ঘাঘর / বাজে ॥
বাজতে / বাজতে / প'ল (চলল) / ঢুলি।
ঢুলি / গেল কমলা / ফুলি ॥
আয় রে কমলা হাটে যাই।
পান গুয়োটা কিনে খাই ॥
কচি কুমড়োর ঝোল।
ওরে জামাই গা তোল ॥
জ্যোৎস্নারাতে ফটিক ফোটে, কদমতলায় কে রে।
আমি তো বটে নন্দ ঘোষ, মাথায় কাপড় দে রে।

(৩)

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।
ধান দেব মেপে
নেবুর পাতা করমচা।
যা বৃষ্টি ধরে যা ॥

(৪)

বৃষ্টি পড়ে / টাপুর টুপুর / নদী এল / বান।
শিব ঠাকুরের / বিয়ে হল / তিন কন্যে / দান ॥
এক কন্যে / রাঁধেন বাড়েন / এক কন্যে / খান।
এক কন্যে / গোঁসা করে / বাপের বাড়ী / যান ॥
বাপেদের তেল হলুদ মালীদের ফুল।
এমন খোঁপা বেঁধে দেবো হাজার টাকা মূল ॥

(৫)

আমায় কথাটি / ফুরা'ল।
ন'টে গাছটি / মুড়োল ॥
কেন রে নটে / মুড়োলি ?
গরুতে কেন / খায় ?
কেন রে গরু / খাস ?
রাখাল কেন চরায় না ?
কেন রে রাখাল চরাস না ?
বৌ কেন ভাত দেয় না ?
কেন লো বৌ ভাত দিস না ?
কলাগাছ কেন পাত ফেলে না ?
কেন রে কলাগাছ পাত ফেলিস না ?
বৃষ্টি কেন হয় না ?
কেন রে বৃষ্টি হোস্ না ?
ব্যাঙ কেন ডাকে না ?
কেন রে ব্যাঙ ডাকিস না ?
সাপে কেন খায় ?
কেন রে সাপ খাস ?
খাবার ধন খাব নি ?
গুড় গুড়ুতে যাব নি ?

(খ) শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের অংশবিশেষ

[রামায়ণ ও মহাভারত থেকে উদ্ধৃত অংশ দুটোই পয়ার ছন্দে লেখা ; মাত্রা বিভাগ ৮।৬। কিন্তু '৩' নং উদাহরণটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। যতির দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় পয়ার এবং অমিত্রাক্ষরের কাঠামো একই। কিন্তু ছেদের দিকে তাকালে দুইয়ের পার্থক্য ধরা পড়ে। ওই উদাহরণটিতে একটি দাঁড়ি অর্ধযতি, দুটি দাঁড়ি পূর্ণযতি এবং একটি তারকা উপচ্ছেদ ও দুটি তারকা পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। একঝোঁকে যতখানি চরণাংশ উচ্চারণ করা যায় সেই অনুসারে যতি পড়ে আর বাক্যের অর্থানুসারে ছেদ পড়ে। এই উদাহরণটিতে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে একেবারে তৃতীয় পংক্তিতে 'অকালে'র পর। উদাহৃত কাব্যাংশটি চিহ্ন অনুযায়ী আবৃত্তিকারকে সঠিক ভাবে পড়তে হবে। আবৃত্তির সময় ঠিক মত বিরতি দিতে না পারেলে আবৃত্তি ব্যর্থ হবে।

আরও উদাহরণের জন্য শ্রীরামের অত্রিমুনির আশ্রম গমন (রামায়ণ), দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র (মহাভারত) এবং ইন্দ্রজিতের যজ্ঞগৃহে লক্ষ্মণ (মেঘনাদবধ) কবিতাসমূহ দ্রষ্টব্য। পাঠ-সংকলনে (১ম খণ্ড) কবিতাগুলি আছে।]

(১)

তিন লক্ষ রাক্ষস চা/পিয়া লেজ ধরে ।
সবে মেলি লেজ ফেলে / ভূমির উপরে ।।
ত্রিশ মণ-বস্ত্র সবে / আনিল নিকটে ।
এত বস্ত্র আনে এক / বেড় নাহি আঁটে ।।
লঙ্কার মধ্যেতে ছিল যতেক কাপড় ।
ঘৃত তৈল দিয়া তাহা করিল জাবড় ।।
কাপড় তিতিল লেজ পড়িল ভূতলে ।
লেজে অগ্নি দিতে সব দপ্ দপ্ জ্বলে ।।
লেজে অগ্নি দিল দেখি হনুমান হাসে ।
আপন বুদ্ধিতে বেটা পড়ে সর্বনাশে ।।

(কৃত্তিবাসের রামায়ণ ঃ হাস্যরস)

(২)

রাক্ষসের বাক্য ভীম / না শুনিয়া কানে ।
পৃষ্ঠ দিয়া তারে অন্ন / পুরেন বদনে ।।
দেখি ক্রোধে নিশাচর / করয়ে গর্জন ।
ঊর্ধ্ববাহু করি ধায় / অতি ক্রোধমন ।।
দুই হাতে বজ্রসম পৃষ্ঠেতে প্রহারে ।
তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাহি বীর বৃকোদরে ।।
পৃষ্ঠেতে রাক্ষস মারে সহেন হেলায় ।
পায়সান্ন খান বীর বসি নিঃশঙ্কায় ।।
দেখিয়া অধিক ক্রোধ হৈল নিশাচরে ।
বৃক্ষ উপাড়িয়া হানে ভীমের উপরে ।।
তথাপিহ অন্ন খান হাসি বৃকোদর ।
বাম হাতে কাড়িয়া নিলেন তরুবর ।।

(কাশীরাম দাসের মহাভারত ঃ বীর ও হাস্যরস)

(৩)

সম্মুখ সমরে পড়ি । বীরচূড়ামণি ।।
বীরবাহু চলি যবে । গেলা যমপুরে ।।*
অকালে, * * কহ, * হে দেবি, * । অমৃতভাষিণী ! ।।
কোন্ বীরবরে বরি । সেনাপতিপদে ।।
পাঠাইলা রণে পুনঃ ।। রক্ষঃকুলনিধি ।।*
রাঘবারি ? * * কি কৌশলে । রাক্ষসভরসা ।।
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে, * অজেয় জগতে ।।*
ঊর্মিলাবিলাসী নাশি । ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা ? ।। * *

(মধুসূদনের মেঘনাদবধ)

(গ) বিভিন্ন অনুভূতির কবিতা

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[আবৃত্তিযোগ্য সুন্দর একটি কবিতা। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কেমন ভাবে হলো, তার অপূর্ব পরিচয় এখানে বিধৃত। স্বপ্নভঙ্গের পর নির্ঝরের মনোভাবের রূপায়ণ—তার বিদ্রোহ, তার আকুলতা, তার প্রাণের প্রকাশে কবিতাটি জ্বলজ্বল করছে। সমালোচকেরা বলেছেন, এ স্বপ্নভঙ্গ কবি রবীন্দ্রনাথেরও স্বপ্নভঙ্গ—নির্ঝরের উক্তির মধ্য দিয়ে কবিসত্তারই প্রকাশ ঘটেছে।

আবৃত্তিকারের কণ্ঠে বিভিন্ন সুরের খেলা চলবে। এ কবিতা আবৃত্তির সংগে সংগে অর্থ এবং ভাবানুযায়ী যথাস্থানে বিরতি দিতে হবে। এই কবিতায় অনেকগুলি আবেগাত্মক অংশ আছে। যেমন, 'জাগিয়া উঠেছে প্রাণ······কিসের ডর' অথবা শেষ স্তবক। এই সমস্ত স্থানে আবেগাত্মক ভংগীতে কণ্ঠস্বরকে ধীরে ধীরে উচ্চগ্রামে তুলতে হবে। আবার আমি ঢালিব করুণাধারা····· ইত্যাদি পংক্তিগুলো আবৃত্তির সময় কণ্ঠস্বরে দোলায়মান একটা ভংগী এবং নমনীয়তা আনতে হবে।]

আজি এ প্রভাতে / রবির কর
কেমনে পশিল / প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল / গুহার আঁধারে / প্রভাত পাখির / গান!
না জানি কেন রে / এত দিন পরে / জাগিয়া উঠিল / প্রাণ!

জাগিয়া উঠেছে / প্রাণ,
ওরে, উথলি উঠেছে / বারি,
ওরে, প্রাণের বেদনা / প্রাণের আবেগ / রুধিয়া রাখিতে / নারি।

থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়—
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার।

কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন !
ভাঙ্ রে হৃদয়, ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের 'পরে আঘাত কর্ ।

মাতিয়া যখন উঠেছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ !
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর ।

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা ।

কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরাণ ঢালি ।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি ।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—প্রাণ হয়ে আছে ভোর ॥
কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান ।
ওরে চারিদিকে মোর
একী কারাগার ঘোর,
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর ।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর ॥

॥ প্রলয়োল্লাস

নজরুল ইসলাম

[প্রলয়োল্লাস নজরুল ইসলামের অনেক কবিতার মতই একটি চড়া সুরের কবিতা। প্রলয়ের ভয়াবহতা এবং উল্লাসের প্রাচুর্য এই কবিতার মূল-সুর। কণ্ঠস্বরে এই দুটি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে হবে। প্রচণ্ড বিক্রম নিয়ে অসুন্দর আর জরাজীর্ণ সব কিছুকেই উড়িয়ে নিয়ে আসছে নতুন। তার রূপ হয়তো ভয়ংকর কিন্তু এই চিরসুন্দর ভাঙতে যেমন জানে, তেমন গড়তেও জানে। আবৃত্তিকারের কণ্ঠ এই কবিতার প্রায়ক্ষেত্রেই উচ্চগ্রামে থাকবে। কেবল কবিতার শেষ দুটি স্তবকে ধ্বংসের মধ্যেও যে সৃজনের বেদনার কথা কবি বলেছেন, কণ্ঠে সেই আশ্বাস ফুটিয়ে তুলে কবির মনোভাবের যথাযথ রূপদান করতে হবে।

কবিতাটিতে অনেকগুলি শক্ত শব্দ আছে। ঐ সমস্ত কঠিন শব্দের এবং অনুপ্রাসের (অর্থাৎ একটি বর্ণের পুনঃ পুনঃ বিন্যাস আছে যে সমস্ত শব্দে) সুস্পষ্ট উচ্চারণ প্রয়োজন। যেমন, সিংহদ্বারে. ধূম্ররূপে, অট্টরোলের হট্টগোলে, বহ্নি-জ্বালা, পিঙ্গল, মাভৈঃ মাভৈঃ, রক্ত-তড়িৎ চাবুক, হ্রেষার কাঁদন ইত্যাদি।]

তোরা সব / জয়ধ্বনি / কর !
তোরা সব / জয়ধ্বনি / কর !!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে / কাল-বোশেখীর ঝড়।
তোরা সব / জয়ধ্বনি কর !
তোরা / সব জয়ধ্বনি / কর !
তোরা সব—জয়ধ্বনি / কর ।।

আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহ দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল।
মৃত্যু-গহন অন্ধ কূপে
মহাকালের চণ্ড রূপে—
ধূম্ররূপে
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ংকর—
ওরে ঐ হাসছে ভয়ংকর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

ঝামর তাহার কেশর দোলায় ঝাপটা মেরে গগন দুলায়,
সর্বনাশী জ্বালামুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায়।
বিশ্বপিতার বক্ষ-কোলে
রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে
দোদুল দোলে
অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর—
ওরে ঐ স্তব্ধ চরাচর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়,
দিগন্তের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়।
বিন্দু তাহার নয়ন-জলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে
কপোল-তলে !
বিশ্বমায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর পর—
হাঁকে ঐ "জয় প্রলয়ংকর।"
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

মাভৈঃ মাভৈঃ ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে !
জরায় মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ লুকানো ঐ বিনাশে !
এবার মহানিশার শেষে
আসবে উষা অরুণ হেসে
করুণ বেশে !

দিগম্বরের জটায় লুকায় শিশু-চাঁদের কর
আলো তার এবার ভরবে এবার ঘর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

ঐ সে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িত-চাবুক হানে,
ধ্বনিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্রগানে ঝড়-তুফানে !
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে
গগন তলের নীল খিলানে।
অন্ধকারার বন্ধ কূপে
দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে
পাষাণ-স্তূপে।
এই তো রে তাঁর আসার সময় ঐ রথ ঘর্ঘর—
শোনা যায় ঐ রথ-ঘর্ঘর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ? প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন
আনছে নবীন—জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন !
তাই সে এমন কেশে-বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে—
মধুর হেসে !
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

ঐ ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তরে ডর ?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !—
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর !
কাল ভয়ংকরের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

॥ প্রশ্ন ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কবিতাটি প্রায়ই আবৃত্তি করতে বলা হয়ে থাকে। এই কবিতায় কবির অনুভূতির তীব্রতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। কবির মনে আজ প্রশ্ন উঠেছে, চতুর্দিকে এত অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, তবু কি ঈশ্বরের মহনীয়তায় বিশ্বাস রাখতে হবে ? ঈশ্বরের কাছে তাঁর আকুল জিজ্ঞাসা, যারা ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে উদ্যত, তিনি কি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ?

কবিতাটির প্রথম স্তবক ধীর লয়ে, দ্বিতীয়টি দ্রুত লয়ে এবং তৃতীয়টি বিলম্বিত লয়ে আবৃত্তি করতে হবে। কবির প্রশ্নের আকুলতা ও আবেগ যেন আবৃত্তিকারের কণ্ঠে যথাযথ রূপে প্রকাশ পায়।]

ভগবান তুমি / যুগে যুগে দূত / পাঠায়েছ বারে / বারে
দয়াহীন সং / সারে—
তারা বলে গেল / 'ক্ষমা করো সবে,' / বলে গেল 'ভালো / বাসো'—
'অন্তর হতে / বিদ্বেষ বিষ / নাশো।'
বরণীয় তারা, / স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির / দ্বারে
আজি দুর্দিনে / ফিরানু তাদের / ব্যর্থ নমস্ / কারে ॥

আমি যে দেখেছি, গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি, প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু, তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে ॥

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীত হারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে ;
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?

(ঘ) বিখ্যাত কবিতার অংশবিশেষ

(১)

আমি পরাণের সাথে / খেলিব আজিকে / মরণ খেলা
নিশীথবেলা।
সঘন বরষা /, গগন আঁধার,
হেরো বারিধারে / কাঁদে চারিধার—
ভীষণ রঙ্গে / ভবতরঙ্গে / ভাসাই ভেলা ;
বাহির হয়েছি / স্বপ্ন শয়ন / করিয়া হেলা
রাত্রিবেলা ।।

(ঝুলন : রবীন্দ্রনাথ)

(২)

ছিনু মোরা, সুলোচনে, / গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা / উচ্চ-বৃক্ষ চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে ; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী—মর্তে / সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা / লক্ষ্মণ-সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার / ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার ? / যোগাতেন আনি
নিত্য ফল-মূল বীর / সৌমিত্রি ; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু ; / কিন্তু জীব-নাশে
সতত বিরত, সখি / রাঘবেন্দ্র বলী—
দয়ার সাগর নাথ / বিদিত জগতে !

(সীতার পঞ্চবটী বাস : মধুসূদন)

(৩)

হবে, হবে, হবে জয়/— হে দেবী, করি নে ভয়/
হব আমি জয়ী ।।
তোমার আহ্বান বাণী / সফল করিব রাণী, /
হে মহিমাময়ী ।।
কাঁপিবে না ক্লান্ত কর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা—
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি রব জাগি,
দীপ নিবিবে না ।।

কর্মভার নবপ্রাতে নব সেবকের হাতে
করি যাব দান—
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান ॥

(অশেষ ঃ রবীন্দ্রনাথ)

(৪)

কৃষ্ণকলি / আমি তারেই / বলি,
কালো তারে / বলে গাঁয়ের / লোক।
মেঘলা দিনে / দেখেছিলেম / মাঠে
কালো মেয়ের / কালো হরিণ / চোখ
ঘোমটা মাথায় / ছিল না তার / মোটে,
মুক্ত বেণী / পিঠের 'পরে / লোটে।
কালো ? তা সে / যতই কালো / হোক,
দেখেছি তার / কালো হরিণ / চোখ।

(কৃষ্ণকলি ঃ রবীন্দ্রনাথ)

(৫)

গগনে গরজে মেঘ, / ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি / নাহি ভরসা
রাশি রাশি ভারা ভারা / ধান-কাটা হল / সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা / খরপরশা—
কাটিতে কাটিতে ধান / এল বরষা !

(সোনার তরী ঃ রবীন্দ্রনাথ)

(৬)

বন্ধু গো, আর / বলিতে পারি না, / বড় বিষ জ্বালা / এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া / ক্ষেপিয়া গিয়াছি, / তাই যাহা আসে / কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে / পারি না তো একা
তাই লিখে যাই / এ রক্ত লেখা,
বড় কথা বড় ভাব / আসে নাকো মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে !
অমর কাব্য তোমরা লিখিও বন্ধু, যাহারা আছ সুখে।

(আমার কৈফিয়ৎ ঃ নজরুল)

(৭)

বাঙালী দিয়াছে ভারতকে সেরা / কবি,
বাঙালী দিয়াছে ভারতকে সেরা / ছবি।
বাঙালী দিয়াছে / দরদী বৈজ্ঞা / নিক,
বীর সন্ন্যাসী, / বাগ্মী অলৌ / কিক।
দেছে অনশনে দৃঢ়পণে তনুত্যাগী।
দেশবন্ধু ও জেতা নেতা অনুরাগী।
বাঙালী ঘটালো অঘটন দুনিয়ায়,
অদল-বদল পূজারী ও দেবতায়।

(বাঙালী : কুমুদরঞ্জন মল্লিক)

(৮)

হে মহাজীবন / আর এ কাব্য / নয়,
এবার কঠিন, / কঠোর গদ্য / আনো,
পদ লালিত্য / ঝঙ্কার মুছে / যাক
গদ্যের কড়া / হাতুড়িকে আজ / হানো
প্রয়োজন নেই / কবিতার স্নিগ্ / ধতা
কবিতা তোমায় / দিলাম আজকে / ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে / পৃথিবী গদ্য / ময়
পূর্ণিমা চাঁদ / যেন ঝলসানো / রুটি।

(হে মহাজীবন : সুকান্ত ভট্টাচার্য)

(৯)

বিধাতা, জানো না তুমি / কী অপার পিপাসা / আমার
অমৃতের তরে ॥
না-হয় ডুবিয়া আছি / কৃমিঘন পঙ্কের / সাগরে,
গোপন অন্তর মম / নিরন্তর সুধার / তৃষ্ণায়
শুষ্ক হয়ে আছে / তবু।
না-হয় রেখেছো বেঁধে / ; তবু জেনো শৃঙ্খলিত / ক্ষুদ্র হস্ত মোর
উধাও আগ্রহভরে / ঊর্ধ্বনভে উঠিবারে / চায়
অসীমের নীলিমারে / জড়াইতে ব্যগ্র আলি / ঙ্গনে।

(বন্দীর বন্দনা : বুদ্ধদেব বসু)

(১০)

মশায় !
দেশান্তরী / করলে আমায়/
কেশ নগরের / মশায় ।
কেশ নগরের / মশায় সাথে/
তুলনা কার / চালাই ?
বাঘের গায়ে / বসলে মশা/
বাঘ বলে সে / "পালাই ।"/
জাপানিরা / ভাঙ্গলো কেন/
খবরটা কি / রাখেন ?
কেশ নগরের / মশার মামা/
ইস্কলেতে / থাকেন ।

(মশায় : অন্নদাশঙ্কর রায়)

(১১)

এ রকম আমাদের / অনেকেরই ঘটে
দঃখের বিষয় / ঘটনাটি প্রায়ই আমরা / ফেলে দিই,
মারা যায় দিনের / ট্রাফিকে ।
দিশেহারা গোলমালে / আমাদের প্রত্যহই / ধ্যান ভাঙে,
অথচ ধ্যানের / নীল আকাশই তো চাই / লালদীঘিতে / এসপ্লানেডে
মন চাই জ্ঞানে কাজে / আপিসে বাজারে / কলে মিলে/
দপ্তরে চত্বরে / উল্লাসে সংকটে / গান চাই
প্রাণ চাই গান চাই / শেয়ালদার শেডে ।।

(গান : বিষ্ণু দে)

॥ উত্তর দাও ॥

১। 'সাহিত্য' বলতে কি বোঝ ? সাহিত্যের প্রতি মানুষের অনুরাগের কারণ কি ?
[উত্তর : পৃষ্ঠা ১—২]
২। কবিতা কা'কে বলে ? কবিতা পাঠ করার নিয়ম কি ?
[উত্তর : পৃষ্ঠা ২—৩]
৩। আবৃত্তি কা'কে বলে ? কবিতার রস উপভোগ করবার পথে আবৃত্তির প্রয়োজন কতটুকু ? কাব্যপাঠে আবৃত্তির স্থান নির্ণয় কর।
[উত্তর : পৃষ্ঠা ৩—৪]

৪। আবৃত্তিকার কি ভাবে আবৃত্তি করতে এগিয়ে আসবে ?
[উত্তর ঃ পৃষ্ঠা ৪]

৫। সার্থকভাবে আবৃত্তি করবার পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে তুমি কি কি করবে ?
[উত্তর ঃ পৃষ্ঠা ৪ - ৬]

৬। 'ছন্দ' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।
[উত্তর ঃ পৃষ্ঠা ৬—৮]

৭। কবিতাকে সাধারণতঃ কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ? প্রত্যেকটি ভাগের নাম কর।
[উত্তর ঃ পৃষ্ঠা ১৩—১৪]

৮। 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি কার লেখা ? কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাও তো ?
[উত্তর ঃ পৃষ্ঠা ৯—১৩]

৯। 'রানার' কবিতার প্রথমাংশ কিংবা 'আমি কবি' কবিতাটির শেষাংশটি আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ পৃষ্ঠা ৩৪ এবং ৩৭]

১০। পাঠ-সংকলন (প্রথম খণ্ড) থেকে তোমার জানা যে কোন একটি কবিতার অংশ বিশেষ আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ পৃষ্ঠা ৯—১১]

১১। কবি এবং কবিতার নাম বলে, তোমার জানা যে কোন একটি কবিতার দুটি স্তবক আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আষাঢ়' ; পৃষ্ঠা ১৪—১৫]

১২। একটি নিসর্গ বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ ঝরনা ; পৃষ্ঠা ১৬]

১৩। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি নিসর্গ বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ ঐ]

১৪। শারদ প্রকৃতির রূপ প্রকাশিত হয়েছে, এমন একটি কবিতা আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের চিত্রশরৎ ; পৃষ্ঠা ১৯—২০]

১৫। রবীন্দ্রনাথের একটি নিসর্গ বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ আষাঢ় ; পৃষ্ঠা ১৫—১৬]

১৬। কবির নাম সহ যে-কোন একজন মহিলা কবির একটি নিসর্গ বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ বর্ষাসুন্দরী—মানকুমারী বসু ; পৃষ্ঠা—১৭]

১৭। প্রকৃতি বিষয়ক যে কোন একটি সনেট আবৃত্তি কর। সনেট কাকে বলে ?
[উত্তর ঃ অশোকতরু—দেবেন্দ্রনাথ সেন ; পৃষ্ঠা—১৮]

১৮। একজন আধুনিক কবির একটি নিসর্গমূলক কবিতা আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ ঘাস ঃ জীবনানন্দ দাশ ; পৃষ্ঠা—২০]

১৯। একটি দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃত্তি কর। কবিতাটি কোন কবির লেখা ?
[উত্তর ঃ স্বাধীনতা—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃষ্ঠা—২২]

২০। রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ বঙ্গমাতা—পাঠ-সংকলন ; পৃষ্ঠা—২৮]

২১। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা একটি দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ আমার দেশ ; পৃষ্ঠা—২১-২২]

২২। কোন মহিলা কবির একটি দেশাত্মবোধক কবিতা শোনাও তো !
[উত্তর ঃ মায়ের প্রতি ; পৃষ্ঠা—২৩]

২৩। একজন আধুনিক কবির লেখা একটি দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ আবার আসিব ফিরে ; পৃষ্ঠা—২৩-২৪]

২৪। মহাপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়েছে এমন একটি কবিতা আবৃত্তি কর। কবির নাম বল।
[উত্তর ঃ সাগর তর্পণ—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ; পৃষ্ঠা—২৬-২৮]

২৫। মধুসূদন দত্তের লেখা মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপক একটি কবিতা আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ কাশীরাম দাস ; পৃষ্ঠা—২৫]

২৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপক একটি কবিতা আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ; পৃষ্ঠা—২৬]

২৭। একজন আধুনিক কবির লেখনীতে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছেন, দেখাও।
[উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথের প্রতি ; পৃষ্ঠা—২৮]

২৮। একটি আত্মজীবনী বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি কর। কবির নাম কি ?
[উত্তর ঃ আত্মবিলাপ—মাইকেল মধুসূদন দত্ত ; পৃষ্ঠা—২৯-৩০]

২৯। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক কোন কবিতার অংশ বিশেষ আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ পত্রপুট কাব্যগ্রন্থের 'তিন' সংখ্যক কবিতা ; পৃষ্ঠা—৩১-৩২]

৩০। এমন একটি কবিতা আবৃত্তি কর যাতে কৃষকের জীবনের দুঃখ-বেদনা বিবৃত হয়েছে। কবিতাটির রচয়িতার নাম কি ?
[উত্তর ঃ চাষার বেগার—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ; পৃষ্ঠা— ৩২-৩৩ অথবা দুই বিঘা জমি—রবীন্দ্রনাথ ; পৃষ্ঠা—৯]

৩১। শ্রমজীবী মানুষের জীবন কাহিনী বিবৃত হয়েছে এমন একটি কবিতা আবৃত্তি কর। কবির নাম কি ?
[উত্তর ঃ রানার—সুকান্ত ভট্টাচার্য ; পৃষ্ঠা—৩৪]

৩২। একজন অবহেলিত মানুষের মহত্ব-জ্ঞাপক কবিতা আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ পুরাতন ভৃত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; পাঠ-সংকলন ঃ পৃষ্ঠা—২৩]

৩৩। অবহেলিত মানুষের কথা বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের এমন একটি কবিতার অংশ বিশেষ আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ ওরা কাজ করে ; পৃষ্ঠা—৫৯]

৩৪। সমগ্র মানব জাতির জয়গান করা হয়েছে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এমন একটি কবিতা আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ জাতির পাঁতি ; পৃষ্ঠা—৩৮]

৩৫। সমগ্র মানব জাতিকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে বলছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের এমন একটি কবিতা আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ আহ্বান ; পৃষ্ঠা ২৪]

৩৬। একটি ভক্তিমূলক কবিতা আবৃত্তি কর। কবির নাম কি ?
[উত্তর ঃ প্রার্থনা, রজনীকান্ত সেন ; পৃষ্ঠা—৪১-৪২]

৩৭। ঈশ্বরের প্রতি অসীম বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে এমন একটি কবিতার নাম কর। কবিতাটি আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ সংগতি ; পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪। অথবা সান্ত্বনা ; পৃষ্ঠা ৪২-৪৩]

৩৮। একটি পদাবলী আবৃত্তি কর। পদকর্তার নাম কি ?
[উত্তর ঃ প্রার্থনা ; পৃষ্ঠা—৪০ ; পদকর্তার নাম—বিদ্যাপতি]

৩৯। একটি নীতি কবিতা আবৃত্তি কর। কবির নাম কি ?
[উত্তর ঃ রক্ষক ও ভক্ষক ; পৃষ্ঠা—৪৬-৪৭, কবির নাম—কালিদাস রায়।]

৪০। রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি নীতি কবিতা আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ দুই উপমা বা যথার্থ আপন ; পৃষ্ঠা—৪৪-৪৫]

৪১। কোনো মুসলমান কবি লিখিত একটি নীতি কবিতা আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ স্বর্গ ও নরক ; পৃষ্ঠা—৪৭]

৪২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতাটি আবৃত্তি কর। এটি কি জাতীয় কবিতা ?
[উত্তর ঃ পৃষ্ঠা—৪৮ ; এটি হাস্যরসাত্মক কবিতা]

৪৩। সুকুমার রায়ের একটি হাস্যরসাত্মক কবিতা আবৃত্তি করে শোনাও তো।
[উত্তর ঃ শব্দকল্পদ্রুম ; পৃষ্ঠা—৫২]

৪৪। একটি প্রাচীন ছড়া আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ পৃষ্ঠা—৫৩-৫৪]

৪৫। ঘুম পাড়ানি একটি ছড়া আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ ১নং ছড়া ; পৃষ্ঠা—৫৩]

৪৬। খেলাধুলা সংক্রান্ত একটি ছড়া শোনাও।
[উত্তর ঃ পৃষ্ঠা—৫৩]

৪৭। বাংলা ভাষায় রামায়ণের শ্রেষ্ঠ কবি কে ? তাঁর রামায়ণ হতে কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ কৃত্তিবাস ; শ্রীরামের অত্রিমুনির আশ্রম গমন ; পাঠ সংকলন—পৃষ্ঠা—৭। অথবা পৃষ্ঠা—৫৫ ; ১ নং কবিতা]

৪৮। বাংলা ভাষায় রচিত মহাভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁর কাব্য হতে কয়েক পংক্তি আবৃত্তি কর।

[উত্তর ঃ কাশীরাম দাস, দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র ; পাঠ-সংকলন—পৃষ্ঠা—১১। অথবা ২ নং কবিতা ; পৃষ্ঠা—৫৫]

৪৯। বাংলা ভাষার আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের নাম কি? কাব্যটি কোন্ কবি রচনা করেন? কোন্ ছন্দে কাব্যটি রচিত? কাব্যটির কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি কর।

[উত্তর ঃ মেঘনাদবধ কাব্য। মাইকেল মধুসূদন কাব্যটি রচনা করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যটি রচিত।

ইন্দ্রজিতের যজ্ঞগৃহে লক্ষ্মণ ; পাঠ-সংকলন ; পৃষ্ঠা—১২, অথবা ৩ নং কবিতা—পৃষ্ঠা—৫৫]

৫০। সনেট্ (চতুর্দশপদী কবিতা) কাকে বলে? একটি সনেট্ আবৃত্তি কর। কে এটি রচনা করেছেন?

[উত্তর ঃ পৃষ্ঠা—২৫ ; কাশীরাম দাস—মধুসূদন দত্ত ; পৃষ্ঠা—২৫ অথবা, অশোকতরু—দেবেন্দ্রনাথ সেন ; পৃষ্ঠা—১৮]

৫১। হাস্যরস প্রকাশিত হয়েছে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ হতে এমন একটি অংশ আবৃত্তি কর।

[উত্তর ঃ পৃষ্ঠা—৫৫ ; ১নং কবিতা]

৫২। তোমার ভাল লাগে এমন একটি কবিতা আবৃত্তি কর।

[উত্তরঃ তোমার ভাল লাগে এমন যে কোন কবিতা তুমি আবৃত্তি করতে পারো। তবে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ (পৃঃ—৫৬-৫৭) অথবা, প্রলয়োল্লাস (পৃষ্ঠা—৫৮-৬০) আবৃত্তির পক্ষে উপযুক্ত কবিতা।]

৫৩। কুমুদরঞ্জন মল্লিক অথবা নজরুল ইসলামের যে কোন কবিতার অংশ বিশেষ আবৃত্তি কর।
[উত্তর ঃ পৃষ্ঠা—৬৪, ৬০]

৫৪। সুকান্ত ভট্টাচার্য, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু অথবা বিষ্ণু দে'র যে কোন কবিতার যে কোন অংশ আবৃত্তি করে শোনাও।

[উত্তর ঃ পৃষ্ঠা—৬৪, ৬৫]

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ গদ্য—আবৃত্তি ও পাঠ ॥

গদ্য এবং কবিতা—দুই-ই সাহিত্যের বাহন। কবিতা সাধারণতঃ পদ্যে লিখিত হয়। কারণ কাব্যের ভাষা আবেগের ভাষা—আবেগ পদ্যের মাধ্যমেই যথাযথ স্ফূর্তি লাভ করে; আর গদ্য যুক্তির ভাষা—গদ্যে আবেগের চেয়ে যুক্তিই বেশী প্রাধান্য পায়।* ইংরেজ কবি কোলরিজ্ (Coleridge) গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন: "Prose is words in their best order, Poetry is the best words in the best order" অর্থাৎ শব্দসমূহ সুপরিকল্পিত ভাবে বিন্যস্ত হলে গদ্য হয় এবং যথাযথ শব্দের যথাযথ বিন্যাসই হল পদ্য। গদ্যে মানুষের চিন্তা-ভাবনা মতামত যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে সরাসরি প্রকাশিত হয়, কিন্তু পদ্য ভাষার অতীত অন্য কিছুকেও যেন প্রকাশ করে।

কোন নির্দিষ্ট বিষয় ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ বা আলোচনা করতে হলে গদ্যই সার্থক বাহন। জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করতে হলে আমাদের গদ্যের আশ্রয়ই নিতে হয়। কিন্তু সার্থক লেখকের কলমে কঠোর-কঠিন বিষয়ও রচনার গুণে রমণীয় হয়ে ওঠে। অথাৎ গদ্য ও কবিতা উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সৌষম্য আছে।

বাংলা গদ্য সৃষ্টির পরমুহূর্তেই বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত প্রাণ-স্পন্দন তথা বিশেষ ছন্দোস্রোত ধরতে পেরেছিলেন। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'গদ্যের পদগুলির একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা-গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি হতে এ কথা স্পষ্ট যে, গদ্যে অনতিলক্ষ্য ছন্দোস্রোত প্রবাহিত করতে হলে তাদের পর্ব বা পদের মধ্যে ধ্বনি-সামঞ্জস্য রক্ষা করা দরকার এবং পদ-বিভাগের ক্ষেত্রে যতিস্থাপনে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম চাই। পরবর্তী কালে বিভিন্ন লেখক এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁদের সাহিত্য রচনা করেছেন। সুতরাং এই দিকে লক্ষ্য রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের গদ্য থেকে আবৃত্তি ও পাঠ অভ্যাস করতে হবে।

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিত্বের সার্মাগ্রক বিকাশ এবং সমাজ চেতনার উন্মেষ সাধন। এই বিষয়ে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ শিশু-মানুষের প্রথম ভাব-ভাবনা মাতৃভাষাকে আশ্রয় করেই প্রকাশিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে ঘটনা এবং পারিবেশকে অবলম্বন করে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিশুর মনে ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে; এইভাবে যুগপরম্পরায় সামাজিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ হতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বংশানুক্রমিক ভাবে ধারাটি প্রবাহিত হয়ে চলে। এই সমস্ত কারণে মাতৃভাষার শিক্ষাদানের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

মাতৃভাষা ও সাহিত্য চর্চার এই গুরুত্বের কথা মনে রেখে বাংলা শিক্ষাদান পদ্ধতিকে ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীণ করে তুলতে হবে।

---

* অবশ্য অনেকে গদ্য ও পদ্যের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য আছে বলে স্বীকার করেন না। ইংরেজ কবি Wordsworth-এর মতে "There neither is, nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition". Shelly-ও গদ্য-পদ্যের বিভেদকে অসমীচীন মনে করতেন। এ বিষয়ে কৌতূহলী ছাত্র-ছাত্রীরা বড় হয়ে আরও জানবে।

পূর্বে আমরা কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এবার গদ্যাংশের আবৃত্তি পাঠ সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

গদ্য পাঠের উদ্দেশ্য ঃ

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠের প্রয়োজনীয়তা অসীম। নবীন পাঠক পাঠের মধ্য দিয়েই তার ভাষাজ্ঞানকে উন্নীত করতে থাকে। তবে শিশুকালে সে যে গদ্য পাঠ করে তা শুধুমাত্র ভাষা পাঠ। ঐ পাঠে তার পঠনশক্তি কতটা বিকাশ লাভ করছে তাই দেখা হয়, আর তার শব্দসম্ভার যাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে যে সাহিত্য পুস্তক তারা পাঠ করে, সেই পাঠ সাহিত্যের পাঠ। গদ্য সাহিত্য পাঠের তাই দুটি দিক—একদিকে ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি, অন্য দিকে সাহিত্য উপলব্ধি।

ভাষার দিকে লক্ষ্য রেখে গদ্য সাহিত্য পাঠ করলে পাঠকের শব্দসম্পদ আয়ত্তে আসবে, ভাষাজ্ঞান বিকশিত হবে, পঠনশক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়ে, দ্রুত মর্মগ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। আর উত্তম ভাবে পাঠ করতে পারলে পাঠ্যাংশটির মধ্য দিয়ে লেখকের ভাবকল্পনা তথা বক্তব্য, অর্থময়তা, লেখক ও পাঠকের মধ্যে আন্তরিক যোগসাধন উপলব্ধি করে অলৌকিক আনন্দ লাভ হবে। এইটেই হচ্ছে গদ্যপাঠের সাহিত্যিক উদ্দেশ্য।

কি ভাবে গদ্য পাঠ শিখবে ঃ

সার্থকভাবে পাঠ করতে হলে প্রথমতম জরুরী বস্তু হচ্ছে উপযুক্ত অনুশীলন। ছোট বেলা থেকে সার্থক অনুশীলন হয় না বলেই ছাত্রছাত্রীদের পঠনশক্তি গড়ে ওঠে না। সুতরাং উপযুক্ত উদ্ধৃতি অনুসরণ করে অনুশীলন করলে সার্থক পঠন সম্ভবপর হবে।

মনে রাখা দরকার কবিতার মত গদ্যেরও ছন্দ আছে। নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিরতি দিলে গদ্যের মধ্যেও ছন্দ আবিষ্কার করা সম্ভব। আগেই বলা হয়েছে, এই বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে গদ্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের প্রথম সচেতন করেন। তাঁর লেখনীর মধ্যেই প্রথম আমরা গদ্যের প্রাণপ্রবাহ কল্লোলিত হতে দেখি।

গদ্য পাঠ করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করি লাইনের শেষে দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ), জিজ্ঞাসা ইত্যাদি চিহ্ন এবং মধ্যস্থলে কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি চিহ্ন যুক্ত করা হয়েছে। এগুলি নানা প্রকার বিরতির চিহ্ন। বাক্যের কোথায় কতখানি বিশ্রাম নিতে হবে তা বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্নকে বিরাম চিহ্ন বলে। বিরাম চিহ্নগুলির অর্থঃ

। দাঁড়ি—পূর্ণ বিরতি—সর্বাপেক্ষা বেশী থামতে হয়।

? প্রশ্নবোধক চিহ্ন—জিজ্ঞাসার ভঙ্গী। প্রায় দাঁড়ির মতোই থামতে হয়।

! বিস্ময় চিহ্ন—নানা অনুভূতির প্রকাশে (যেমন বিস্ময়, আনন্দ, দুঃখ, ভয়, শোক ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয়। প্রায় দাঁড়ির মতো বিরতি।

, কমা—সর্বাপেক্ষা অল্প বিরতি।

; সেমিকোলন—'কমা' অপেক্ষা দীর্ঘতর বিরতি।

: কোলন—কমা অপেক্ষা দীর্ঘতর বিরতি।

:—কোলন ড্যাশ—কমা অপেক্ষা দীর্ঘতর বিরতি।

—ড্যাশ প্রায় কমার মত বিরতি।

' ' " " উদ্ধৃতি চিহ্ন—অন্যের কথা অবিকল উদ্ধৃত করতে ব্যবহৃত হয়।

বাক্যে পূর্বোক্ত বিরাম চিহ্ন থাকলে সেই অনুযায়ী আমরা কণ্ঠস্বরকে কমবেশী বিশ্রাম দেবো। কিন্তু অনেক সময় লেখক ঐ সমস্ত চিহ্ন অনাবশ্যক বোধে বর্জন করেন। তাঁরা পাঠকের 'কান তৈরী' হয়ে গিয়েছে মনে করেন। এই 'কান তৈরী'র ক্ষমতা অর্জন করতে গেলে বিভিন্ন শব্দ, বাক্যাংশ এবং পাঠ্যাংশটির অর্থ সম্পূর্ণ ভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। একটুও না থেমে টানা 'রিডিং' পড়ে গেলে বা ইচ্ছামত থামলে শুধুমাত্র অর্থ বোঝবার দিক থেকে ক্ষতি হবে তা নয়, অর্থের পরিবর্তন পর্যন্ত হতে পারে।
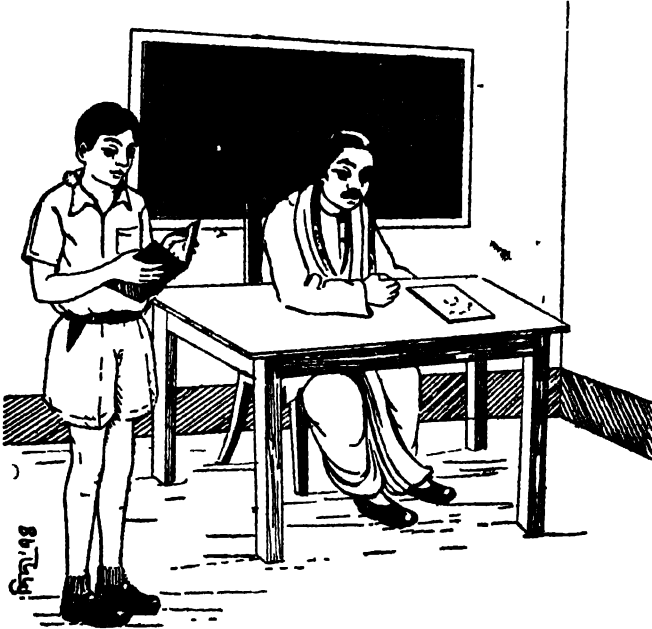
একটি ছাত্র গদ্য পাঠ করছে

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে পরিচয়, বিভিন্ন ধরনের বাক্যরীতি ও রচনাশৈলী এবং প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রতিদিনের জীবনে ব্যবহৃত শব্দগুলি ছাত্রছাত্রীরা সহজে আয়ত্ত করে নেয়; কিন্তু একটু অন্য ধরনের শব্দ তাদের বিব্রত করে। যেমন, তৎসম শব্দ। ভাষার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করতে গেলে তৎসম শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু ঐ শব্দসমূহ সম্বন্ধে সম্যক রূপে অবহিত না থাকার ফলে পদে পদে পাঠের সময় বিঘ্ন ঘটে।

গদ্য সাহিত্যে মনোভাব প্রকাশের জন্য নানা ধরনের প্রকাশভঙ্গী ও বাগ্‌রীতির আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। দৈনন্দিন আলাপ আলোচনায় ব্যবহৃত ভঙ্গীর সঙ্গে এর পার্থক্য থাকার দরুন ছাত্রছাত্রীদের গদ্যাংশের মর্মোদ্ধার করতে কিছুটা দেরী হয়।

প্রতিটি শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ পরবর্তী লক্ষণীয় বস্তু। উচ্চারণ-বিকৃতি পঠনের যাবতীয় কৃতিত্বকে নষ্ট করে দেয়। দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী অঞ্চলের

ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত উচ্চারণ রীতিই এ বিষয়ে আমাদের আদর্শ। কিন্তু নানা কারণে এই উচ্চারণ বিকৃত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া বানানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও বিকৃত উচ্চারণের সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং সর্বপ্রকার উচ্চারণগত অসংগতি দূর করতে না পারলে গদ্য পাঠে সাফল্য অর্জন করা যাবে না।

এবার বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে। সঠিক উচ্চারণ পদ্ধতির কয়েকটি নিয়ম এবং দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হচ্ছে :

(ক) **অ-ধ্বনির উচ্চারণ :** বাংলা অ-ধ্বনির দু-প্রকার উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়—একটি সাধারণ, অন্যটি বিকৃত 'ও' ধ্বনির ন্যায়। লতা, যথা, করা, প্রভৃতি শব্দের অ-ধ্বনির উচ্চারণ স্বাভাবিক। যেমন, ল (অ) তা, য (অ) থা ক (অ) রা। কিন্তু যদু (যোদু), অগ্নি (ওগ্নি) মণি (মোণি) শব্দের অ-ধ্বনির উচ্চারণ বিকৃত।

সাধারণতঃ ঠিক পরবর্তী ধ্বনিতেই ই-ঈ, উ-ঊ, ঋ এবং য ফলা যুক্ত থাকলে শব্দের আদিতে অ-ধ্বনি ও ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। যেমন, করি (কোরি), তবু (তোবু), বক্তৃতা (বোক্তৃতা), সত্য (সোত্‌তো) ইত্যাদি। ঠিক পরে ক্ষ বা ন থাকলে, দু অক্ষর যুক্ত শব্দের আদি অক্ষর এইভাবে উচ্চারিত হয়, কক্ষ (কোক্‌খো), মন (মোন)। এই বিষয়ে নিম্নোক্ত উচ্চারণগুলি লক্ষ্য করতে হবে :

প্রলয় (প্রোলয়), গ্রন্থ (গ্রোন্থ) নকল (নকোল), কনক (কনোক), ব্যক্তি (বোক্তি), করে (<করিয়া=) কোরে।

ফল, ফুল, হাত কিন্তু হস্ত (হস্তো), দণ্ড (দণ্ডো), স্নেহ (স্নেহো), চল (চলো), ধরব (ধোরব), পড়ান (পড়ানো), শোনান (শোনানো)।

ক্ষুদ্রতম (ক্ষুদ্রতমো), যত (যতো), বৃহত্তর (বৃহত্তরো), মর-মর (মরো-মরো), কাঁদ-কাঁদ (কাঁদো-কাঁদো), তৈল (তৈলো), পৌর (পৌরো)।

দেশপ্রাণ (দেশোপ্রাণ), উপলব্ধি (উপোলোব্ধি), বড় (বড়ো), যত (যতো), তত (ততো)।

এই আটটি সংখ্যাবাচক শব্দের অন্ত্য অ-কার উচ্চারিত হয় : এগার, বার, তের, চৌদ্দ, পনের, ষোল, সতের, আঠার।

খ) **আ-ধ্বনির উচ্চারণ :**

হ্রস্ব উচ্চারণ—খাতা, তালা, পাতা।

দীর্ঘ উচ্চারণ—পান (পা-ন্), ভাত (ভা-ত)।

গ) **ই-ঈ ধ্বনির উচ্চারণ :**

দীর্ঘ উচ্চারণ—দিন (দি-ন), নীড় (নী-ড়)।

হ্রস্ব উচ্চারণ—দিনরাত।

হ্রস্ব উচ্চারণ—তুমি কি খেয়েছ? (অব্যয়)

দীর্ঘ উচ্চারণ—তুমি কী খেয়েছ? (সর্বনাম)

ঘ) **উ-ঊ ধ্বনির উচ্চারণ :**

হ্রস্ব উচ্চারণ—রূপো, তুলো।

দীর্ঘ উচ্চারণ—রূপা, তুলা।

ঙ) ঋ ধ্বনির উচ্চারণ :

হ্রস্ব উচ্চারণ—ঘৃত (ঘিৃতো) মৃত (মৃতো) ।

দীর্ঘ উচ্চারণ=ঋণ (রীণ), ঋতু (রীতু) ।

চ) এ-ধ্বনির উচ্চারণ :

হ্রস্ব উচ্চারণ : এবার, এলে, দেশ, কেশ, শেষ ।

বিকৃত উচ্চারণ : এখন (এ্যাখন), বেগার (ব্যাগার), কিন্তু বেপরোয়া, বেকার ।

ছ) ও ধ্বনির উচ্চারণ :

হ্রস্ব উচ্চারণ : লোকেন, বোধোদয়, শোকাপ্লুত ।

দীর্ঘ উচ্চারণ : লোক, বোধ, শোক ।

স্বরবর্ণ দু' প্রকার : হ্রস্বস্বর দীর্ঘস্বর । অ, ই, উ, ঋ=হ্রস্বস্বর । আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ=দীর্ঘস্বর ।*

: উচ্চারণভেদে অর্থভেদ :

কাল (সহজ উচ্চারণ) : কল্য, কাল (প্রসারিত উচ্চারণ)—সময়, কাল (কালো) —কৃষ্ণবর্ণ ।

ভাল (ভাল্)—কপাল, ভাল (ভালো)—উত্তম ।

জ) যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য :

জ্ঞ (জ্+ঞ)	ক্ত (ক্+ত)	ক্ষ (ক্+ষ)
ত্র (ত্+র)	ঞ্চ (ঞ্+চ)	ক্র (ক্+র)
ক্ষ (ক্+ষ)	ঙ্গ (ঙ্+গ)	

যুক্তাক্ষরের উচ্চারণে সাধারণতঃ মূল বর্ণগুলির উচ্চারণ অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে :

জ্ঞ (জ্+ঞ)—গ্‌গঁ (অনুজ্ঞা=অনুগ্‌গাঁ)

ক্ষ (ক্+ষ)—ক্‌খ (লক্ষ্মী=লক্‌খী)

স্ক (স্+ক)—ইংরেজী sh-এর মতো (স্কুল=ইস্‌কুল)

ষ্ট (ষ্+ট) ইংরেজী sh-এর মতো (কষ্ট=কষ্‌ট)

(ঝ) ঞ-এর উচ্চারণ : মিঞা (মিআঁ), কিন্তু সঞ্জিত (সন্‌জিৎ), যাচ্ঞা (যাচ্‌না)

(ঞ) ম-এর উচ্চারণ : পদ্ম (পদ্দো), ভীষ্ম (ভীশশঁ)

(ট) য " গণ্য (গন্‌ন), শূন্য (শুন্‌ন)

(ঠ) ব " জিহ্বা (জিwভা), আহ্বান (আwভান)

(ড) হ " সহ্য (শোজ্‌ঝ), বাহ্য (বাজ্‌ঝ)

(ঢ) ং " বাংলা (বাঙ্‌লা), শিং (শিঙ্)

(ণ) ঃ " দুঃখ (দুক্‌খ), দুঃসময় (দুস্‌সময়)

* হ্রস্বস্বর একমাত্রার ধ্বনি, সাধারণভাবে উচ্চারিত হয়। দীর্ঘস্বর দু মাত্রার ধ্বনি একটু টেনে উচ্চারণ করতে হয়। কিন্তু বাংলা উচ্চারণে এই মাত্রাজ্ঞান অনিবার্য নয়। এখানে প্রয়োজন অনুযায়ী হ্রস্ব স্বরেরও দীর্ঘ উচ্চারণ হয়, আবার দীর্ঘস্বরেরও হ্রস্ব উচ্চারণ হয়।

(গ) ব-ফলা, ম-ফলা, য-ফলা, র-ফলা প্রভৃতি যুক্ত বর্ণের উচ্চারণে যে বর্ণের সঙ্গে ফলাগুলি থাকে, সাধারণতঃ তাদের দ্বিত্ব হয় ঃ

পাঠ্য=পাঠ্‌ঠো	মহাত্মা=মহৎত্‌তাঁ
বিদ্বান=বিদ্‌দান	চক্র=চক্‌ক্র

উচ্চারণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হলো। সার্থক গদ্য সাহিত্য পাঠের সময়, এর পর যে জিনিসটির দিকে ছাত্রছাত্রীকে মানোযোগ দিতে হবে, তা হলো স্বরাঘাত। যে গদ্যাংশটি আমরা পাঠ করবো. সেই গদ্যাংশে অনেকগুলি বাক্য আছে। বিভিন্ন শব্দ সমন্বিত হয়ে বাক্যটি গড়ে উঠেছে। পড়বার সময আমরা সমস্ত শব্দ তথা অক্ষর নানা ভাবে এবং কম বেশী জোর দিয়ে :উচ্চারণ করি। সুতরাং হ্রস্বস্বর এবং দীর্ঘস্বর বিচার করে এবং লেখকের মনোভাব ও অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে শব্দ অনুযাযী কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা এবং নমনীয়তা আনতে হবে ; তবেই গদ্যপাঠ সার্থক হযে উঠবে।

বাংলা গদ্যে ভাব প্রকাশের বাহন হিসেবে দুটি রীতি প্রচলিত আছে। একটি সাধু রীতি, অন্যটি চলিত রীতি। সাধুভাষা সংস্কৃতানুগ, এখানে তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশী। ফলতঃ এই ভাষার ভংগীটি গাম্ভীর্যপূর্ণ। পক্ষান্তবে স্বরসংগতি, অভিশ্রুতি ও ধ্বনি পরিবর্তনের নানা নিয়ম দ্বারা প্রভাবিত চলিত ভাষার ভংগীটি লঘু চালের। বিষয়বস্তু অনুযায়ী লেখক সাধু বা চলিত রীতি গ্রহণ করেন। অবশ্য বর্তমান যুগে যাবতীয় রচনাই —গূঢ়তম তত্ত্ব থেকে যে কোন লঘু বিষযই চলিত ভাষায় লেখা হচ্ছে।

পাঠ করবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে কোন্ রীতি অবলম্বিত হয়েছে গদ্যাংশটিতে। সাধুভাষায় লেখা হলে পঠনভংগীতে গাম্ভীর্য থাকবে, আর লঘু ভংগীতে পড়তে হবে, যদি রচনাটি চলিত ভাষায় লেখা হয়। অবশ্য বিষয়বস্তুর প্রতি ছাত্রছাত্রীদের যেন সতর্ক দৃষ্টি থাকে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়বস্তুর মান অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

যে কোন গদ্যাংশ পাঠ করবার সময় ওপরের আলোচনা যথাযথ ভাবে মনে রাখা দরকার। কোন কিছু পড়তে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন দৃষ্টিশক্তির। মনোবিদ্‌রা পরীক্ষা করে দেখেছেন, পঠন রীতির ত্রুটির জন্য ছাত্রছাত্রীরা ভুল পড়ে। আমরা যখন কোন কিছু পড়ি, তখন আমাদের চোখ সমস্ত অক্ষরের ওপর দিয়েই প্রবাহিত হয় না। পড়বার সময় চোখ লাফে লাফে চলে, চলতে চলতে মাঝে মধ্যে বিশ্রামও নিয়ে থাকে। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিরও তাল রেখে চলা উচিত—এই তাল রাখতে পারলে পড়া সঠিক হয়। পড়বার সময় যাদের উচ্চারণ দৃষ্টি থেকে পিছিয়ে পড়ে, তাদের পাঠ ভালো হয় না। যারা চোখের গতিকে শব্দের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিক্ষেপ করতে পারে না, তারা চোখের গতিকে শব্দের পেছনে একবার টানে, সামনে একবার চালায়—এই স্থির লক্ষ্যের অভাবে তারা খারাপ পড়ে। এ ছাড়া অনেক সময় বর্ণ বা শব্দের চেহারাও দৃষ্টির ওপর অধিকার বিস্তার করে। অনেক সময় প্রায় এক জাতীয় শব্দ-আকৃতি উচ্চারণে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। যেমন 'কলতলা'কে 'কলকাতা' পড়া, কিংবা 'জানালা'কে 'জানলা', অথবা 'বাক্‌স'কে 'বাস্‌ক' পড়া বিচিত্র নয়। এমন বিভ্রম যাতে না হয় তার জন্য প্রত্যেক বর্ণের দিকেই সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

অবশ্য একথা ঠিক, পড়ার সময় পরিচিত শব্দ আমাদের খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কিন্তু স্বল্প-পরিচিত বা অপরিচিত শব্দ, দ্ব্যর্থবোধক শব্দ, বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত শব্দ সহজেই আমাদের নজর কাড়ে, স্বাভাবিকভাবেই ঐ সব শব্দে আমাদের দৃষ্টি আটকে পড়ে। সুতরাং অখণ্ড মনোযোগ এবং অনুশীলনের মাধ্যমেই পড়ার গতি স্বাভাবিক গতিময় হয়ে ওঠে।

(ভালোভাবে পড়তে হলে চোখকে শব্দের এদিক ওদিক না করে, ডান দিকেই চালিয়ে যেতে হয়—প্রয়োজনবোধে গদ্যাংশটির বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি একটু জোর দিয়ে দেখে নিতে হবে।)

গদ্য রচনাভঙ্গীর প্রকারভেদ ঃ

গদ্যাংশ পাঠ কি ভাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারে, এতক্ষণ তার আলোচনা বিস্তৃতভাবেই করা হলো। এবার বাণী-ভঙ্গীর (style) দিক থেকে গদ্যাংশগুলি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নানা রকম উদাহরণ দিয়ে গদ্যপাঠ ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করা হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত লেখকগণের রচনাংশ এখানে সংকলিত করা হলো। এই সংকলনে বাংলা গদ্যে ব্যবহৃত দুটি রীতিই—**সাধু এবং চলিত,** উদ্ধৃত করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের প্রতিও আমরা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি ; এমন কি গদ্যের রীতি পরিবর্তনের ধারাবাহিকতার চিহ্নও এখানে পাওয়া যেতে পারে। এই উদাহরণগুলি বারবার সতর্ক ভাবে অনুশীলন করলে গদ্যসাহিত্য পাঠ ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজতর হয়ে উঠবে।

প্রত্যেক লেখকেরই একটি বিশেষ রচনাভঙ্গী আছে। প্রকৃতপক্ষে এই রচনাভঙ্গীর (style) দ্বারা আমরা রচনাংশ দেখে লেখক কে তা অনুভব করতে পারি। যতক্ষণ না কোন লেখক নিজস্ব রচনাভঙ্গী সৃষ্টি করতে পারছেন, ততক্ষণ তাঁকে আমরা সার্থক লেখকরূপে চিহ্নিত করতে পারি না।

বাংলার লেখকগণের রচনা পাঠ করলে আমরা বিভিন্ন রচনাভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হই। সাধারণভাবে এই রচনাভঙ্গীকে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি ঃ

(১) কাব্যধর্মী বা আবেগাত্মক
(২) বর্ণনামূলক
(৩) চিন্তামূলক
৪) জীবনধর্মী
৫) কৌতুকরসাত্মক
৬) সংলাপাত্মক
(৭) পত্রাংশ

উপরিউক্ত বিভাগ অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত লেখকবৃন্দের রচনাংশ এখানে সংকলিত করা হলো। ছাত্রছাত্রীরা প্রয়োজন মতো কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রণ করে, আবেগ, কারুণ্য, দৃঢ়তা, হাস্য, মমতা, বিস্ময়, ভীতিবিহ্বলতা ইত্যাদি মিশ্রিত করে এইগুলি আবৃত্তি ও পাঠ অভ্যাস করবে।

॥ কাব্যধর্মী বা আবেগাত্মক ॥

গদ্যের মধ্যেও ছন্দ আছে, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' নামক গ্রন্থ থেকে উদাহরণ দিয়ে আমরা বুঝিয়ে দিচ্ছি তিনি কেমনভাবে গদ্যকেও কবিতা করে তুলেছিলেন ঃ

"এখানে নামল সন্ধ্যা ।
সূর্যদেব কোন দেশে কোন সমুদ্র পারে / তোমার প্রভাত হল ॥
অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে / রজনীগন্ধা ॥
বাসর ঘরের দ্বারের কাছে / অবগুণ্ঠিতা নববধূর মত ; ॥
কোনখানে ফুটল / ভোরবেলাকার কনকচাঁপা ॥
জাগল কে ! ।
নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ ॥
ফেলে দিল / রাত্রে-গাঁথা / সেঁউতিফুলের মালা ॥
এখানে একে একে / দরজায় আগল পড়ল. ॥
সেখানে / জানলা গেল খুলে । ॥
এখানে / নৌকো ঘাটে বাঁধা / মাঝি ঘুমিয়ে ; ॥
সেখানে / পালে লেগেছে হাওয়া ।"

(সন্ধ্যা ও প্রভাত)

[এখানে / চিহ্ন দিয়ে পর্বান্ত যতি এবং ॥ চিহ্ন দিয়ে চরণান্ত যতি বোঝানো হয়েছে । এই যতি চিহ্ন অনুসারী কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রণ করে গদ্যটি পাঠ করতে হবে ।]

এবার বিভিন্ন লেখকের রচনা থেকে বিভিন্ন উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা এগুলি পাঠ-অভ্যাস করবে ।

কুমারেরা শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জননীর নয়নের ও মনের অনির্বচনীয় আনন্দ সম্পাদন করিতে লাগিল । যখন তাহারা তাঁহাকে আধ আধ কথায় 'মা' 'মা' বলিয়া আহ্বান করিত, যখন তিনি তাহাদের সন্নিবেশিত মুক্তাকলাপসদৃশ দন্তগুলি অবলোকন করিতেন, যখন তাহাদের অর্ধোচ্চারিত মৃদুমধুর বচনপরম্পরা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত, যখন তিনি তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহভরে তাহাদের মুখচুম্বন করিতেন, তখন তিনি সকল শোক বিস্মৃত হইতেন ; তাঁহার সর্বশরীর অমৃতাভিষিক্তের ন্যায় শীতল ও নয়নযুগল আনন্দাশ্রুজলে পরিপ্লুত হইত । —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

●

হে ভারত, এই পরাজয়বাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য—নিষ্ঠুরতা এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে ? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ 'সতী' 'সাবিত্রী,' 'দময়ন্তী', ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শংকর ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের বা নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও—না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত ;

ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামানবের ছায়ামাত্র ; ভুলিও না—নীচ জাতি মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী—আমার ভাই ; তুমি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ—ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারানসী; বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ আর বল দিন রাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।" (এটি দেশাত্মবোধক রচনা) —স্বামী বিবেকানন্দ

●

এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র সকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কালসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব? মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? আইস প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধুম বাধিবে।
(এটিও দেশাত্মবোধক রচনা।) —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

●

সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। ছোট ছোট তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে আছড়াইয়া পড়িয়া কুলকুল গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত। যখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিত, এবং বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত, তখন নদীতে সেই কুলকুল ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম! কখনও মনে হইত, এই যে অজস্র জলধারা প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে, ইহা তো কখনও ফিরে না ; তবে এই অনন্ত স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার কি শেষ নাই? নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, 'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ'? নদী উত্তর করিত, 'মহাদেবের জটা হইতে।' —জগদীশচন্দ্র বসু

●

বাসর ঘরের দরজায় রাজেনবাবু থামলেন। সামনে দাঁড়ানো বিজু আর ডালিমের ফাঁক দিয়ে একবার স্বাতীকে দেখলেন, ডালিম আর অরুণের ফাঁকে একবার সত্যেনকে। আভা গীতিকে ধাক্কা দিয়ে বললো ওঠ্ না, সরস্বতী বললো সত্যেন তাহলে, উজ্জ্বল আলোর সিঁড়ি দিয়ে নামলো দুজনে, উজ্জ্বল একতলা পেরোলো, কেউ নেই, চুপ, শাশ্বতী বললো স্বাতী কি, শোভা ভাবলো ঘুম, অন্ধকার, কলকাতা কালো, রিকশ-র দুই চোখই উজ্জ্বল, টুং টাং, চুপ সব চুপ, টুং টাং, আরো কালো মাথার উপর আকাশ আরো উজ্জ্বল আকাশের তারা, তারা, কত! মহাশ্বেতা বলল, শাশ্বতী তুই, কুন্দ দিদিমা বললেন, সত্যেন এই প্রদীপ কিন্তু সারা রাত, টুং টাং রিকশ অন্ধকারে, কেউ নেই, চুপ, ঠোঙায় ঢাকা মিটমিট, আলোর পোকা, বড়ো বড়ো বাড়ী, অন্ধকার। —বুদ্ধদেব বসু

সন্ধ্যের পর যখন জোনাকি ওঠে তখন সে ভাবে জগৎকে খুব আলো দিচ্ছি। কিন্তু যেই আকাশে তারা উঠল, তার অভিমান চলে গেল। তারারা ভাবতে লাগল আমরাই আলো দিচ্ছি জগৎকে। কিছু পরে যেই চাঁদ উঠল লজ্জায় মলিন হয়ে গেল তারারা। চাঁদ ভাবল জগৎ আমার আলোতেই হাসছে। দেখতে দেখতে অরুণোদয় হল, সূর্য উঠলেন। তখন কোথায় বা চাঁদ, কোথায় বা কি! —অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

॥ বর্ণনামূলক ॥

আর্য! এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী-প্রস্রবণ গিরি; এই গিরি শিখরদেশ আকাশ পথে সততসঞ্চরমান-জলধর-পটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ জনপদসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।
(এটি প্রকৃতি-বিষয়ক রচনা।) —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

●

সেই গম্ভীরনাদী বারিধি-তীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণী মূর্তি। কেশভার—অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফ কেশভার, তদগ্রে দেহরত্ন, যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতে ছিল না—তথাপি মেঘ বিচ্ছেদ নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ময়; সে কটাক্ষ এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণ লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল।
এখানে মানব-রূপ বর্ণিত।) —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

●

আমি সায়ংকালে এই নদীর সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া একাকী তাহার তীরে বিচরণ করিতেছিলাম, হঠাৎ উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে 'পর্বতো বহ্নিমান্', পর্বতের উপরে দীপমালা শোভা পাইতেছে। সায়ংকালের অবসান হইয়া রাত্রি যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই অগ্নিও ক্রমে তত ব্যাপ্ত হইল। উপর হইতে অগ্নিবাণের ন্যায় নক্ষত্রবেগে শত সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইয়া নদীতীর পর্যন্ত নিম্নস্থ বৃক্ষসকলকে আক্রমণ করিল। ক্রমে একে একে সমুদায় বৃক্ষ স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিরূপ ধারণ করিল, এবং অন্ধ তিমির সে স্থান হইতে বহু দূরে প্রস্থান করিল। অগ্নির এই অপরূপ রূপ দেখিতে দেখিতে, যে দেবতা অগ্নিতে তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে লাগিলাম। (এটি নিসর্গ-বিষয়ক রচনা।)
—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

●

পৃথিবী এবং অপর কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ লইয়া একটি পরিবার—সূর্য এই পরিবারের কর্তা। এইরূপ কত লক্ষ লক্ষ জ্যোতিষ্ক পরিবারের কর্তা কত লক্ষ লক্ষ সূর্য ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান তাহার সংখ্যা নাই। আকাশের কটিবন্ধস্বরূপ * * * ব্রহ্ম-কটাহের এক প্রান্ত

থেকে অপর প্রান্তব্যাপী মৃদু জ্যোতিঃশালী যে সংকীর্ণ আলোক-পথ দেখিতে পাই, যাহাকে আমরা ছায়াপথ বলি, সেই ছায়াপথ অতলস্পর্শ অসীম-গভীর একটি তারকাসমুদ্র।'
(এটি বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা।) —স্বর্ণকুমারী দেবী

●

উড়িষ্যা এখনও মন্দিরের দেশ। রাজধর্ম যখন যাহা প্রবল হইয়াছে, আপনার উন্নত মহিমা প্রচার করিতে অভ্রভেদী পাষাণ-শির উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে, এবং এইরূপে ভারতবর্ষের বিলুপ্তপ্রায় পঞ্চবিংশতি শতাব্দী ভিন্ন ভিন্ন দেবতার চরণতলে উৎসৃষ্ট হইয়া পুরাতন দিনের জীবন-গৌরব রক্ষা করিতেছে। পুরীতে জগন্নাথ, ভুবনেশ্বরে শিব, যাজপুরে পার্বতী, বিনায়কে গণেশ, কণারকে দেবতাহীন-সূর্যমন্দির, খণ্ডগিরিতে পরিত্যক্ত বৌদ্ধ গুম্ফাবলী, নদীতীরে, গিরিশিখরে, সাগরবেলায়, যেখানে প্রকৃতিদেবী আপন সৌন্দর্য ঈষৎ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, সেইখানেই নীল দিগন্তের গায়ে হয় দেবালয়, নয় অনুশাসন-স্তম্ভ, প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত উৎকলদেশ যেন দেবতার বিহারভূমি এবং মানবের তীর্থক্ষেত্র। (এটি ইতিহাস-বিষয়ক রচনা।) —বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

●

সুন্দরগড় অরণ্য-প্রকৃতির লীলানিকেতন। পথে পথে করম গাছের ফুলের ঝরা-পাপড়ি বিছানো। লম্বা-ঠোঁট ধনেশ পাখী ও বনটিয়া ডালে ডালে বেড়াচ্ছে। ক্বচিৎ কোনো পর্বত চূড়ায় প্রভাতের সোনালী রোদ এলানো, ক্বচিৎ কোনো পার্বত্য ঝর্ণার জলের ধারে লোহাজালি ফুল ফুটে পাথর ঢেকে ফেলেছে। পথেরও শেষ নেই, অরণ্যেরও শেষ নেই, মুক্ত শৈলমালা-বেষ্টিত ভূমিশ্রীরও শেষ নেই; প্রান্তেরও শেষ নেই। বনে বনে ময়ূর, বনে বনে কোট্‌রা, ভালুক, লেপার্ড। (প্রকৃতি-বিষয়ক রচনা।) —বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

●

সমুদ্রবক্ষে তরণী ভাসিল; ছন্দে, ভাষায় ও বর্ণনা-চিত্রে নীলাম্বু-প্রসার ও জলকল্লোল জাগিয়া উঠিল—কিন্তু কবি-কর্ণধারের মনশ্চক্ষু আধ-নিমীলিত কেন? সাগরবক্ষে উত্তাল তরঙ্গরাজির মধ্যেও এ কার কুলকুলধ্বনি? এ যে কপোতাক্ষ! তীরে ভগ্নশিবমন্দিরে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে, জলে "নূতন গগন যেন নব তারাবলী" এবং গ্রাম হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। সমুদ্র গর্জন করুক, ফেনিল জলরাশি তরণী-তটে আছাড়িয়া পড়ুক—তথাপি এ স্বপ্ন বড় মধুর। সমুদ্রতলে কপোতাক্ষের অন্তঃস্রোত তাঁহার কাব্য তরণীর গতি নির্দেশ করিল, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া আর হইল না। তরী যখন তীরে আসিয়া লাগিল, তখন দেখা গেল—"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।"
(সাহিত্য সমালোচনামূলক রচনা।) —মোহিতলাল মজুমদার

●

যেমন কালো তাদের রং, তেমনি কালো তাঁদের কেশ, তেমনি কালো তাঁদের চোখ আর তেমনি কালো তাঁদের চোখের কাজল। নানা রঙের ফুল তাঁদের অলকে, নানা রঙের শাড়ী তাঁদের অঙ্গে, নানা রঙের মণি-মাণিক তাঁদের আভরণে। কালোকে পরাস্ত করার জন্যে আর সব কটা রং যেন চক্রান্ত করেছে। (রূপ বর্ণনা) —অন্নদাশংকর রায়

চমৎকার লাগে বনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে। বেশ একটা ছায়া ছায়া ভাব, মাঝে মাঝে রোদের আভাস, কোথাও আলো-ছায়ার অদ্ভুত আলপনা। কাঠঠোকরার ডাক, বনমুরগীর ডাক, তিতিরের ডাক শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। দুপাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় গাছ, প্রত্যেক গাছে লতাও জড়িয়ে আছে। লতা বললেই সাধারণতঃ আমাদের মনে যে রকম নরম নরম রোগা পাতলা মেয়েলি ধারণা হয়, এসব সেরকম লতা নয়। বেশ বলিষ্ঠ লতা সব, কাছির মত শক্ত। (প্রকৃতি-বিষয়ক রচনা) —বনফুল

●

ভূত যখন ছাড়ে, শেষ দৌরাত্ম্যটা পুরাদমে দেখিয়ে যায়। আবার সম্মুখে প্রাণঘাতী চড়াই। চড়াই, চড়াই, আবার চড়াই। একটা হাত ক'দিন থেকে কাঁপছে; হয়ত স্থায়ী পক্ষাঘাত আসবে। আবার ডান পা-টা কাঁপতে শুরু করছে। চলতে চলতে একবার দাঁড়াই, বুকের মধ্যে কেমন বিশ্রী শব্দ হতে থাকে, কানের মধ্যে জলতরঙ্গ। তারপর? তারপর স্বপ্ন দেখছি। অর্ধনিদ্রার ঘোরে জেগে উঠল একটি রূপলোক,—সম্মুখে দূরে একটি বিপুল-বিস্তৃত তুষারময় প্রান্তর · তার মধ্যস্থলে মন্দিরের একটি স্বর্ণচূড়া পদপ্রান্তে স্রোতস্বিনী জহ্নুবালা। (ভ্রমণ বৃত্তান্ত)

—প্রবোধ কুমার সান্যাল

॥ চিন্তামূলক ॥

প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে পারে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাটরাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্বনাশের পারগরূপে বিখ্যাত আছে, বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণপূর্বক কৃতার্থ হয়েন। —রামমোহন রায়

●

যদি বল স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অল্প এ কারণ তাহাদের বিদ্যা হয় না, অতএব পিতা মাতাও তাহাদের বিদ্যার জন্যে উদ্বেগ করেন না, এ কথা অতি অনুপযুক্ত। যেহেতুক নীতিশাস্ত্রে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বুদ্ধি চতুর্গুণ ও ব্যবসায় ছয়গুণ কহিয়াছেন। এবং এদেশের স্ত্রীলোকদের পড়াশুনার বিষয়ে বুদ্ধি পরীক্ষা সংপ্রতি কেহই করেন নাই। এবং শাস্ত্রবিদ্যা ও জ্ঞান ও শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করাইলে যদি তাহারা বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে না পারেন তবে তাঁহাদিগকে নির্বোধ কহা উচিত হয়। —গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার

যখন মানুষের ধর্ম্মমত এত বিচিত্র ও পরিবর্ত্তনশীল, তখন মত লইয়া এত মারামারি কেন ? যদি ধর্ম্ম বিষয়ে একান্তই তর্ক করিতে হয়, তাহা হইলে প্রতিপক্ষের প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার ও চাতুরী প্রয়োগ না করিয়া উগ্রতাহীন যুক্তিদ্বারা বিধিমতে সৌজন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তর্ক চালান কর্ত্তব্য । তর্ককালে নাস্তিকের প্রতিও এইরূপ ব্যবহার করা উচিত ।

—রাজনারায়ণ বসু

●

অবশেষে যখন পর্ব্বতপোরি উত্তীর্ণ হইলাম, তখন কি অনির্ব্বচনীয় অনুপম সুখানুভবই হইল । তথাকার সুশীতল মারুত হিল্লোলে শরীর পুলকিত হইতে লাগিল । তথায় দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, বিসংবাদ, চৌর্য্য, অত্যাচার এ সকলের কিছুই নাই, কেবল আরোগ্য ও আনন্দ অবিরত বিরাজ করিতেছে । ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইল । বোধ হইল, বিশ্বসংসারে এমন রম্য স্থান আর দ্বিতীয় নাই ।

—অক্ষয়কুমার দত্ত

●

দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি ? খাইতে পাইলে কে চোর হয় ? দেখ, যাহারা বড় বড় সাধু চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাহারা অনেকে চোর অপেক্ষা অধার্ম্মিক । তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না । কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না- ইহাতেই চোরে চুরি করে । অধর্ম্ম চোরের নহে—চোর যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর । চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী । চোরের দণ্ড হয়, চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন ? —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

●

বাংলার সনাতন সাধনার আর একটি বিশেষত্ব—ইহার মানবতা—ইহাকে আর কি বলিব, সহসা ভাবিয়া পাই না । বাংলার দেব-বাদ আছে সত্য, কিন্তু বাংলার যে সকল দেবদেবীর পূজা প্রচলিত তাঁহাদের সকলের মধ্যেই একটা অদ্ভুত মানবতা ফুটিয়া উঠিয়াছে । কালী, দুর্গা, সরস্বতী, ইহাদের কাহার বা দশ, কাহার বা চারি হাত আছে বটে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এ সকল যে অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি ইহা আশ্চর্য্যরূপে প্রত্যক্ষ হয় । এই অতিপ্রাকৃত হাতগুলি বাদ দিলে ইহাদিগকে ম্যাডোনার সঙ্গে তুলনা করা যায় । দুর্গা ও সরস্বতী মুখের অণুতে অণুতে আমরা যে মাতৃঅংকে লালিত পালিত, সেই সার্ব্বজনীন মানবীয় মাতৃভাব যেন ফাটিয়া পড়ে । (ধর্ম-বিষয়ক রচনা) —বিপিনচন্দ্র পাল

●

আমাদের দেশের ইতিহাসটা ঢালিয়া সাজিতে হইবে । এতদিন আমরা যে ভাবে ইতিহাস পড়িয়া আসিতেছিলাম, সেভাবে আর চলিবে না, আমাদের ইতিহাস ছিল না, ইয়ুরোপীয়ানরা আমাদিগকে ইতিহাস শিখাইয়াছেন, সে কথা সত্য ।......কিন্তু তাঁহাদের কথা শুনিলে আর

চলিবে না। তাঁহারা আমাদের দেশের সব খবর রাখেন না, সব বই পড়েন না, সকলের সঙ্গে মিশেন না, দুই দশখানি বই পড়িয়াছেন, তাহা হইতেই একটা ইতিহাস খাড়া করিয়া দেন।

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

●

বঙ্গীয় যুবকেরা ইংরাজদিগের অনুকরণকেই সারজ্ঞান করে। ইংরাজেরা বাস্তবিক স্বাধীন জাতি—বাঙ্গালীরা তাহাদের দেখাদেখি স্বাধীনতার ভান করিলেই যদি স্বাধীন হওয়া যাইত, তাহা হইলে শুকপক্ষীও বক্তৃতা বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারিত। স্বাধীনতার ভান না করিয়া স্বাধীনতা লাভের উপায় অবলম্বন করা তাহাদের আবশ্যক। সে উপায় মঙ্গল ভাবের অনুশীলন। কেন না আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা, তাহাতেই লোকের মধ্যে ঐক্য হয়, তাহাই সকল স্বাধীনতার মূল। মঙ্গল ভাবের অনুশীলন করিলে, হিন্দুদিগের স্বজাতীয় ভাবেরই অনুশীলন করা হয়, কেন না হিন্দুজাতি মঙ্গল প্রধান।

(ধর্ম-বিষয়ক রচনা) —দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

●

চলতি ভাষায় কি আর শিল্প-নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার করে কি হবে? ......স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব. সেই ভঙ্গি সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। — স্বামী বিবেকানন্দ

●

প্রথম যৌবনে যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তারপর যখন ক্রমে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, আমার সতত ধ্যান ছিল যে, কি উপায়ে আমার জননী বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিব। মানুষের যত স্বপ্ন থাকে, আমার ঐ একই স্বপ্ন ছিল। একটা ধারণা আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতির মাতৃভাষা যত সম্পন্ন, সে জাতি তত উন্নত ও অক্ষয়। আমার মাতৃসমা মাতৃভাষাকে যদি কোনমতে সম্পদশালিনী করিতে পারি আমার জীবন ধন্য হইবে। —আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

●

চরক ও সুশ্রুত, দেশীয় চিকিৎসা প্রণালীর দুইখানি মহাগ্রন্থ। এতে অবস্থা বিশেষে এমন কি গোমাংস খাবারও কথা আছে। সুশ্রুতে শবব্যবচ্ছেদের রীতিমত ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু মনু মহাশয় বলেন শবস্পর্শ হলে জাতিচ্যুত হ'তে হবে। সুতরাং ব্যবস্থা হ'য়ে গেল শব ব্যবচ্ছেদের স্থানে অতঃপর লাউ ব্যবচ্ছেদ হবে, অর্থাৎ লাউ কেটে মনুষ্য-শরীরের শিরা-উপশিরা প্রভৃতির সংস্থান জানতে হবে। ব্যবস্থাটা কতকটা সেই কলাগাছ বিয়ে করার মত

নয় কি? জাতি-স্মৃতির ভয় দেখিয়ে এমনি ক'রে যখন স্বাধীন চিন্তার গলা টিপে মারা হ'ল তখন ৬৪ কলাবিদ্যা লোককে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল।

—প্রফুল্লচন্দ্র রায়

●

যে ভারত এক সময় জগতের শিক্ষা-ভূমি ছিল সেই ভারত এখন একটা সামান্য বিষয়ের জন্য অন্যের দ্বারে লালায়িত। এইরূপ একসময়ে ভিক্ষাদাতা অন্য সময়ে ভিক্ষাপ্রার্থী, একসময়ে লোকারণ্যের হৃদয়োদ্দীপক কোলাহলপূর্ণ, অন্যসময়ে বিকট শ্মশানের বিকট মূর্ত্তির প্রতিরূপ—ভারতের সমুদয় অবস্থা আনুপূর্ব্বিক জানিবার উপায় নাই, ভারতের একখানি প্রকৃত ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত লোক-সমাজে প্রচারিত হইয়া অতীত জ্ঞানের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ আলোকিত করে নাই।

—রজনীকান্ত গুপ্ত

●

তীরে দাঁড়িয়ে মানুষ সামনে দেখলে সমুদ্র। এতো বড়ো বাধা কল্পনা করাই যায় না। চোখে দেখতে পায় না এর পার, তলিয়ে পায় না এর তল। যমের মোষের মতো কালো, দিগন্ত প্রসারিত বিরাট একটা নিষেধ কেবলই তরঙ্গতর্জনী তুলছে। চিরবিদ্রোহী মানুষ বললে, 'নিষেধ মানব না।' বজ্রগর্জ্জনে জবাব এলো, 'না মান তো মরবে'! মানুষ তার এতটুকু মাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে বললে, 'মরি তো মরব।' এই হলো জাত বিদ্রোহীদের উপযুক্ত কথা। জাত বিদ্রোহীরাই চিরদিন জিতে এসেছে। একেবারে গোড়া থেকেই প্রকৃতির শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষ নানা ভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিলে। আজ পর্যন্ত তাই চলছে। মানুষদের মধ্যে যারা যত খাঁটি বিদ্রোহী, যারা বাহ্যশাসনের সীমাগণ্ডী যতই মানতে চায় না, তাদের অধিকার ততই বেড়ে চলতে থাকে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

●

তোমাদের অভিধান থেকে 'অসাধ্য' আর 'নিরাশ্য' এই দুটো কথা কেটে দিয়ো। সমস্যা আসে মেটাবার জন্যে, দুঃখ আসে শক্তি জাগাবার জন্যে। রাত যত ঘনিয়ে আসে ঊষা তত এগিয়ে আসে, সে কথা ভুলো না।

অন্তর্যামীর ভর্ৎসনাকে যদি ভয় করে চলো, তাহলে জগতে আর কিছুই ভয় থাকবে না—মৃত্যুরও না বিশেষতঃ যদি 'আমার' জায়গায় সর্বদা 'আমাদের' ভাবনা করা অভ্যাস কর। আমি মরলে আমরা সকলে মরবো না তোমার জীবনমৃত্যু যদি এমন হয়—যে তাতে তোমাদের সকলের আরো ভালোভাবে বাঁচার সুযোগ হবে, তাহলে সেই সকলের মধ্যে তুমি অমর হয়ে থাকবে। পূর্বজন্মের কর্মফল নিয়ে বৃথা মাথা ঘামিয়ো না। সে বিষয়ে ঠিক জানারও উপায় নেই, তা নিয়ে তোমার করারও কিছু নেই। প্রতিমুহূর্তেই তোমার নবজন্ম, সে মুহূর্তে তুমি স্বর্গে থাকবে কি নরকে থাকবে সেটা তোমার হাতে।

—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

●

গল্প রচনা ভারি কঠিন। বাংলাভাষা, সালঙ্কারা ভাষাই লিখিতে পারলে গল্প র'চতে পারা যায় না। পদ্য রচনা ঢের সোজা, মাসখানেক অভ্যাস ক'রলে পদ্য লিখতে পারা যায়। অবশ্য সে পদ্য, কাব্য নয়। কবিদুর্লভ ক্ষণজন্মা দৈবী-শক্তি না পেলে কবি হতে পারা

যায় না। যে-সে পদ্যকে কবিতা বললে কবিকে খাট করা হয়। কবির ভাব, কবিতা কবিতাই কবির প্রমাণ। ছন্দোবিশিষ্ট বাক্য পদ্য। পদ্য-কার ছান্দসিক। কবি পদ্যে ও গদ্যে, কাব্যের দ্বিবিধরূপেই তাঁর কবিতা প্রকাশ করতে পারেন। অতএব কাব্যও দ্বিবিধ, পদ্যকাব্য ও গদ্যকাব্য। উত্তম গল্প, কাব্য। গল্প পদ্যে ও গদ্যে দুই রূপেই লিখতে পারা যায়। যে গল্পে কবিতা নাই, সেটা গল্প নয় বাজে বকা। (সাহিত্য সমালোচনা)

—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

●

বিজ্ঞান এবং সর্বশ্রেণীর বিশেষজ্ঞের উপর জনসাধারণের প্রচুর আস্থা দেখা যায়। অনেকে মনে করে, অধ্যাপক ডাক্তার উকিল এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি নিজ নিজ বিষয়ে সর্বজ্ঞ। কোনও প্রশ্নের উত্তরে যদি বিশেষজ্ঞ 'জানি না' বলেন তবে প্রশ্নকারী ক্ষুণ্ণ হয় কেউ কেউ স্থির করে এঁর বিদ্যা বিশেষ কিছু নেই। সাধারণে যে সব বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞকে প্রশ্ন করে তার অধিকাংশ স্বাস্থ্য বিষয়ক, কিন্তু জ্যোতিষ পদার্থ বিদ্যা রসায়ন জীববিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেকের কৌতূহল দেখা যায়।

--রাজশেখর বসু

॥ জীবনধর্মী ॥

তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় বলবান, নিরতিশয় সাহসী, এবং সর্বতোভাবে অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন। এক লৌহদণ্ড তাঁহার চিরসহচর ছিল; উহা হস্তে না করিয়া তিনি কখনও বাটীর বাহির হইতেন না। তৎকালে পথে অতিশয় দস্যুভয় ছিল। স্থানান্তরে যাইতে হইলে, অতিশয় সাবধান হইতে হইত। কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়, অসাধারণ বল, সাহস ও চিরসহচর লৌহদণ্ডের সহায়তায়, সকল সময়ে ঐ সকল স্থল দিয়া একাকী নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেন। দস্যুরা দুই চারিবার আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত রূপ আক্কেল সেলামি পাইয়া, আর তাহাদের তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস হইত না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, বন্য হিংস্র জন্তুকেও তিনি ভয়ানক জ্ঞান করিতেন না।

(আত্মজীবনী বিষয়ক) —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

●

মানব চরিত্রের প্রভাব যে কি জিনিস, উগ্র-উৎকট-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন তেজীয়ান পুরুষগণ ধন-বলে হীন হইয়াও যে সমাজ মধ্যে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, তাহা আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া জানিয়াছি। তিনি এক সময় আমাকে বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাহার নাকে এই চটিজুতাশুদ্ধ পায়ে টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি।" আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম, এবং এখনও করিতেছি যে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। তাঁহার চরিত্রের তেজ এমনি ছিল যে, তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী রাজারাও নগণ্য ব্যক্তির মধ্যে। তিনি একসময় নিজতেজে সমগ্র বঙ্গ সমাজকে কাঁপাইয়া গিয়াছেন।

—শিবনাথ শাস্ত্রী

বালবিধবার দুঃখ-দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল; এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে করুণামন্দাকিনীর ধারা বহিল। সুরনদী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করে, তখন কার সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে! বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল তখন কাহারও সাধ্য নাই যে, সে গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রূকুটি-ভঙ্গিতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই! এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই মেরুদণ্ড নমিত করে।
—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

●

বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া পিতা অল্প কয়েকদিনের জন্য যখন কলিকাতায় আসিতেন তখন তাঁহার প্রভাবে যেন সমস্ত বাড়ি ভরিয়া উঠিয়া গম্ গম্ করিতে থাকিত। দেখিতাম, গুরুজনেরা গায়ে জোব্বা পরিয়া, সংযত পরিচ্ছন্ন হইয়া, মুখে পান থাকিলে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার কাছে যাইতেন। সকলেই সাবধান হইয়া চলিতেন। রন্ধনের পাছে কোন ত্রুটি হয়, এইজন্য মা নিজে রান্না ঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধ কিনু হরকরা তাহার একমাথাওয়ালা পাগড়ি ও শুভ্র চাপকান পরিয়া দ্বারে হাজির থাকিত। পাছে বারান্দায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহার বিরাম ভঙ্গ করি, এজন্য পূর্বেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উঁকি মারিতে আমাদের সাহস হয় না।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

●

সেই খামখেয়ালীর যুগে রবিকাকাকে দেখেছি. তাঁর তখন কবিত্বের ঐশ্বর্য ফুটে বের হচ্ছে। চারদিকে নাম ছড়িয়ে পড়েছে। বাড়িতেও ছিলেন তিনি সবার আদরের। বাবামশায় যখন সভায় মজলিশে 'রবির একটা গান হোক বলতেন' সে যে কী স্নেহের সুর ঝরে পড়ত! তখন রবিকাকার গাইবার গলা কী ছিল, চারদিকে গম গম করত। বাড়িতে কিছু একটা হলেই তখন 'রবির গান' নইলে চলত না। আমরা ছিলুম সব রবিকাকার অ্যাডমায়ারার। জ্যোৎস্না রাতে ছাদে বসে রবিকাকার গান হত। সে-সব দিন গেছে। কিন্তু ছবি চোখের ওপর ভাসে, স্পষ্ট দেখতে পাই, এখনো সে-সব গানের সুর কানে লেগে আছে যেন।...আমার এখনো মনে হয় তাঁর সব রচনার মধ্যে—লেখাই বলো, ছবিই বলো—সব চেয়ে বড়ো হচ্ছে তাঁর গানের দান।
—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কৌতুকরসাত্মক

নির্দয় বলে ছেলেটা নামেই হৃদয়, দয়া মায়া একটুও ছিল না। পাখির বাসায় ইঁদুর, গরুর গোয়ালে বোলতা, ইঁদুরের গর্তে জল, বোলতার বাসায় ছুঁচোবাজি, কাকের ছানা ধরে তার নাকে তার দিয়ে নথ পরিয়ে দেওয়া, কুকুর ছানা বেড়াল ছানার ল্যাজে কাঁকড়া ধরিয়ে দেওয়া, ঘুমন্ত গুরু মহাশয়ের টিকিতে বিছুটি লাগিয়ে আসা, বাবার চাদরে চোরকাঁটা বিঁধিয়ে রাখা, মায়ের ভাঁড়ার ঘরে আমসির হাঁড়িতে আরশোলা ভরে দেওয়া এমনি নানা

উৎপাতে সে মানুষ, পশু পাখি, কীট পতঙ্গ সবাইকে এমন অন্যমনস্ক করেছিল যে কেউ তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না।
—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

●

বংশলোচন ছাগল লইয়া ফিরিলেন। 'বিনোদবাবু বলিলেন,—'বাহবা, বেশ পাঁঠাটি তো। কত দিয়ে কিনলে হে?'

বংশলোচন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। বিনোদ বলিলেন—"বেওয়ারিশ মাল, 'বেশী দিন ঘরে না রাখাই ভাল। সাবাড় ক'রে ফেল—কাল রবিবার আছে, লাগিয়ে দাও।'

চাটুজ্যে মশায় ছাগলের পেট টিপিয়া বলিলেন—'দিব্বি, পুরুষ্টু পাঁঠা। খাসা কালিয়া হবে।'

নগেন ছাগলের উরু টিপিয়া বলিল, 'উঁহু' হাড়িকাবাব। একটু বেশী করে আদা-বাটা আর পঁ্যাজ।'
—রাজশেখর বসু

●

এই কথা বলিতে না বলিতে, বাহিরে ভীষণ গর্জ্জনের শব্দ হইল। গর্জন করিয়া কে বলিল—"রায় মহাশয়! তবে কি দ্বার খুলিয়া দিবেন না?" সেই শব্দ শুনিয়া তনু রায় ভয় পাইলেন! কিসে এরূপ গর্জন করিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেখিবার নিমিত্ত আস্তে আস্তে দ্বার খুলিলেন। দ্বার খুলিয়া দেখেন না, সর্বনাশ! এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বাহিরে দণ্ডায়মান।

ব্যাঘ্র বলিলেন—"রায় মহাশয়! এই মাত্র আপনি সত্য করিলেন যে, ব্যাঘ্র আসিয়া যদি কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিতে চায়, তাহা হইলে ব্যাঘ্রের সহিত আপনি কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবেন। তাই আমি আসিয়াছি, এক্ষণে আমার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিন; না দিলে এই মুহূর্তে আপনাকে খাইয়া ফেলিব।"
—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

॥ সংলাপ অংশ ॥

উকীল। তোমার নিবাস কোথা?

কমলাকান্ত। আমার নিবাস নাই।

উকীল। বলি, বাড়ী কোথা?

কমলাকান্ত। বাড়ী দূরে থাক, আমার একটা কুঠারীও নাই।

উকীল। তোমার পেশা কি?

কমলাকান্ত। আমার আবার পেশা কি? আমি কি উকীল যে, আমার পেশা আছে?

উকীল। বলি, খাও কি করিয়া?

কমলাকান্ত। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ করি।

উকীল। কিছু উপার্জন কর?

কমলাকান্ত। এক পয়সাও না।

উকীল। তবে কি চুরি কর?

কমলাকান্ত। তাহা হইলে ইতিপূর্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপনি কিছু ভাগও পাইতেন। —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

●

পথে যেতে যেতে বললাম, কেন ছেড়ে দিলে নয়নদা, পুলিশে ধরিয়ে দিলে বেশ হতো।

কেন দাদাভাই?

বেশ ফাঁসি হয়ে যেত। খুন করলে ফাঁসি হয় আমাদের পড়ার বইয়ে লেখা আছে।

আছে না কি দাদা?

আছে বই কি। চলো না, বাড়ী গিয়ে তোমাকে বই খুলে দেখিয়ে দেব। নয়ন বিস্ময়ের ভান করে বললে, বলো কি দাদা, একটা মানুষ মারার বদলে আর একটা মানুষ মারা?

হ্যাঁ, তাইতো। সেই তো তার উচিত সাজা। আমরা পড়েছি যে। নয়ন একটুখানি হেসে বললে,—কিন্তু, সব উচিতই যে সংসারে হয় না, দাদাভাই। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

॥ পত্রাংশ ॥

ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালবাসি—ওর সেই গাছপালা নদীমাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা-সুদ্ধ দু হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম? স্বর্গ আর কী দিত জানিনে. কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতাময়. এমন সকরুণ আশঙ্কা-ভরা. অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আদরের ধন কোথা থেকে দিত। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

●

আমি এই পৃথিবীকে ভারী ভালবাসি। এর মুখে ভারী একটা সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে মনে আছে, আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালবাসি কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে। আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি নে। জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে। এইজন্য স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশী ভালবাসি। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

●

তুমি হয়তো এখুনি হেসে উঠবে। বলবে—"অকৃত্রিম স্নেহ অত সহজে হারিয়ে যায় না বড়দা!" সে কথা সত্যি দিদি! তবুও কি জানো—অতি অকৃত্রিম গভীর স্নেহও সংসারের অনেক রকম কারণ-অকারণের চাপে আচ্ছন্ন হয়ে আপনাকে আবৃত করে রাখতে বাধ্য হয়।...তারপরে আছে ভুল বোঝা। স্নেহ-ভালবাসা শ্রদ্ধা প্রীতি সম্পর্কের মধ্যে যত কিছু

অঘটন ঘটে, তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সত্যকার অপরাধ বা ত্রুটির চেয়ে ভুল বোঝাটাই শতকরা আশি ভাগেরও উপরে বর্তমান। ঐ ভুল বোঝাটাকেই আমি বেশায় ভয় করি। আমার বেশির ভাগ বইয়ে তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেচ এটা। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

॥ উত্তর দাও ॥

১। গদ্য সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্য কি ?
[উঃ—পৃঃ ৭১]

২। কিভাবে গদ্য পড়লে তোমার পাঠ সর্বাঙ্গসুন্দর হবে ?
[উঃ—পৃঃ ৭১—৭২]

৩। উদাহরণসহ সঠিক উচ্চারণ পদ্ধতির কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ কর।
[উঃ—পৃঃ ৭৩—৭৫]

৪। নীচের শব্দগুলি সঠিক উচ্চারণ কর :
হস্ত, মৃত, এখন, পদ্ম, জিহ্বা, স্কুল, বিদ্বান, নকল, বেকার, অগ্নি, রবীন্দ্র, সৌন্দর্য, আশিস্, সংশ্লিষ্ট, ব্যতিক্রম।
[উঃ -পৃঃ ৭৩—৭৫]

৫। উচ্চারণ ভেদে অর্থভেদের কয়েকটি উদাহরণ দাও।
[উঃ—পৃঃ ৭৪]

৬। কোন্ কোন্ সংখ্যাবাচক শব্দের অন্ত্য অ-কার উচ্চারিত হয় ?
[উঃ—পৃঃ ৭৩]

৭। পাঠ-সংকলন থেকে তোমার পছন্দমত একটি গদ্যাংশ পাঠ কর।
[উঃ—পৃঃ ৬৯—বাহুবল ও বাক্যবল]

৮। পাঠ-সংকলন থেকে একটি প্রবন্ধ অথবা একটি বিখ্যাত গল্প পাঠ কর।
[উঃ—পৃঃ ৬৯—বাহুবল ও বাক্যবল / পৃঃ ১১৭—মন্ত্রশক্তি]

৯। রচনাভঙ্গী অনুযায়ী বাংলা গদ্যকে সাধারণভাবে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ? ভাগগুলির নাম উল্লেখ কর।
[উঃ—পৃঃ ৭৬]

১০। রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্যধর্মী গদ্যাংশ পাঠ কর।
[উঃ—পৃঃ ৭৭]

১১। দেবেন্দ্রনাথের একটি বর্ণনামূলক গদ্যাংশ পাঠ কর।
[উঃ—পৃঃ ৭৯/ হিমালয়-ভ্রমণ, পাঠ-সংকলন পৃঃ ৫৫]

১২। বঙ্কিমচন্দ্রের সংলাপধর্মী এবং কৌতুকময় যে কোন একটি গদ্যাংশ পড়ে শোনাও তো।
[উঃ—পৃঃ ৮৭—৮৮]

১৩। ভ্রমণমূলক কোন্ রচনা পাঠ-সংকলনে পড়েছ? ঐ রচনা হতে অংশবিশেষ পাঠ কর।

[উঃ—পৃঃ ৫৫—হিমালয়-ভ্রমণ]

১৪। বাংলা সাহিত্যে চিন্তামূলক রচনার জন্য বিখ্যাত কয়েকজন সাহিত্যিকের নামোল্লেখ কর। এঁদের যে কোন একজনের রচনাংশ আমাদের শোনাও।
[উঃ—পৃঃ ৮৪; 'তীরে দাঁড়িয়ে......বেড়ে চলতে থাকে।'—অংশটি পড়; পাঠ-সংকলনের বাহুবল ও বাক্যবল চিন্তামূলক রচনা, পৃঃ ৬৯]

১৫। সংস্কৃতানুগ ভাবগম্ভীর বর্ণনভঙ্গী ফুটে উঠেছে বিদ্যাসাগরের এমন একটি রচনাংশ পাঠ কর।

[উঃ পৃঃ ৭৯]

১৬। যে কোনও লেখকের একটি ভ্রমণ কাহিনী থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনাও।
[উঃ—পৃঃ ৮১, ভূত যখন......কি জয়। পাঠ-সংকলন—হিমালয় ভ্রমণ পৃঃ ৫৫ ও ভানুসিংহের পত্র পৃঃ ৯৮]

১৭। কোন বিখ্যাত মনীষীর পত্র থেকে কিছু অংশ পড়।
[উঃ—পৃঃ ৮৮, পাঠ-সংকলন—ভানুসিংহের পত্র পৃঃ ৯৮]

১৮। তোমার খুব ভাল লাগে এমন একটি গদ্যাংশ আবৃত্তি কর।
[উঃ—পৃঃ ৭৯, আর্য!......গমন করিতেছে।
অথবা পাঠ-সংকলের ৮৬পৃঃ—"নদীর প্রবল স্রোতটি......রচনা করিয়া গিয়াছেন।"]

তৃতীয় অধ্যায়

নাট্যাংশ—আবৃত্তি ও পাঠ

নাটক আবৃত্তি বা পাঠ ছাত্রছাত্রীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে, ঐ পঠনের মাধ্যমে নাটকের চরিত্রসমূহের বক্তব্য এবং মানসিকতা কতদূর তারা পাঠক মনে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে, তারই বিচারের জন্য মৌখিক পরীক্ষায় এই বিষয়টি সংযোজন করা হয়েছে।

সার্থক এবং সুন্দরভাবে কি করে নাটক বা নাট্যাংশ পড়তে হয়, তা শেখবার আগে ছাত্রছাত্রীদের নাটক এবং অভিনয় সম্বন্ধে কিছু ধারণা করে নেওয়া প্রয়োজন।

নাটক কাকে বলে :

সংলাপের মাধ্যমে নাটক রচিত হয়। অভিনেতা নাট্যকার-রচিত চরিত্র-সমূহকে বাস্তব করে তোলেন। সুতরাং রঙ্গমঞ্চের সাহায্য ব্যতীত নাটকীয় বিষয় প্রাণময় হতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে নাটক রঙ্গমঞ্চের সাহায্য নিয়ে, চিরচঞ্চল মানবজীবনকে নবরূপ দান করে এবং সার্থকভাবে প্রতিফলিত করে তুলতে চায়।* শ্রেষ্ঠ নাটক রচয়িতা তাঁর রচিত কোন চরিত্রের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখান না; তিনি সর্বদাই পর্দার নেপথ্যে থাকেন। অবশ্য অনেক সময় চরিত্রসমূহের মুখে নাট্যকার নিজস্ব মনোভাব ও আদর্শ ব্যক্ত করে থাকেন। কিন্তু যে নাট্যকার নির্লিপ্ত থেকেও নাটকের মধ্যে নিজস্ব বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, তিনি প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার।

আধুনিক কালে যাকে আমরা নাটক নাম দিয়েছি, তার প্রকৃত জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। বাংলা নাটকের জন্মলগ্ন থেকেই পৌরাণিক, সামাজিক এবং প্রহসনধর্মী নাটক রচিত হতে থাকে—পরে অন্যান্য শ্রেণীর নাটক রচিত হয়।

নবপ্রবর্তিত বাংলা মৌখিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের যে কোন প্রখ্যাত নাট্যকারের কোন একটি নাটকের অংশবিশেষ পাঠ বা আবৃত্তি করতে দেওয়া হবে—সমগ্র নাটকটি নয়। নাটক আবৃত্তি বা পাঠ অভিনয়েরই আংশিক দিক।

শৈশব থেকেই অভিনয়ের ইচ্ছে মানুষের মনে বাসা বাঁধে। 'মনে করো যা বিদেশ ঘুরে, তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি, অনেক দূরে' কিংবা 'আমি যদি খোকা না হয়ে হতেম কুকুর ছানা' অথবা 'যখন হবো বাবার মতো বড়ো'—এমন আকাঙ্ক্ষার মূলে রয়েছে অভিনয়ের প্রবণতা। অন্যের স্থানে নিজেকে বসিয়ে ভাবা বা নিজের স্থানে অন্যকে কল্পনা করা মানেই তো অভিনয়।

অভিনেতা অভিনয়ের কাজ সম্পন্ন করেন আবৃত্তি, মুখের ভাব (expression) এবং অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে। কিন্তু নাট্যাংশ আবৃত্তি বা পাঠে মুখভঙ্গী বা অঙ্গভঙ্গীর কোন সুযোগ

---

* **Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre.**
—*Elizabeth Drew.*

নেই—এখানে কণ্ঠস্বরই একমাত্র অবলম্বন। তবে অভিনেতা যদি গদ্যের ভঙ্গীতে টানা পড়ে যান তা শ্রোতার মনে কোন আবেদনই সৃষ্টি করবে না।

কি ভাবে নাটক আবৃত্তি বা পাঠ করবো :

মনে রাখতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের নাট্যাংশ আবৃত্তি বা পাঠ করতে দেওয়া হবে, অভিনয় করতে নয়। অংগভংগী ব্যতিরেকে বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর বক্তব্যকে যথাসম্ভব শ্রোতার কাছে বাস্তব এবং হৃদয়গ্রাহী করে তোলাই তার কাজ।
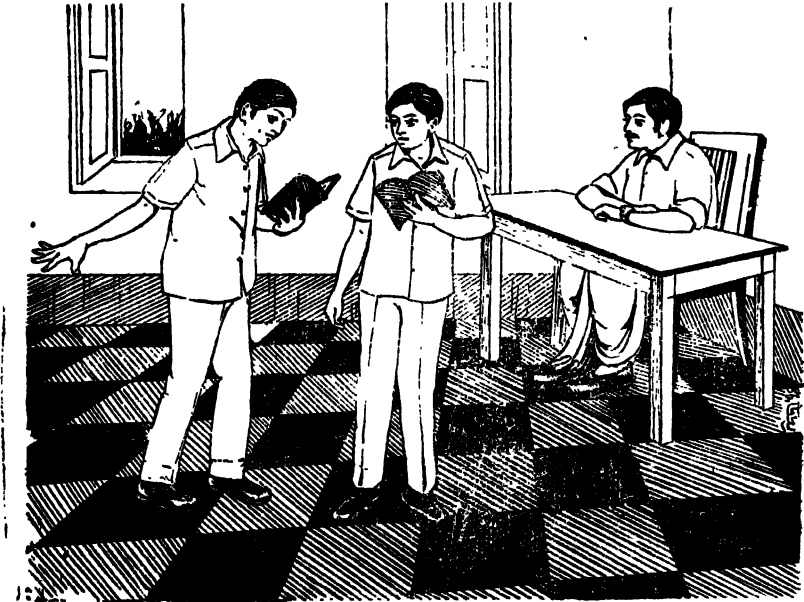
দুটি ছাত্র নাট্যাংশ আবৃত্তি করছে

বলা বাহুল্য এই কাজে সাফল্য অর্জনের প্রধান উপায় পাত্র-পাত্রীর বক্তব্যকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করা এবং তাদের মনোভাবকে হৃদয়ঙ্গম করা। এই মনোভাব প্রকাশিত হচ্ছে সংলাপের মাধ্যমে। সুতরাং পাত্রপাত্রীর সংলাপের প্রতিটি অংশ যাতে সুস্পষ্ট কণ্ঠে এবং নির্ভুল ভাবে উচ্চারিত হয়, তা দেখতে হবে। চরিত্রসমূহের ভাব এবং মানসিকতা অনুযায়ী অভিনেতা স্বরসংযোগ করবে, কণ্ঠস্বরে বৈচিত্র্য আনবে। করুণ রসাত্মক সংলাপ উচ্চারণের সময় কণ্ঠস্বরে কারুণ্য যেমন আসবে, তেমনি দৃপ্ততা, আবেগ অথবা হাস্যরস প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠক ব্যবহার করতে পারবেন। প্রয়োজন মতো কণ্ঠস্বরকে উঁচু নিচু করবার অধিকার অভিনেতার আছে, কারণ, মনে রাখতে হবে, অভিনেতার সামনে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা ঠিক দর্শক নন, তাঁরা শ্রোতা। তাই সমস্ত সংলাপই কথার ভঙ্গীতে বলতে হবে।

স্মরণ রাখা উচিত, নাট্যাংশটির শ্রেণী অনুযায়ী, নাট্যাংশ-পাঠকের বাচনভঙ্গী ভিন্ন ধরনের

হবে। অর্থাৎ কাব্যনাট্য, ঐতিহাসিক নাটক, পৌরাণিক নাটক প্রহসন বা হাস্যরসাত্মক নাটক কিংবা সামাজিক নাটক—প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই অভিনেতার উচ্চারণভঙ্গী এবং বাচনভঙ্গীর পার্থক্য থাকবে। সামাজিক নাটকের পাত্র-পাত্রীর কথাবার্তা স্বাভাবিক হবে—প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যে ভাবে আমাদের নিজেদের মধ্যে কথা বলে থাকি ঠিক সেই ভঙ্গী সেখানে আনা চাই। কিন্তু অন্য জাতীয় নাটকে পরিবেশ যুগ এবং চরিত্রের মানসিকতা বিচার করে নাট্যাংশ পাঠক তার সংলাপ উচ্চারণ করবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। প্রশ্নকর্তা একটি ছাত্র বা ছাত্রীকে আহ্বান করে কোন একটি দৃশ্য বা দৃশ্যাংশের আবৃত্তি বা পাঠ করতে বলতে পারেন। আবার তিনি তিন-চারটি ছেলে বা মেয়েকে একই সঙ্গে ডেকে, এক একজনের উপর এক একটি চরিত্র ফোটানোর ভার দিতে পারেন। প্রথম ক্ষেত্রে যেহেতু একজনই অভিনেতা, একজনকেই প্রত্যেকের চরিত্র রূপায়ণ করতে হবে, সেই হেতু বিভিন্ন চরিত্রের রূপাঙ্কন করতে এক্ষেত্রে প্রয়োজন মতো তার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কণ্ঠস্বর পরিবর্তন অর্থে স্বরবৈচিত্র্যের কথা বলা হচ্ছে। তবে চরিত্রের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে কণ্ঠস্বর যেন বিকৃত না হয়ে পড়ে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

ছাত্রছাত্রীদের যদি একত্র ভাবে আহ্বান করা হয়, তবে তারা নিজেরা ঠিক করে নেবে, কে কার চরিত্র পাঠ করবে। পরীক্ষক এক একজনকে এক একটি চরিত্রের ভার দিলে তো কোন সমস্যাই থাকবে না। এই দুটি ক্ষেত্রেই ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তি বা পাঠের সময় যতদূর সম্ভব তাদের কণ্ঠে অভিনয়ের মেজাজ আনতে চেষ্টা করবে। যদিও এক্ষেত্রে অঙ্গসঞ্চালন বা মুখভঙ্গী অভিপ্রেত নয়, তবু প্রয়োজনবোধে অল্প অঙ্গভঙ্গী বা মুখভঙ্গী দোষের নয়, বরং তা পরীক্ষককে আকৃষ্টই করবে। তবে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে তোমাকে অভিনয় করতে বলা হয় নি—বলা হয়েছে দৃশ্যটি আবৃত্তি বা পাঠ করতে।

নাট্যাংশ আবৃত্তি এবং পাঠ করবার এবং সাফল্য লাভ করে শ্রোতাদের মনে প্রত্যাশিত আবেদন সৃষ্টি করবার একমাত্র উপায় বারংবার অনুশীলন। এইজন্য এবার আমরা নাটকগুলিকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করে বিখ্যাত নাটকের অংশ বিশেষ মন্তব্য সহ উদ্ধৃত করছি। নির্দেশ অনুযায়ী এগুলি অনুশীলন করে গেলে, মনে হয় যে কোন নাট্যাংশই আবৃত্তি বা পাঠ সহজতর হয়ে উঠবে।

নাটকের প্রকারভেদ ঃ

পরিণতি এবং আস্বাদের দিক থেকে নাটককে কমেডি, ট্র্যাজেডি ও প্রহসনে ভাগ করা যায়। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই বিভাগ হবে নিম্নরূপ ঃ—

ক) পৌরাণিক নাটক
খ) ঐতিহাসিক নাটক
গ) চরিত নাটক
ঘ) কাব্যনাট্য
ঙ) প্রহসনধর্মী নাটক
চ) রূপক ও সাংকেতিক নাটক
ছ) সামাজিক নাটক।

। পৌরাণিক নাটক ।

ভীষ্ম

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

(পৌরাণিক নাটক 'ভীষ্ম'-এর শেষ দৃশ্য। এখানে চরিত্র পাঁচটি : রাম, ভীষ্ম, অর্জুন, দুর্যোধন, কর্ণ। রাম অর্থাৎ পরশুরাম এই নাট্যাংশে একবার মাত্র আবির্ভূত। ভীষ্মকে উদ্দেশ্য করে এই চরিত্রের রূপকার কাব্যাকারে তার সংলাপ বলবে। বর্তমান নাট্যাংশের প্রধান চরিত্র ভীষ্ম। এই চরিত্রের অভিনেতাকে একদিকে মৃত্যুযন্ত্রণা অন্যদিকে সহজ সরল অথচ দৃঢ় ব্যক্তিত্বের ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে হবে। অর্জুনের চরিত্রে বিনীত ভাব, দুর্যোধনের চরিত্রে কিছুটা বিরক্তিভাব পাঠের সময় কণ্ঠে ফুটে ওঠা চাই। কর্ণের চরিত্র রূপায়ণে বিনয়, বিস্ময় এবং অসহায়তা প্রকাশক পংক্তিগুলো লক্ষ্য রেখে সংলাপ উচ্চারণ করতে হবে।)

রাম। হে ত্যাগের একাদর্শ পুরুষ প্রধান !
কণ্ঠ রুদ্ধ, বাক্য অবসান—আর কি বলিব আমি !
ধর্ম তুমি, মর্ম ধরণীর,
আত্মা তুমি সর্ব মহর্ষির।
বিদায়ের পূর্বক্ষণে, এক বিন্দু মুক্ত-অশ্রুনীর
এই পুণ্য শয্যাতলে দিলাম অঞ্জলি।

ভীষ্ম। এস মহারথগণ, এস। আমি তোমাদের দেখে পরম সন্তুষ্ট হলুম। হস্তপদ বদ্ধ—হাত তুলতে পারলুম না। তোমরা সকলে আমার বাক্যের আমন্ত্রণ গ্রহণ কর। ভাই সব, আমার মাথাটা ঝুলছে, তোমাদের মুখ আমি ভাল ক'রে দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে একটা উপাধান দাও। (দুর্যোধন কর্তৃক বালিশ প্রদান) না ভাই, এ উপাধান ত শরশয্যার যোগ্য নয়। ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয়—কোথায় ধনঞ্জয় ?

অর্জুন। এই আপনার ভৃত্য পিতামহ ! কি করতে হবে দাসকে আজ্ঞা করুন।

ভীষ্ম। মাথাটা ঝুলছে—একটা উপাধান দিয়ে মাথাটা তুলে দাও। (অর্জুন ভূমিতে বাণ বিদ্ধ করিয়া ভীষ্মের মস্তক তুলিয়া দিলেন) হাঁ—এই আমার উপযুক্ত উপাধান। শোন ধনঞ্জয়, তুমি যদি আজ আমাকে আমার মনোমত উপাধান না দিতে পারতে, আমি ক্রুদ্ধ হ'য়ে তোমাকে শাপ দিতুম। ধনঞ্জয়—ভাই ! শিখণ্ডীর পশ্চাতে থেকে তুমি যে সমস্ত বাণ নিক্ষেপ ক'রেছ, তাতে আমার শরীর দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। মর্মস্থান সকল ছিন্ন ভিন্ন—মুখ শুষ্ক—আমি নিতান্ত আকুল হয়েছি—বড় পিপাসা।

দুর্যোধন। (পানীয় সংগ্রহ করিয়া) পিতামহ ! এই সুশীতল জল এনেছি পান করুন।

ভীষ্ম। দুর্যোধন ! তুমি আমার অবস্থা বুঝতে পারছ না। আমার এ জীবন আর ইহলোকের জীবন নয়। আমি শরশয্যায় শুয়ে মনুষ্যলোকের বাইরে চলে এসেছি। যে জলে তোমরা তৃপ্ত হও, সে জলে আমার তৃষ্ণা নিবারণ হবে না। ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয়, শীঘ্র আমার তৃষ্ণা নিবারণ কর। (অর্জুন ভূমিতে বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ভূমি হইতে জল উত্থান)

অর্জুন। পিতামহ! পাতাল থেকে ভোগবতী প্রস্রবণ-রূপে আপনার তর্পণের জন্য উত্থিত হয়েছেন—পান করুন।

ভীষ্ম। আঃ! কি তৃপ্তি! দুর্যোধন দেখ, তোমার সহায়তার জন্য যে সমস্ত রাজা এখানে উপস্থিত হ'য়েছেন, তাঁরাও দেখুন—অর্জুনের এই অমানুষিক শক্তি। ভাই সব, আমার শেষ অনুরোধ শোন, কেশব-সখা ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ না ক'রে তার সঙ্গে সন্ধি কর। পাণ্ডবদের অর্ধ-রাজ্য প্রদান কর।

দুর্যোধন। পিতামহ! যখন আপনি উপযুক্ত সেবক লাভ করেছেন, তখন আমাদের অনুমতি করুন, আমরা শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করি।

ভীষ্ম। এস ভাই! আমি সানন্দে অনুমতি দিচ্ছি! পদতলে তুমি কে হে?

কর্ণ। যে প্রতিদিন নয়নপথে আপনার অতিথি হ'ত, আর আপনি যাকে সর্বদা দ্বেষ ক'রতেন, আমি সেই রাধেয়।

ভীষ্ম। পদতলে নয়—তুমি একবার আমার হৃদয়ের কাছে এস। শোন কর্ণ, এইবার আমার অন্তরের কথা শোন। আমি তোমাকে কখনও দ্বেষ করি নি। কুরুপাণ্ডবকে যেমন ভালবাসি, তোমাকেও সেইরূপ ভালবাসি। কেন ভালবাসি—ভাইসব, কিয়ৎক্ষণের জন্য অন্তরালে গমন কর। (সকলের প্রস্থান) কর্ণ! তুমি রাধানন্দন নও—কুন্তীনন্দন!

কর্ণ। পিতামহ—পিতামহ! আপনি শরশয্যায়—অস্তগমন মুখে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় এ বিস্ময়কর মূর্তির বিকাশে আমার মস্তিষ্ক বিচলিত ক'রবেন না। দুর্যোধনের সাহায্য করবার প্রতিজ্ঞায় আমি আবদ্ধ। রক্ষা করুন পিতামহ, আমাকে রক্ষা করুন।

ভীষ্ম। আরও শোন—এই ভূতলে তোমার সমকক্ষ একজনও নাই। জগতের শ্রেষ্ঠ বীরত্ব নিয়ে তুমি জন্মগ্রহণ ক'রেছিলে। তোমার হৃদগত নারায়ণ তোমার পৈতৃক সম্পত্তি; তোমার দানের তুলনা তুমি। কিন্তু এই অপূর্ব গুণসমষ্টি পেয়েও লঘুসঙ্গে তোমার প্রভা অর্ধবিলুপ্ত হয়ে গেছে। জানি, তুমি দুর্যোধনের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পারবে না। তাই কুলভেদ ভয়ে আমি তোমাকে সময়ে সময়ে কটুবাক্য প্রয়োগ ক'রতুম। শুনে রাখ আদিত্য-নন্দন! কেশব ধনঞ্জয়ের ন্যায় আমি তোমাকেও অন্তরে শ্রদ্ধা করি।

কর্ণ। এর চেয়ে যে আপনার তিরস্কার ভাল ছিল পিতামহ! এ মধুর বাক্যে আমার বক্ষে আপনি শেল বিঁধছেন কেন? মহাত্মন্, আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন মনে রাখব, আপনার কঠোর বাক্যে মূর্খের মতন আত্মহারা হ'য়ে অস্ত্রত্যাগ ক'রে আমি আপনাকে হত্যা ক'রেছি। নইলে ভোগবতীর জল এনে তৃতীয় পাণ্ডবকে আজ আপনার তর্পণ ক'রতে হ'ত না!

ভীষ্ম। যাও ভাই! যখন কিছুতেই তুমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে নিরস্ত হবে না, তখন তোমাকে বলি, অহংকার ত্যাগ ক'রে শুধু বীরত্ব অবলম্বন ক'রে যুদ্ধ কর। তোমার মঙ্গল হো'ক।

॥ ঐতিহাসিক নাটক ॥

রাণা প্রতাপ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ' নাটকের অংশ বিশেষ। চরিত্র : প্রতাপ, গোবিন্দ, পৃথ্বীরাজ, কবিরাজ। প্রতাপ দেশপ্রেমিক। মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁর ক্ষোভ, চিতোর উদ্ধার হলো না। মুমূর্ষু হলেও তেজোদ্দীপক ভঙ্গীতে সংলাপ বলবে প্রতাপের অভিনেতা, প্রয়োজনে তার কণ্ঠস্বরে লাগবে আবেগের ঢেউ। গোবিন্দ সিংহ প্রতাপের চিরসঙ্গী—তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই প্রেমের ভাবটি তাঁর সংলাপে ফুটে ওঠা চাই। পৃথ্বীরাজের সংলাপ একটিবার মাত্র। বোঝানোর ভঙ্গীতে এই চরিত্রের অভিনেতা তার বক্তব্য বলবে। নাটকের এই দৃশ্যে অমর সিংহের কোন কথা নেই। কবিরাজ সাধারণ ভঙ্গীতেই কথা বলবে।)

প্রতাপ—আমাকে এই শিবিরের বাইরে একবার নিয়ে চল। মরবার আগে আমার চিতোর দুর্গ দেখে নিই।

(গোবিন্দসিংহ কবিরাজের দিকে সপ্রশ্ন নয়নে চাহিলেন)

কবিরাজ—ক্ষতি কি ?

(সকলে মিলিয়া প্রতাপসিংহকে পর্যঙ্কে বাহিয়া দুর্গের সম্মুখে বসাইলেন। ইত্যবসরে গোবিন্দসিংহ জনান্তিকে কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন)

গোবিন্দসিংহ (জনান্তিক)—বাঁচবার কি কোন আশাই নেই ?

কবিরাজ—কোন আশাই নেই।

(গোবিন্দ মস্তক অবনত করিলেন)

(প্রতাপ শয্যায় অর্ধশায়িত হইয়া অদূরবর্তী চিতোর-দুর্গের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন)

প্রতাপ—ঐ সেই চিতোর! ঐ সেই দুর্জয় দুর্গ, যা একদিন রাজপুতের ছিল! ঐ সেই চিতোর, যা উদ্ধার করব ভেবেছিলাম; কিন্তু তার পূর্বেই দিবা অবসান হ'ল! কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

পৃথ্বীরাজ—তার জন্য চিন্তা নেই, প্রতাপ; সকল সময়ে কাজ একজনের দ্বারা সম্পন্ন হয় না, অসম্পূর্ণ থেকে যায়; কখনও বা পিছিয়ে যায়। কিন্তু আবার একদিন সেই ব্রতের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী আসে, যে সেই অসম্পূর্ণ কাজকে আগিয়ে নিয়ে যায়। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসে, আবার পিছোয়; সমুদ্র এইরূপে অগ্রসর হয়।

প্রতাপ—চিন্তা থাকত না, যদি বীরপুত্র রেখে যেতে পারতাম!

(এই বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন)

গোবিন্দ—রাণার কি অত্যধিক যন্ত্রণা হচ্ছে ?

প্রতাপ—হাঁ, যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু দৈহিক নয়, গোবিন্দসিংহ! যন্ত্রণা মানসিক। আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মৃত্যুর পরে এ কাজ আবার অনেক পিছিয়ে যাবে।

গোবিন্দ—কেন রাণা ?

প্রতাপ—আমার মনে হচ্ছে যে, আমার পুত্র অমরসিংহ বাদশাহী সম্মানের লোভে আমার পুনরর্জিত রাজ্য মোগলের হাতে সঁপে দেবে।

গোবিন্দ—সে ভয়ের কোন কারণ নেই, রাণা!

প্রতাপ। কারণ আছে, গোবিন্দসিংহ। অমর বিলাসী ; এ দারিদ্র্যের বিষ সে সহ্য করতে পারবে না। তাই ভয় হয় যে, আমি গেলে এ কুটিরের জায়গায় প্রাসাদ নির্মিত হবে, আর তোমরাও তার সে বিলাস প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেবে।

গোবিন্দ—বাপ্পার নামে অঙ্গীকার করছি, তা কখনো হবে না।

প্রতাপ—এখন তবে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি!

(পরে অমরসিংহের দিকে চাহিয়া কহিলেন)

—অমরসিংহ! কাছে এস, আমি যাচ্ছি। শোন! যেখানে আমি আজ যাচ্ছি, সেখানে একদিন সকলেই যায়। কেঁদো না, বৎস!- আমি তোমাকে একাকী রেখে যাচ্ছি না। আমি তোমাকে যাদের কাছে রেখে যাচ্ছি, তারা এতদিন সুখে-দুঃখে, পর্বতে, অরণ্যে এই পঁচিশ বৎসর ধরে আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল। তুমি যদি তাদের ত্যাগ না কর, তারা তোমাকে ত্যাগ করবে না। তারা প্রত্যেকেই প্রতাপসিংহের পুত্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত—আমি তোমাকে সমস্ত মেবার রাজ্য দিয়ে যাচ্ছি—শুধু চিতোর দিয়ে যেতে পারলাম না, এই দুঃখ রইল। তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি সেই চিতোর উদ্ধারের ভার, আর পিতার আশীর্বাদ—যেন তুমি সে চিতোর উদ্ধার করতে পার।- আমি দিয়ে যাচ্ছি এই নিষ্কলঙ্ক তরবারি—যার সম্মান আশা করি, তুমি উজ্জ্বল রাখবে। আর কি বলব পুত্র! যাও জয়ী হও, যশস্বী হও, সুখী হও!—এই আমার আশীর্বাদ লও।

(অমরসিংহ পিতার পদধূলি লইলেন। প্রতাপসিংহ পুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে কহিলেন)

—জগৎ অন্ধকার হয়ে আসছে। কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসছে। অমরসিংহ কোথায় তুমি! এস, প্রাণাধিক!—আরো কাছে এস।

কবিরাজ—রাণার মানব লীলা শেষ হয়েছে। সৎকারের আয়োজন করুন—

গোবিন্দ- পুরুষোত্তম! মেবারসূর্য! প্রিয়তম তোমার চিরসঙ্গীকে ফেলে কোথায় গেলে ?

॥ সাজাহান ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(সাজাহান দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি। সাজাহানই নাটকের নায়ক। বিচারহীন পিতৃত্ব ও সম্রাটত্বের দ্বন্দ্বেই তাঁর ট্র্যাজেডি। আলোচ্য নাট্যাংশে অবশ্য তিনি অনুপস্থিত। তবে নাটকের অন্য দুই মুখ্য চরিত্র ঔরংজীব ও মহম্মদ উপস্থিত। মহম্মদ অত্যন্ত পিতৃভক্ত পুত্র। কিন্তু স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও পিতৃভক্তির দ্বন্দ্বে সেও বিক্ষত। এই অংশে মহম্মদের অসহায় ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে হবে। তবে স্বাধীন বিচার ক্ষমতার উন্মেষের পর পিতা ঔরংজীবের সঙ্গে তার কথোপকথনের সময় সব-কিছু-হারিয়ে-ফেলা ভাবটি সংলাপ উচ্চারণকারীর কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলতে হবে। ঔরংজীবের চরিত্রে কিছুটা বিব্রত ভাব ফুটে উঠেছে। যে ঔরংজীবের সংলাপ পাঠ করবে তার কণ্ঠে এই ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে হবে।)

মহম্মদ। পিতা! আমায় ডেকেছিলেন?

ঔরংজীব। হাঁ, আমি কাল রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি, তুমি সুজার অনুসরণ কর্বে। মীরজুমলাকে তোমার সাহায্যে রেখে গেলাম।

মহম্মদ। যে আজ্ঞা পিতা।

ঔরংজীব। আচ্ছা যাও। দাঁড়িয়ে রৈলে যে? সে বিষয়ে কিছু বলবার আছে?

মহম্মদ। না পিতা। আপনার আজ্ঞাই যথেষ্ট।

ঔরংজীব। তবে?

মহম্মদ। আমার একটা আর্জি আছে পিতা।

ঔরংজীব। কী!—চুপ করে রৈলে যে! বল পুত্র!

মহম্মদ। কথাটা অনেক দিন থেকে জিজ্ঞাসা কর্ব মনে করছি; কিন্তু এ সংশয় আর বক্ষে চেপে রাখতে পারি না। ঔদ্ধত্য মার্জনা কর্বেন।

ঔরংজীব। বল।

মহম্মদ। পিতা! সম্রাট সাজাহান কি বন্দী?

ঔরংজীব। না! কে বলেছে?

মহম্মদ। তবে তাঁকে প্রাসাদে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে কেন?

ঔরংজীব। সেরূপ প্রয়োজন হয়েছে।

মহম্মদ। আর ছোট কাকা—তাঁকে এরূপে বন্দী করে' রাখা কি প্রয়োজন?

ঔরংজীব। হাঁ।

মহম্মদ। আর আপনার এই সিংহাসনে বসা—পিতামহ বর্তমানে?

ঔরংজীব। হাঁ পুত্র!

মহম্মদ। পিতা! (বলিয়া মুখ নত করিলেন)

ঔরংজীব। পুত্র! রাজনীতি বড় কূট। এ বয়সে তা বুঝতে পার্বে না। সে চেষ্টা করো না।

মহম্মদ। পিতা! ছলে সরল ভ্রাতাকে বন্দী করা, স্নেহময় পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করা, আর ধর্মের নামে এসে সেই সিংহাসনে বসা—এর নাম যদি রাজনীতি হয়, তা হলে সে রাজনীতি আমার জন্য নয়।

ঔরংজীব। মহম্মদ! তোমার কি কিছু অসুখ করেছে? নিশ্চয়!

মহম্মদ। (কম্পিত স্বরে) না পিতা! আপাততঃ আমার চেয়ে সুস্থ ব্যক্তি বোধ হয় ভারতবর্ষে আর কেহই নাই।

ঔরংজীব। তবে! আমার প্রতি তোমার অটল বিশ্বাস কে বিচলিত করছে পুত্র?

মহম্মদ। আপনি স্বয়ং!—পিতা! যতদিন সম্ভব আপনাকে আমি বিশ্বাস করে এসেছি, কিন্তু আর সম্ভব নয়। অবিশ্বাসের বিষে জর্জরিত হয়েছি।

ঔরংজীব। এই তোমার পিতৃভক্তি!—তা হবে। প্রদীপের নীচেই সর্বাপেক্ষা অন্ধকার।

মহম্মদ। পিতৃভক্তি!—পিতা! পিতৃভক্তি কি আজ আমার আপনার কাছে শিখতে হবে! পিতৃভক্তি!—আপনি আপনার বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে তাঁর যে সিংহাসন কেড়ে নিয়েছেন, আমি পিতৃভক্তির খাতিরে সেই সিংহাসন পায়ে ঠেলে দিয়েছি। পিতৃভক্তি! আমি যদি পিতৃভক্ত না হতাম, তবে দিল্লীর সিংহাসনে আজ ঔরংজীব বসতেন না, বসতো এই মহম্মদ!

ঔরংজীব। তা জানি পুত্র! তাই আশ্চর্য হচ্ছি।—পিতৃভক্তি হারিও না বৎস।

মহম্মদ। না, আর সম্ভব নয় পিতা! পিতৃভক্তি বড় মহৎ, বড় পবিত্র জিনিস, কিন্তু পিতৃভক্তির উপরেও এমন কিছু আছে, যার কাছে পিতা, মাতা, ভ্রাতা সব খর্ব হয়ে যায়।

ঔরংজীব। তোমার পিতৃভক্তি হারিও না বলছি পুত্র! জেনো, ভবিষ্যতে এই রাজ্য তোমার!

মহম্মদ। আমায় রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছেন পিতা? বলি নাই যে কর্তব্যের জন্য ভারত সাম্রাজ্যটা আমি লোষ্ট্রখণ্ডের মতো দূরে নিক্ষেপ করেছি। পিতামহও সেদিন এই রাজ্যের লোভ দেখিয়েছিলেন। হায়! পৃথিবীতে সাম্রাজ্য কি এতই মহার্ঘ? আর বিবেক কি এতই সুলভ? সাম্রাজ্যের জন্য বিবেক খোয়াবো পিতা! আপনি বিবেক বর্জন করে সাম্রাজ্য লাভ করেছেন, সে সাম্রাজ্য কি পরকালে নিয়ে যেতে পারবেন? কিন্তু এই বিবেকটুকু বর্জন না কর্লে সঙ্গে যেত।

ঔরংজীব। মহম্মদ!

মহম্মদ। পিতা!

ঔরংজীব। এর অর্থ কি?

মহম্মদ। এর অর্থ এই যে, আমি আপনার জন্য সব হারিয়ে বসে আছি, সেই আপনাকেও আজ আর হৃদয়ের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না—বুঝি তাও হারালাম। আজ আমার মতো দরিদ্র কে! আর আপনি—আপনি এই ভারত সাম্রাজ্য পেয়েছেন বটে! কিন্তু তার চেয়ে বড় সাম্রাজ্য আজ হারালেন।

ঔরংজীব। সে সাম্রাজ্য কি?

মহম্মদ। আমার পিতৃভক্তি। সে যে কি রত্ন, সে যে কি সম্পদ—কি যে হারালেন—আজ আর বুঝতে পারছেন না। একদিন পারবেন বোধ হয়।

॥ সিরাজদ্দৌলা ॥
শচীন সেনগুপ্ত

(সিরাজদ্দৌলা শচীন সেনগুপ্তের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি নাটক। এই নাটকে নাট্যকার নতুন এক সিরাজকে তুলে ধরেছেন, যিনি উদার, তেজস্বী, নির্ভীক, সত্যাশ্রয়ী এবং দেশপ্রেমিক। উৎকলিত নাট্যাংশটিতে একদিকে সিরাজের চরিত্রগত উদারতা অন্যদিকে দেশ-প্রেমের পরিচয় ফুটে উঠেছে। জাতিধর্ম ভুলে গিয়ে তিনি প্রত্যেককে একতাবদ্ধ হতে বলছেন। এখানে সিরাজের চরিত্রই প্রধান এ ছাড়া রয়েছেন, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর এবং মোহনলাল ও মীরমদন। সিরাজের সংলাপ যে পাঠ করবে তার কণ্ঠস্বরে একদিকে থাকবে রাজোচিত গাম্ভীর্য অন্যদিকে আবেগময়তা। বিশেষতঃ, 'আজ বিচারের দিন নয়......ত্যাগ করবেন না. বিপদে আপনজন......সেইতো পুরুষ ; বাংলা শুধু হিন্দুর নয়......মরণের অভিযান' ইত্যাদি সংলাপ আবৃত্ত হওয়ার সময় কণ্ঠস্বরে আবেগ ও ব্যাকুলতা ঝরে পড়া চাই। অন্যান্য চরিত্রের সংলাপ সহজ ভঙ্গিতে বলতে হবে।)

সিরাজ। জাফর আলি খাঁ! আজ বিচারের দিন নয়, সৌহার্দ্য স্থাপনের দিন। অন্যায় আমিও করেছি, আপনারাও করেছেন। খোদাতালার কাছে কে বেশী অপরাধী তা তিনিই বিচার করবেন। আজ আপনাদের কাছে এই ভিক্ষা যে, আমাকে শুধু এই আশ্বাস দিন যে, বাংলার দুর্দিনে আমাকে ত্যাগ করবেন না।

রাজবল্লভ। এই দুর্দিনের জন্য কে দায়ী জনাব ?

সিরাজ। আবারও বিচার বাজা!

রাজবল্লভ। বিচার নয় জাঁহাপনা। আমি বলতে চাই যে, এখনও সময় আছে। এখনও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে আপোসে নিষ্পত্তি সম্ভবপর।

সিরাজ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে আপোস! রাজা, ওয়াটসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেও কি আপনারা তাদের মনোভাব বুঝতে পারেন নি ? কলকাতায় সৈন্য সমাবেশ, চন্দননগরে আক্রমণ, কাশিমবাজার অভিমুখে অভিযান, সবই কি শান্তি স্থাপনের প্রয়াস ?

জগৎশেঠ। নবাব যদি কলকাতা আক্রমণ না করতেন, তা হলে এসব কিছুই আজ হত না।

সিরাজ। কলকাতার দুর্গকে তারা যদি দুর্ভেদ্য করে তুলতে না চাইত, তা হলে আমি কেও কলকাতা আক্রমণ করতে হত না। বাংলাদেশ অরাজক ছিল না। কোম্পানীর দুর্গ প্রতিষ্ঠার কি প্রয়োজন ছিল বলতে পারেন ?

মীরজাফর। আপনি আমাদের কি করতে বলেন জাঁহাপনা!

সিরাজ। সবার আগে বলি—বাংলার মান, বাংলার মর্যাদা, বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াসে আপনারা আপনাদের শক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে সর্বরকমে আমাকে সাহায্য করুন। আপনাদের সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে যদি এই বিপদ থেকে আমরা পরিত্রাণ পাই, তাহলে একদিন আপনারা আমার বিচারে বসবেন। সেদিন যে দণ্ড আপনারা দেবেন আমি মাথা পেতে নোব। আমাকে অযোগ্য মনে করে আর কাউকে যদি এই সিংহাসনে বসাতে চান, আমি হৃষ্টমনে সিংহাসন ছেড়ে দোব।

(সকলে নীরব রহিলেন)

জাফর আলি খাঁ, আপনি শুধু সিপাহসালার নন, আপনি আমার পরম আত্মীয়। বিপদে আপন-জন জেনে বুকে ভরসা নিয়ে যার কাছে দাঁড়ানো যায়, সেই না আত্মীয়। লোভে পড়ে, অথবা মোহের বশে, মানুষ অনেক সময় অনেক অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু কর্তব্যের আহ্বানে লোভ মোহ জয় করে যে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে, সেই তো পুরুষ। সে পৌরুষ আপনার আছে, আমি জানি।

রাজা রাজবল্লভ, ভাগ্যবান জগৎশেঠ, শক্তিমান রায়দুর্লভ, বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়—মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা। অপরাধ আমি যা করেছি মিলিত হিন্দু-মুসলমানের কাছেই করেছি—আঘাত যা পেয়েছি তাও হিন্দু-মুসলমানের কাছ থেকেই পেয়েছি। পক্ষপাতিত্বের অপরাধে কেউ আমরা অপরাধী নই। সুতরাং আমি মুসলমান বলে আমার প্রতি আপনারা বিরূপ হবেন না।

বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, তার শ্যামল প্রান্তরে আজ রক্তের আল্পনা, জাতির সৌভাগ্যসূর্য আজ অস্তাচলগামী, শুধু সুপ্ত সন্তান শিয়রে রুদ্যমানা জননী নিশাবসানের অপেক্ষায় প্রহর গণনায় রত। কে তাঁকে আশা দেবে? কে তাঁকে ভরসা দেবে? কে শোনাবে জীবন দিয়েও রোধ করব মরণের অভিযান?

মীরজাফর। জাঁহাপনা, জনাব!

সিরাজ। আপনি! হাঁ, আপনি সিপাহসালার, আপনি তা পারেন।

মীরজাফর। আমি শপথ করছি জাঁহাপনা, আজ থেকে সর্বসময়ে সর্বক্ষেত্রে আপনার সহায়তা করব।

মোহনলাল। আমিও শপথ করছি সিপাহসালারের সকল নির্দেশ মাথা পেতে নেব।

মীরমদন। তাঁর আদেশে হাসিমুখেই মৃত্যুকে বরণ করব।

সিরাজ। আমি আজ ধন্য! আমি ধন্য!

॥ চরিত নাটক ॥

॥ বিদ্যাসাগর ॥

বনফুল

(বনফুলের লেখা বিদ্যাসাগর নাটকের অংশবিশেষ। চরিত্র : বিদ্যাসাগর ও মার্শাল। বিদ্যাসাগরের নমনীয় কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে দৃঢ়তাব্যঞ্জক হয়ে উঠবে। মার্শাল সাহেব বাংলা শিখেছেন, তবে শুদ্ধ কেঅবী বাংলা বলেন। এই ভঙ্গিমা মার্শালের অভিনেতা যেন মনে রাখে।)

মার্শাল। নমস্কার, আসুন পণ্ডিত।

বিদ্যাসাগর। আমি আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

মার্শাল। কি, বলুন?

বিদ্যাসাগর। ছুটি চাই। আমার ভাইয়ের বিয়ে, মা বাড়ীতে যেতে লিখেছেন।

মার্শাল। ছুটি? কত দিনের?

বিদ্যাসাগর। অন্ততঃ তিন চার দিনের।

মার্শাল। তাহা তো এখন অসম্ভব, কলেজের কাজকর্ম চলিবে কিরূপে?

বিদ্যাসাগর। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। বিয়ে ছাড়া নিজেরও একটু দরকার আছে বাবা-মায়ের কাছে।

মার্শাল। খুব জরুরি?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, জরুরি। তাঁদের জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত আমি কাজে হাত দিতে পারছি না।

মার্শাল। [বিস্মিত হইয়া] আপনি কি এখনও সকল কার্য তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে করেন?

বিদ্যাসাগর। সকল কার্য করি না। কিন্তু এ কাজটিতে হাত দেবার আগে আমি তাঁদের পরামর্শ নিতে চাই।

মার্শাল। কি এমন কাজ? ডাকযোগেই তো আপনি তাঁহাদের মতামত পাইতে পারেন।

বিদ্যাসাগর। আমি এর জন্যই ছুটি চাইছি না। আমার ভাইয়ের বিয়ে, সেই জন্যই ছুটি চাই।

মার্শাল। আমি খুবই দুঃখিত, ছুটি দেওয়া এখন চলিবে না, কাজের বড়ই ক্ষতি হইবে।

বিদ্যাসাগর। ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল। উঠি তা হ'লে।

মার্শাল। আচ্ছা, আমি খুবই দুঃখিত, পণ্ডিত।

(বিদ্যাসাগর চলিয়া গেলেন, মার্শাল সাহেব অফিসের কাজকর্ম করিতে লাগিলেন। সহসা বিদ্যাসাগর আবার প্রবেশ করিলেন।)

বিদ্যাসাগর। আমি ভেবে দেখলাম, আমাকে যেতেই হবে।

মার্শাল। ছুটি না দিলেও যাবেন?

বিদ্যাসাগর। হাঁ, চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাব।

মার্শাল। কি মুশকিল, তাহা হইলে তো ছুটি দিতে হয়। [হাসিয়া] কলেজের কাজ অপেক্ষা বিবাহের নিমন্ত্রণটাই আপনার নিকট বড় হইল!

বিদ্যাসাগর। নিমন্ত্রণ বড় নয়, মা ডেকেছেন সেইটেই বড়। যে সন্তান মায়ের আদেশ পালন না করতে পারে, সে নরাধম।

॥ কাব্যনাট্য ॥

বিসর্জন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(এটি 'বিসর্জন' নাটকের অংশবিশেষ। রবীন্দ্রনাথ রচিত এই নাটকটির মূল কথা— প্রেমের দ্বারাই বিশ্বমাতার পূজা হয়, হিংসার দ্বারা নয়। এই নাট্যাংশটিতে চরিত্র মূলতঃ দুটি : রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্য। রঘুপতি পুরোহিত ; গোবিন্দমাণিক্য রাজা। রঘুপতির প্রভুত্বের সঙ্গে গোবিন্দের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব এখানে লক্ষ্য করা যায়। গোবিন্দমাণিক্য মন্দিরে পশুবলি নিষিদ্ধ করতে চান ; তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস দেবী রক্তপিপাসু নন। কিন্তু রঘুপতি শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে এই আদেশকে অবৈধ বলেন।

যারা উপরিউক্ত দুটি চরিত্র আবৃত্তি করবে, তাদের চরিত্র দুটির মূল বৈশিষ্ট্যকে ধরতে হবে। গোবিন্দমাণিক্যের কণ্ঠস্বরে একদিকে থাকবে বিনয় অন্য দিকে থাকবে দৃঢ়তা। পক্ষান্তরে রঘুপতির বাগ্‌ভঙ্গীতে একদিকে ব্যঙ্গ, অন্যদিকে তীব্র ক্রোধ ফুটে ওঠা চাই।)

রাজসভা

রাজা, রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ

সভাসদ্‌গণ উঠিয়া

সকলে। জয় হোক মহারাজ !

রঘুপতি। রাজার ভাণ্ডারে
এসেছি বলির পশু সংগ্রহ করিতে।

গোবিন্দ। মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে
হইল নিষেধ।

নয়নরায়। বলি নিষেধ !

মন্ত্রী। নিষেধ !

নক্ষত্ররায়। তাই তো, বলি নিষেধ !

রঘুপতি। এ কি স্বপ্নে শুনি ?

গোবিন্দ। স্বপ্ন নহে প্রভু। এতদিন স্বপ্নে ছিনু,
আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তি ধরে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন,
জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

রঘুপতি। এতদিন
সহিল কী করে? সহস্র বৎসর ধরে
রক্ত করেছেন পান, আজি এ অরুচি!

গোবিন্দ। করেন নি পান। মুখ ফিরাতেন দেবী
করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন।

রঘুপতি। মহারাজ, কি করিছ ভাল করে ভেবে
দেখো। শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।

গোবিন্দ। সকল শাস্ত্রের বড়ো দেবীর আদেশ।

রঘুপতি। একে ভ্রান্ত, তা হে অহংকার! অজ্ঞ নর,
তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই?

নক্ষত্ররায়। তাই তো, কী বলো মন্ত্রী,
এ বড়ো আশ্চর্য ঠাকুর শোনেন নাই?

গোবিন্দ। দেবী-আজ্ঞা নিত্যকাল ধ্বনিছে জগতে।
সেই তো বধিরতম যে জন সে বাণী
শুনেও শুনে না।

রঘুপতি। পাষণ্ড, নাস্তিক তুমি!

গোবিন্দ। ঠাকুর, সময় নষ্ট হয়। যাও এবে
মন্দিরের কাজে। প্রচার করিয়া দিয়ো
পথে যেতে যেতে, আমার ত্রিপুররাজ্যে
যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর
পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসনদণ্ড।

রঘুপতি। এই কি হইল স্থির?

গোবিন্দ। স্থির এই।

রঘুপতি। (উঠিয়া) তবে
উচ্ছন্ন! উচ্ছন্ন যাও!

॥ প্রহসনধর্মী নাটক ॥

ছাত্রের পরীক্ষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নাটিকাটির নাম ছাত্রের পরীক্ষা—নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ। হাস্যকৌতুক নামক গ্রন্থের প্রথম নাটিকা এটি। দৈহিক আঘাত করে ছাত্রকে যে কিছু শিক্ষা দেওয়া যায় না হাস্য-কৌতুকের মাধ্যমে এখানে তাই ব্যক্ত হয়েছে। এখানে চরিত্র তিনটি : অভিভাবক, কালাচাঁদ এবং মধুসূদন। অভিভাবক ধীরস্থির ভঙ্গীতে স্পষ্ট উচ্চারণ করে সংলাপ বলবে। মধুসূদন দুরন্ত কিন্তু বুদ্ধিমান ছাত্র। মনে রাখতে হবে মধুসূদনের প্রতিটি উক্তিই হাস্যোদ্দীপক। বোকা বোকা ভঙ্গীতে সে সংলাপ বলবে। কালাচাঁদ মধুসূদনের গৃহ-শিক্ষক। তিনি সেই জাতীয় মাস্টার যাঁরা বেতকেই শিক্ষাদানের উপায় মনে করেন। কালাচাঁদের চরিত্র-রূপায়ণ যে করবে, সে নাটিকার প্রথমাংশে যখন অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলবে তখন বেশ সন্তুষ্টির ভাব দেখাবে।- কিন্তু মধুসূদনের 'উত্তর' শোনবার পরেই তার কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে ক্রুদ্ধ এবং অস্থির হয়ে উঠবে।]

শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ মাস্টার পড়াইতেছেন ছাত্র শ্রীমধুসূদন

অভিভাবকের প্রবেশ

অভিভাবক। মধুসূদন পড়াশুনা কেমন করছে কালাচাঁদবাবু ?

কালাচাঁদ। আজ্ঞে, মধুসূদন অত্যন্ত দুষ্ট বটে, কিন্তু পড়াশুনোয় খুব মজবুত। কখনো একবার বৈ দুবার বলে দিতে হয় না। যেটি আমি একবার পড়িয়ে দিয়েছি সেটি কখনো ভোলে না।

অভিভাবক। বটে ? তা, আমি আজ একবার পরীক্ষা করে দেখব।

কালাচাঁদ। তা, দেখুন না।

মধুসূদন। (স্বগত) কাল মাস্টারমশায় এমন মার মেরেছেন যে, আজও পিঠ চচ্চড় করছে। আজ এর শোধ তুলব। ওঁকে আমি তাড়াব।

অভিভাবক। কেমন রে মোধো পুরোনো পড়া সব মনে আছে তো ?

মধুসূদন। মাস্টারমশায় যা বলে দিয়েছেন তা সব মনে আছে।

অভিভাবক। আচ্ছা উদ্ভিদ কাকে বলে বল্ দেখি ?

মধুসূদন। যা মাটি ফুঁড়ে ওঠে।

অভিভাবক। একটা উদাহরণ দে।

মধুসূদন। কেঁচো।

কালাচাঁদ। (চোখ রাঙাইয়া) অ্যা! কী বললি!

অভিভাবক। বসুন মশায়, এখন কিছু বলবেন না।

(মধুসূদনের প্রতি)

তুমি তো পদ্যপাঠ পড়েছ। কাননে কী ফোটে বলো দেখি।

মধুসূদন। কাঁটা। * *

অভিভাবক। আচ্ছা, সিরাজউদ্দৌলাকে কে কেটেছে ? ইতিহাসে কী বলে ?

মধুসূদন। পোকায়। * * * শুধু সিরাজউদ্দৌলা কেন, সমস্ত ইতিহাসখানাই পোকায় কেটেছে। এই দেখুন।

অভিভাবক। ব্যাকরণ মনে আছে?

মধুসূদন। আছে।

অভিভাবক। 'কর্তা' কী, তার একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও দেখি।

মধুসূদন। আজ্ঞে কর্তা ও পাড়ার জয় মুন্শি।

অভিভাবক। কেন বলো দেখি?

মধুসূদন। তিনি ক্রিয়াকর্ম নিয়ে থাকেন।

অভিভাবক। ষষ্ঠী তৎপুরুষ কাকে বলে?

মধুসূদন। জানি নে।

(কালাচাঁদের বেত্র-দর্শায়ন)

ওটা বিলক্ষণ জানি—ওটা ষষ্ঠী-তৎপুরুষ।

অভিভাবক। অংক শিক্ষা হয়েছে?

মধুসূদন। হয়েছে।

অভিভাবক। আচ্ছা, তোমাকে সাড়ে ছ'টা সন্দেশ দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে যে, পাঁচ মিনিট সন্দেশ খেয়ে যতটা সন্দেশ বাকি থাকবে তোমার ছোট ভাইকে দিতে হবে। একটা সন্দেশ খেতে তোমার দু'মিনিট লাগে। কটা সন্দেশ তুমি তোমার ভাইকে দেবে?

মধুসূদন। একটাও নয়।

কালাচাঁদ। কেমন করে!

মধুসূদন। সবগুলো খেয়ে ফেলব। দিতে পারব না।

অভিভাবক। আচ্ছা একটা বটগাছ যদি প্রত্যহ সিকি ইঞ্চি করে উঁচু হয়, তবে যে বট এ বৈশাখ মাসের পয়লা দশ ইঞ্চি ছিল ফিরে বৈশাখ মাসের পয়লা সে কতটা উঁচু হবে?

মধুসূদন। যদি সে গাছ বেঁকে যায় তাহলে ঠিক বলতে পারি না, যদি বরাবর সিধে ওঠে তাহলে মেপে দেখলেই ঠাহর হবে, আর যদি ইতিমধ্যে শুকিয়ে যায় তাহলে তো কথাই নেই।

কালাচাঁদ। মার না খেলে তোমার বুদ্ধি খোলে না। লক্ষ্মীছাড়া, মেরে তোমার পিঠ লাল করব। তবে তুমি সিধে হবে।

মধুসূদন। আজ্ঞে, মারের চোটে খুব সিধে জিনিসও বেঁকে যায়।

অভিভাবক। কালাচাঁদবাবু, ওটা আপনার ভ্রম। মারপিট করে খুব অল্প কাজই হয়। কথায় আছে গাধাকে পিটলে ঘোড়া হয় না, কিন্তু অনেক সময় ঘোড়াকে পিটলে গাধা হয়ে যায়। অধিকাংশ ছেলে শিখতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মাস্টার শেখাতে পারে না। কিন্তু মার খেয়ে মরে ছেলেটাই। আপনি আপনার বেত নিয়ে প্রস্থান করুন, দিনকতক মধুসূদনের পিঠ জুড়োক, তার পরে আমিই ওকে পড়াব।

মধুসূদন। (স্বগত) আঃ, বাঁচা গেল।

কালাচাঁদ। বাঁচা গেল মশায়। এ ছেলেকে পড়ানো মজুরের কর্ম, কেবলমাত্র ম্যানুয়েল লেবার। ত্রিশ দিন একটা ছেলেকে কুঁপিয়ে আমি পাঁচটি মাত্র টাকা পাই, সেই মেহনতে মাটি কোপাতে পারলে দিনে পুরো টাকাও হয়।

॥ একেই কি বলে সভ্যতা ॥

মধুসূদন দত্ত

[নীচের নাট্যাংশটি মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' নামক ব্যঙ্গাত্মক প্রহসনের প্রথমাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের অংশ বিশেষ। এই দৃশ্যের চরিত্র : (১) কর্তা মহাশয়, (২) কালীবাবু, (৩) নববাবু। কর্তা বৃদ্ধ, ভক্ত বৈষ্ণব। কালী ও নব তৎকালীন আধুনিক যুবক। নব কর্তা মহাশয়ের পুত্র। কর্তার বাচনে বৃদ্ধের উচ্চারণ ভঙ্গী এবং কালী-নব'র বাচনে smart অথচ কৃত্রিম বিনয়ের ভাব থাকা চাই।]

কালী। (প্রণাম)

কর্তা। চিরজীবী হও বাপু। তোমার নাম কি?

কালী। আজ্ঞে আমার নাম শ্রীকালীনাথ দাস ঘোষ।—মহাশয়, আপনি—৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে বোধ করি জানতেন। আমি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র—

কর্তা। কোন্ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ?

কালী। আজ্ঞে, বাঁশবেড়ের—

কর্তা। হাঁ হাঁ হাঁ। তুমি স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, যিনি শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হন।

কালী। আজ্ঞে, হাঁ।

কর্তা। বেঁচে থাক বাপু। বসো। (সকলের উপবেশন) তুমি এখন কি কর, বাপু?

কালী। আজ্ঞে, কলেজে নবকুমার বাবুর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়া হয়েছিল, এক্ষণে কর্ম-কাজের চেষ্টা করা হচ্ছে।

কর্তা। বেশ বাপু। তোমার স্বর্গীয় খুড়া মহাশয় আমার পরম মিত্র ছিলেন। বাবা, আমি তোমার সম্পর্কে জ্যেঠা হই, তা জান?

কালী। আজ্ঞে।

কর্তা। (স্বগত) আহা, ছেলেটি দেখতে শুনতেও যেমন, তেমনি সুশীল। আর না হবেই বা কেন? কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না।

কালী। জ্যেঠা মহাশয়, আজ নবকুমারদাদাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে আজ্ঞা করুন—

কর্তা। কেন বাপু, তোমরা কোথায় যাবে?

কালী। আজ্ঞে আমাদের জ্ঞানতরঙ্গিণী নামে একটা সভা আছে, সেখানে আজ মিটিং হবে।

কর্তা। কি সভা বললে বাপু?

কালী। আজ্ঞে, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা।

কর্তা। সে সভায় কি হয়?

কালী। আজ্ঞে, আমাদের কলেজে থেকে ইংরাজী চর্চা হয়েছিল। তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্য সংস্থাপন করেছি। আমরা শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।

কর্তা। আ বেশ কর। (স্বগত) আহা কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কিনা! তোমাদের শিক্ষক কে বাপু?

কালী। আজ্ঞে, কেনারাম বাচস্পতি মহাশয়, যিনি সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক—

কর্তা। ভাল, বাপু, তোমরা কোন্ সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর বল দেখি?

কালী। (স্বগত) আ-মলো! এতক্ষণের পর দেখছি সাল্লে। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে, শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর—বোপদেবের বিন্দা দূতী।

কর্তা। কি বল্লে, বাপ?

নব। আজ্ঞে, উনি বলছেন শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা আর জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কর্তা। জয়দেব? আহা, হা। কবিকুলতিলক, ভক্তিরসসাগর।

কালী। জেঠা মহাশয়, যদি আজ্ঞে হয় তবে এক্ষণে আমরা বিদায় হই।

কর্তা। কেন, বেলা দেখছি এখনো পাঁচটা বাজে নি, তা তোমরা, বাপু এত সকালে যাবে কেন?

কালী। আজ্ঞে, আমরা সকাল সকাল কর্ম নির্বাহ করবো বলে সকালে যেতে চাই, অধিক রাত্রি জাগলে পাছে বেমো-টেমো হয়, এই ভয়ে সকালে মীট্ করি।

কর্তা। তোমাদের সভাটা কোথায় বাপু?

কালী। আজ্ঞে, সিক্‌দারপাড়ার গলিতে।

কর্তা। আচ্ছা বাপু, তবে এসো গে। দেখো যেন অধিক রাত্রি করো না।

নব ও কালী। আজ্ঞে না।

॥ বৈকুণ্ঠের খাতা ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বৈকুণ্ঠের খাতা রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসাত্মক নাটক। এই নাটকের প্রথম দৃশ্যের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই দৃশ্যে তিনটি চরিত্র: বৈকুণ্ঠ, কেদার এবং ঈশান। বৈকুণ্ঠ নাটকের প্রধান চরিত্র—এই অংশে তাঁর ও কেদারের প্রাধান্য সমান সমান। ঈশান, বৈকুণ্ঠের ভৃত্য। ঈশানের চরিত্রানুযায়ী স্বরপ্রক্ষেপ হবে—সে তার প্রভুকে যে ভালবাসে, তার সংলাপের মধ্য দিয়ে তা ফুটে ওঠা চাই। বৈকুণ্ঠ আত্মভোলা সাহিত্যিক। এই আত্মভোলা ভাবটি বৈকুণ্ঠের অভিনেতাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। কেদার বৈকুণ্ঠের ভাই অবিনাশের সহপাঠী। কেদার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বৈকুণ্ঠের গৃহে এসেছে বোঝা যায়; ভাব অনুযায়ী কেদার সংলাপ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করবে। 'ওর নাম কি' বলা কেদারের একটি মুদ্রাদোষ, এই কথা উচ্চারণের সময় বিশেষ জোর দেওয়া চাই। কেদারের বাচনভঙ্গীতে এমন গুণ থাকা চাই, যার দ্বারা বৈকুণ্ঠ দুর্বল হয়ে পড়বে। ছাত্র-ছাত্রীরা এই নাটকটির পূর্ণাঙ্গ অভিনয় করতে পারে।]

ঈশান। বাবু খাবার এসেছে।

বৈকুণ্ঠ। তাকে একটু বসতে বলো।

কেদার। তাহলে আমি উঠি। ওর নাম কী, স্বার্থপর হয়ে আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি—

বৈকুণ্ঠ। কেন, আপনি উঠছেন কেন?

ঈশান। নাঃ, ওর আর উঠে কাজ নেই! সারারাত ধরে তোমার ঐ লেখা শুনুন (কেদারের প্রতি) যাও বাবু, তুমি ঘরে যাও। আমার বাবুকে আর খেপিয়ে তুলো না।

কেদার। ইনি আপনার কে হন?

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন আমার চাকর।

কেদার। ওঃ, ওর নাম কী, এর কথাগুলি বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট।

বৈকুণ্ঠ। হা হা হা হা। ঠিক বলেছেন। তা, কিছু মনে করবেন না—অনেকদিন থেকে আছে—আমাকে মানে টানে না।

কেদার। ওর নাম কী, অল্পক্ষণের আলাপ যদিচ তবু আমাকেও বড় মানে না দেখলুম। কিন্তু ওর কথাটা আপনি কানে তোলেন নি—খাবার এসেছে।

বৈকুণ্ঠ। তা হোক, রাত হয় নি। এই অধ্যায়টা শেষ করে ফেলি।

কেদার। বৈকুণ্ঠবাবু, খাবার আপনার ঘরে আসে এবং এসে বসেও থাকে—ওর নাম কী, আমাদের ঘরে তাঁর ব্যবহার অন্য রকমের। দেখুন যখন ছেলেবেলায় কালেজে পড়তুম, তখন ওর নাম কী, খুব উচ্চ মাচার উপরেই আশালতা চড়িয়েছিলুম; তাতে বড়ো বড়ো লাউয়ের মতো দেড় হাত দু' হাত ফলও ঝুলে পড়েছিলো, কিন্তু কী বলে, গোড়ায় জল পেলে না, ভিতরে রস প্রবেশ করলে না, ওর নাম কী সব ফাঁপা হয়ে রইল। এখন কোথায় পয়সা কোথায় অন্ন এই করেই মরছি। ভিতরে সার যা ছিল সব চুপসে, ওর নাম কী শুকিয়ে গেল।

বৈকুণ্ঠ। আহা হা হা! এত বড় দুঃখের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। অথচ সর্বদাই প্রফুল্ল আছেন—আপনি মহানুভব ব্যক্তি। দেখুন আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যদি আপনার কোন সাহায্য করতে পারি খুলে বলবেন—কিছুমাত্র সংকোচ—

কেদার। মাপ করবেন বৈকুণ্ঠবাবু, ওর নাম কী, আমাকে টাকার প্রত্যাশী মনে করবেন না—আজ যে আনন্দ দিয়েছেন, এর তুলনায় ওর নাম কী টাকার তোড়া—

॥ রূপক ও সাংকেতিক নাটক ॥

॥ ডাকঘর ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ডাকঘর রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটক। এই নাট্যাংশটিতে দুটি চরিত্র—অমল ও দইওয়ালা। অমল অসুস্থ; সে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্ধ, কারণ কবিরাজমশাইর বারণ। কিন্তু তার মন প্রকৃতির আহ্বানে, সুদূরের আকর্ষণে চিরচঞ্চল। তাই ধরণীর বুকে অবাধে যারা বিচরণ করে, তাদের মতো জীবনই তার আরাধ্য। আর তার অকৃত্রিম ভালবাসার অনুভূতিতে তার না দেখা প্রকৃতির রূপচিত্রও সহজে ধরা পড়ে।

অমল উদাসী ভাবুক ছেলে। তার সংলাপগুলি পাঠ করবার সময় এই উদাস করা ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে হবে। কণ্ঠস্বরকে নীচু পর্দায় রেখে ধীরে ধীরে, কিছুটা টেনে টেনে একটু সুর করে পাঠ করতে হবে। বিশেষতঃ 'দই, দই, দই—ভালো দই' সংলাপটি উচ্চারণের সময় এই কথা মনে রাখতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে '—' চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দইওয়ালা সহজ সরল মানুষ। কিন্তু অমলের কথাবার্তার অন্তর্নিহিত সরলতা ও পবিত্রতা তাকে বিস্মিত, সহানুভূতিশীল এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিমূঢ় করে তোলে। দইওয়ালার সংলাপগুলি বলবার সময় এই কথাগুলি মনে রাখতে হবে। দইওয়ালার প্রথম সংলাপটি 'দই—দই—ভালো দই' উচ্চারণের সময় কণ্ঠের সুরটিকে শব্দগুলোর মধ্যে দিয়ে খেলিয়ে তুলতে হবে।]

দইওআলা। দই—দই—ভালো দই।

অমল। দইওআলা, দইওআলা ও দইওআলা!

দইওআলা। ডাকছ কেন, দই কিনবে?

অমল। কেমন করে কিনব। আমার তো পয়সা নেই।

দইওআলা। কেমন ছেলে তুমি! কিনবে না তো আমার বেলা বইয়ে দাও কেন?

অমল। আমি যদি তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারতুম তো যেতুম।

দইওআলা। আমার সঙ্গে?

অমল। হাঁ, তুমি যে কত দূর থেকে হাঁকতে হাঁকতে চলে যাচ্ছ শুনে আমার মন কেমন করছে।

দইওআলা। (দধির বাঁক নামাইয়া) বাবা, তুমি এখানে বসে কী করছ?

অমল। কবিরাজ আমাকে বেরোতে বারণ করেছে, তাই আমি সারাদিন এইখানেই বসে থাকি।

দইওআলা। আহা, বাছা তোমার কী হয়েছে?

অমল। আমি জানি নে। আমি তো কিছু পড়ি নি, তাই আমি জানি নে আমার কী হয়েছে। দইওআলা, তুমি কোথা থেকে আসছ?

দইওআলা। আমাদের গ্রাম থেকে আসছি।

অমল। তোমাদের গ্রাম? অনে—ক দূরে তোমাদের গ্রাম?

দইওআলা। আমাদের গ্রাম সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায়। শামলী নদীর ধারে।

অমল। পাঁচমুড়া পাহাড়—শামলী নদী—কী জানি, হয়তো তোমাদের গ্রাম দেখেছি—কবে সে আমার মনে পড়ে না।

দইওআলা। তুমি দেখেছ? পাহাড়তলায় কোনোদিন গিয়েছিলে নাকি?

অমল। না, কোনোদিন যাই নি। কিন্তু আমার মনে হয় যেন আমি দেখেছি। অনেক—পুরানো কালের খুব বড় বড় গাছের তলায় তলায় তোমাদের গ্রাম—একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে না?

দইওআলা। ঠিক বলেছ বাবা।

অমল। সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গোরু চরে বেড়াচ্ছে।

দইওআলা। কী আশ্চর্য; ঠিক বলছ। আমাদের গ্রামে গোরু চরে বই কি, খুব চরে।

অমল। মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসী করে নিয়ে যায়—তাদের লাল শাড়ি পরা।

দইওআলা। বা! বা! ঠিক কথা। আমাদের সব গয়লাপাড়ার মেয়েরা নদী থেকে জল তুলে নিয়ে যায়ই। তবে কিনা তারা সবাই যে লাল শাড়ি পরে তা নয়-কিন্তু বাবা, তুমি নিশ্চয় কোনদিন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে।

অমল। সত্যি বলছি দইওআলা, আমি একদিনও যাই নি। কবিরাজ যেদিন আমাকে বাইরে যেতে বলবে সেদিন তুমি নিয়ে যাবে তোমাদের গ্রামে?

দইওআলা। নিয়ে যাব বৈকি বাবা, খুব নিয়ে যাব।

অমল। আমাকে তোমার মতো ওই রকম দই বেচতে শিখিয়ে দিয়ো। ওই রকম বাঁক কাঁধে নিয়ে ওই রকম খুব দূরের রাস্তা দিয়ে।

দইওআলা। মরে যাই। দই বেচতে যাবে কেন বাবা। এত এত পুঁথি পড়ে তুমি পণ্ডিত হয়ে উঠবে।

অমল। না, না, কক্খনো পণ্ডিত হব না। আমি তোমাদের রাঙা রাস্তার ধারে তোমাদের বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেচে বেড়াব। কী রকম করে তুমি বল, দই, দই, দই—ভালো দই। আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও।

দইওআলা। হায় পোড়াকপাল! এ সুরও কি শেখাবার সুর!

অমল। না, না, ও আমার খুব শুনতে ভাল লাগে। আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়—তেমনি ওই রাস্তার মোড় থেকে ওই গাছের সারের মধ্যে দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল, আমার মনে হচ্ছে—কি জানি কি মনে হচ্ছিল।

দইওআলা। বাবা, এক ভাঁড় দই তুমি খাও।

অমল। আমার তো পয়সা নেই।

দইওআলা। না না না না—পয়সার কথা বোলো না। তুমি আমার দই একটু খেলে আমি কত খুশি হব।

অমল। তোমার অনেক দেরী হয়ে গেল?

দইওআলা। কিছু দেরি হয় নি বাবা, আমার কোন লোকসান হয় নি। দই বেচতে যে কত সুখ সে তোমার কাছে শিখে নিলুম।

অমল। (সুর করিয়া) দই, দই, দই, ভালো দই। সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শ্যামলী নদীর ধারে গয়লাদের বাড়ির দই। তারা ভোরের বেলায় গাছের তলায় গোরু দাঁড় করিয়ে দুধ দোয়, সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা দই পাতে, সেই দই, দই, দই-ই, ভালো দই। এই যে রাস্তায় প্রহরী পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। প্রহরী, প্রহরী, একটিবার শুনে যাও না প্রহরী!

॥ সামাজিক নাটক ॥

সামাজিক নাটক হিসেবে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এই দুটি নাটক থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

॥ নীলদর্পণ ॥

দীনবন্ধু মিত্র

উড। এ বজ্জাতের হাতে দড়ি পড়িয়াছে কেন ?

গোপীনাথ। ধর্মাবতার, এই সাধুচরণ একজন মাতব্বর রাইয়ত, কিন্তু নবীন বোসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাধু। ধর্মাবতার, নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, করিতেছি না, এবং করিবার ক্ষমতাও নাই। ইচ্ছায় করি অনিচ্ছায় করি নীল করিয়াছি, এবারেও করিতে প্রস্তুত আছি। তবে সকল বিষয়ের সম্ভব অসম্ভব আছে, আদ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট আঙ্গুল বারুদ পুরিলে কাজেই ফাটে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা, দেড়খানি লাঙ্গল রাখি. আবাদ হদ্দ ২০ বিঘা, তার মধ্যে যদি ৯ বিঘা নীলে গ্রাস করে তবে কাযেই চটতে হয়। তা আমার চটায় আমিই মরবো, হুজুরের কি ?...

উড। তুমি শালা বড় বজ্জাত আছে। তোমার যদি ২০ বিঘার ৯ বিঘা নীল করিতে বলেছে তবে তুমি কেন আর ৯ বিঘা ধান কর না ?

গোপী। ধর্মাবতার যে লোকসান জমা পড়ে আছে, তাহা হইতে ৯ বিঘা কেন ২০ বিঘা পাট্টা করিয়া দিতে পারি।

সাধু। (স্বগত) হা ভগবান। শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। (প্রকাশ্যে) হুজুর, যে ৯ বিঘা নীলের জন্যে চিহ্নিত হইয়াছে তাহা যদি দুটির লাঙ্গল, গোরু ও মাইন্দার দিয়া আবাদ হয়, তবে আমি আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্য লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে হয়, তার চারগুণ কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে, সুতরাং যদি ও ৯ বিঘা আমার চাষ দিতে হয়, তবে বাকী ১১ বিঘাই পড়ে থাকবে তা আবার নূতন জমি আবাদ করবো।

উড। শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাস দিতে হবে আমি, শালা বড় বজ্জাত (জুতার গুঁতা প্রহার) শ্যাম চাঁদকা সাৎ মুলাকাৎ হোনেসে হারামজাদকি সব ছোড় যাতা।

সাধু। হুজুর, মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র, আমরা—

রাইচরণ। ও দাদা, তুই চুপ দে, যা ন্যাকে নিতি চাচ্চে ন্যাকে দে. ফিকদের গোটে নাড়ি ছিঁড়ে পড়লো, সারা দিন ডে গ্যাল, নাতিও পালাম না খাতিও পালাম না।

আমিন। কই শালা, ফৌজদারী কর্লি-নে!

রাইচরণ। মলাম, মাগো! মাগো!

উড। ব্লাডি-নিগার, মারো।

॥ প্রফুল্ল ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

যাদব। ও কাকাবাবু, একটু জল দাও। আমায় আগুন জ্বলছে গো—আগুন জ্বলছে!

রমেশ। জল দিচ্ছি. এই ওষুধ খা।

যাদব। না গো জ্বলে যায়। আমায় একটু জল দাও।

জগমণি। কোন্‌টা দেব?

রমেশ। টার্‌টার এমিটিক (Tartar Emetic) দাও, ডাক্তার আসছে, বমি হবে—দেখবে এখন।

জগমণি। না না পেটে কিছু নেই. উঠবে কি? সেইটেই উঠে যাবে. ডাক্তার বল্‌বে—খেতে দাও'; এইটি দাও, খুব ছট ফট্ করবে দেখবে এখন!

যাদব। ওগো না গো. ও কাকাবাবু. আমি সন্ধ্যেবেলা মরবো এখন আর দুঃখ দিও না। আমার সব শরীরে ছুঁচ ফুটছে। কাকাবাবু. তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু!

রমেশ। ডাক্তার আসছে. ডাক্তার আসছে!

ডাক্তার। গুড মর্নিং (Good morning)! কেমন আছে?

জগমণি। আহা বাছা আজ নির্জীব হয়ে পড়েছে।

কাঙ্গালী। ডাক্তারবাবু বাঁচবে তো? বাবুর ছেলেপুলে নেই, কেউ নেই, ঐ ভাইপোটিই সর্বস্ব।

যাদব। ও ডাক্তারবাবু. আমার কিছু হয় নি, আমায় একটু জল খেতে দিলেই বাঁচবো।

ডাক্তার। দাও দাও, জল দাও।

জগমণি। ও আমার পোড়ার দশা—জল কি তলায়!

যাদব। ওগো আমায় একটু জল না দাও, একটু দুধ খেতে দাও, আমি কিছু খাই নি।

রমেশ। ডাক্তার সাহেব, ডিলিরিয়াম সেট ইন (Delirium set in) কল্ল।

ডাক্তার। এত দুধ—সুরুয়া রয়েছে, তোমায় খেতে দেয় না?

যাদব। না, ডাক্তারবাবু, আমায় খেতে দেয় না।

ডাক্তার। ছুট।

জগমণি। ডাক্তার বাবু, একটা উপায় কর, বাছার জলটুকু তলাচ্ছে না।

রমেশ। ডক্টর, ইয়োর ফি (Doctor, your fee)

ডাক্তার। একটা ব্লিস্টার (Blister) দাও।

যাদব। না গো না, আর বেলেস্তারা দিও না গো, আমার পেটের খানা এখনও জ্বলছে, এই দেখ—যা হয়েছে। ও মাগো একবার দেখে যাও গো; মা তুমি কোথায় আছ গো! জ্বলে গেলুম গো—জ্বলে গেলুম—মা গো একবার দেখে যাও!

॥ উত্তর দাও ॥

১। নাটক কাকে বলে? বাংলা নাটককে সাধারণভাবে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? বিভাগগুলির নাম কর।

[উঃ পৃঃ ৯১, ৯৩]

২। নাটকের আবৃত্তি বা পাঠের সময়ে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত ?
[উঃ পৃঃ ৯২, ৯৩]

৩। সকল শ্রেণীর নাটকেই সংলাপ উচ্চারণের ভঙ্গী কি এক জাতীয় হবে ? এ বিষয়ে তোমার ধারণা ব্যক্ত কর।
[উঃ পৃঃ ৯৩]

৪। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের যে কোন একটি দৃশ্য আবৃত্তি কর।
[উঃ পৃঃ ১০৩-১০৪]

৫। মধুসূদনের যে কোন একটি নাটকের নাম বল। ঐ নাটকটি থেকে অংশবিশেষ পাঠ করে শোনাও তো।
[উঃ পৃঃ ১০৭-১০৮]

৬। নীচের নাটকগুলির অংশবিশেষ আবৃত্তি বা পাঠ কর :

(ক) রবীন্দ্রনাথের "ছাত্রের পরীক্ষা" (খ) মধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতা" (গ) দ্বিজেন্দ্রলালের "রাণা প্রতাপ" (ঘ) বনফুলের "বিদ্যাসাগর" (ঙ) ক্ষীরোদপ্রসাদের "ভীষ্ম"।

[উঃ (ক) ১০৫, (খ) ১০৭, (গ) ৯৬, (ঘ) ১০১, (ঙ) ৯৪ পৃষ্ঠার নাটকের উদাহরণগুলি দ্রষ্টব্য]

৭। একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটকের নাম কর। ঐ নাটকের মুখ্য চরিত্রের বিখ্যাত সংলাপের কিছু অংশ আবৃত্তি কর।
[উঃ পৃঃ ১০০-১০১]

৮। পৌরাণিক নাটক কাকে বলে ? একটি পৌরাণিক নাটকের নাম কর। ঐ নাটক থেকে কিছু অংশ আবৃত্তি করে শোনাও।
[উঃ পৃঃ ৯৪-৯৫]

৯। যে কোনও একটি সামাজিক নাটকের নাম কর। ঐ নাটক থেকে কিছু অংশ পাঠ কর।
[উঃ পৃঃ ১১৩]

১০। কোনও একটি বিখ্যাত চরিত নাটকের নাম কর। ঐ নাটক থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনাও
[উঃ পৃষ্ঠা ১০১-১০২]

১১। যে কোনও একটি প্রহসনের নাম কর। ঐ প্রহসন থেকে কিছু অংশ পাঠ কর।
[উঃ পৃঃ ১০৭-১০৮]

১২। যে কোনও একটি বিখ্যাত সাংকেতিক নাটকের নাম কর। ঐ নাটকটি কার লেখা ? বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ সাংকেতিক নাটক রচয়িতা কে ?
[উঃ পৃঃ ১০৯-১১১]

১৩। অমল ও দইওয়ালার সংলাপের কিছু অংশ আবৃত্তি করে শোনাও।
[উঃ পৃঃ ১১০-১১১]

চতুর্থ অধ্যায়

॥ বিতর্ক ॥

বিতর্ক কাকে বলে :

বিতর্ক কথাটাকে ইংরেজীতে 'ডিবেটিং (Debating) বলা হয়। বাংলায় বিতর্ক শব্দের আভিধানিক অর্থ হ'ল 'বাদানুবাদ,' 'বিচার', 'আলোচনা', 'অনুষ্ঠান' এবং 'সন্দেহ'। কিন্তু এখানে 'বিতর্ক' কথাটার অর্থ হবে বিশেষধরনের তর্ক অর্থাৎ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির বা পক্ষের কোনো একটি বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসবার জন্য বাদ-প্রতিবাদ।

বিতর্কসভার নিয়ম কানুন ও বিতর্ক সভার আয়োজন :

যে দুটি পক্ষের কথা বলা হলো তার একটি পক্ষকে বলা হয় **বাদী পক্ষ** এবং অপর পক্ষকে বলা হয় **বিবাদী পক্ষ** বা **প্রতিবাদী পক্ষ** এই উভয় পক্ষের মধ্যে বিতর্ক চলে। যে সভায় কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার জন্য বাদী এবং প্রতিবাদী পক্ষের মধ্যে বিতর্ক চলে সেই সভাকে বলা হয় **বিতর্কসভা**।

প্রত্যেক বিতর্ক সভায় একজন **অধ্যক্ষ (Speaker)** থাকেন। তিনিই সভার কাজ পরিচালনা করেন। সভার কাজ শুরু হবার আগে তিনি সভায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের কাছে বিতর্কের বিষয় প্রকাশ করেন। এরপর তিনি অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের দুই দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক দলের জন্যে একজন **নেতা** বা মুখপাত্র ঠিক করতে বলেন। বক্তব্যের পক্ষ-সমর্থনকারী দলের নেতাকে **সভার নেতা** বলা হয়।

সভায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন কে কে প্রস্তাবিত বিষয়ের পক্ষে এবং কে কে বিপক্ষে বলবেন। এইভাবে দুটি পক্ষ স্থির হয়ে যাবার পর প্রত্যেক পক্ষ তার **নেতা নির্বাচন** করেন এবং অধ্যক্ষের সঙ্গে নেতাদের পরিচয় করিয়ে দেন।

অধ্যক্ষ তখন প্রথমে বাদীপক্ষের নেতাকে তাঁর বক্তব্য রাখতে বলেন। এই সময় তিনি নেতাদের এবং অন্যান্য বক্তাদের বক্তব্যের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেন। কার পরে কে বলবেন সে কথাও তিনি সদস্যদের জানিয়ে দেন। বাদী পক্ষের নেতার বক্তৃতা শেষ হলে বিবাদী পক্ষের নেতাকে বক্তৃতা করতে বলা হয়। বাদী ও বিবাদী পক্ষের দুইজন নেতা অন্যান্য বক্তা অপেক্ষা বক্তব্য রাখার সময় বেশী পান। সাধারণ বক্তারা ৫ মিনিট করে সময় পেলে, এঁরা হয়ত ৮ মিনিট করে সময় পাবেন। দুই নেতার বক্তৃতা হয়ে গেলে বাদী পক্ষের একজন বক্তা বক্তৃতা করেন, তার উত্তরে বিবাদী পক্ষের একজন বক্তা বক্তব্য রাখবেন। তারপর বাদী পক্ষের সদস্যরা এবং বিবাদী পক্ষের সদস্যরা একের পর এক তাঁদের বক্তব্য রাখতে থাকেন। কার পর কে বক্তৃতা করবেন সেটাও সভাপতি স্থির করে দিতে পারেন কিংবা সে ভার অংশগ্রহণকারীদের ওপরও ছেড়ে দিতে পারেন। বাদী পক্ষের নেতার একটি বিশেষ সুযোগ থাকে; তিনি সকল বক্তার বক্তব্যের পরে উত্তর দেবার সুযোগ পান।

উভয় পক্ষের বক্তাদের বক্তব্য শেষ হবার পর সভাপতি তাঁর ভাষণ দেবেন। সভাপতির ভাষণে তিনি উভয় পক্ষের যুক্তিগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করে কোন পক্ষ জয়ী হয়েছে তা ঘোষণা করবেন। সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার সময় উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং যুক্তি যথাযথ ভাবে বিচার বিবেচনা করেই সভাপতি তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন। অথবা নিজে কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের ভোটাভুটির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন।

বিদ্যালয়ে বিতর্ক সভার উপকারিতা :

(১) বিতর্ক সভার আয়োজন করতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে কোন সভা সংগঠিত করতে হয়, তা শেখে। ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে তাদের অনেক সভাসমিতি সংগঠিত করতে হবে। তখন ঐ অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে।

(২) বিতর্ক সভায় বক্তব্য উপস্থিত করতে গিয়ে অংশগ্রহণকারীরা কিভাবে বক্তব্য গুছিয়ে বলতে হয় তা শেখে। এর ফলে দৈনন্দিন জীবনে ঘরোয়া কথা বলার সময়ও তারা গুছিয়ে কথা বলতে পারে।

(৩) অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে চিন্তা করতে বাধ্য হয় ; এইভাবে চিন্তা করতে গিয়ে তাদের চিন্তাধারা সুশৃঙ্খল হয়।

(৪ যুক্তি ছাড়া মূল্যবান কথা বললেও কেউ শুনতে চায় না ; সেজন্য ছাত্রছাত্রীরা বিতর্ক সভায় যুক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত জীবনেও যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে।

(৫) যুক্তিসম্মত বক্তব্যও আকর্ষণীয় করতে হলে সংযত ও ভদ্র ভাবে বক্তব্য পেশ করতে হয়। এইভাবে বক্তব্য বলতে বলতে এবং তার সুফল দেখে দেখে ছাত্ররা সংযতবাক্ ও ভদ্র হয়।

বিতর্কে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের কর্তব্য :

বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণকারীদের বিতর্কে সফলতা লাভ করবার জন্য কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে মনোযোগ এবং সচেতনতা দরকার। যেমন :

(১) প্রত্যেক সদস্যের জন্য যে সময়-সীমা নির্দেশ করে দেওয়া হবে, কোনক্রমেই তা লঙ্ঘন করা চলবে না।

(২) বক্তা সর্বদাই অধ্যক্ষকে সম্ভাষণ করে এবং সে প্রস্তাবের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে তা জানিয়ে তবে বক্তব্য রাখবে। বক্তারা কখনও শ্রোতাদের সম্বোধন করে বক্তব্য বলবে না।

(৩) অধ্যক্ষের নির্দেশ অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

(৪). বক্তার আলোচনা যেন সর্বদাই প্রস্তাবিত বিষয়টি ঘিরে কেন্দ্রীভূত থাকে ; এক্ষেত্রে পারম্পর্যের অভাব বা প্রসঙ্গচ্যুতি মারাত্মক ত্রুটি।

(৫) বিতর্ক ভাষণ বা আলোচনা নয় ; সুতরাং মুখস্থের ভঙ্গী বিতর্কের পক্ষে অচল। বাচনভঙ্গি এবং প্রকাশ-সুষমা বিতর্কের লক্ষণীয় বস্তু। এই দুটি বস্তুর ওপর বিতর্কের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল—একথা অংশগ্রহণকারীদের মনে রাখতে হবে।

(৬) বক্তাকে কেবলমাত্র নিজের পক্ষ সমর্থন করে কথার মালা সাজালে চলবে না, অপরের যুক্তি খণ্ডন করবার জন্যও তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এইজন্য একদিকে যুক্তিপূর্ণ মানসিকতা ও বিচারবুদ্ধির, অন্যদিকে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অর্থাৎ উপস্থিত

বুদ্ধি এবং সাহসের প্রয়োজন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে আক্রমণ যেন কখনও ব্যক্তিগত হয়ে না পড়ে।

(৭) নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বক্তব্য শেষ করা বরং ভালো কিন্তু একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে সময় অতিবাহন বিতর্কের অন্যতম ত্রুটি।

(৮) বিতর্কের প্রারম্ভ এবং সমাপ্তি যাতে আকর্ষণীয় হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পরীক্ষার সময়ের বিতর্ক সভা :

স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষার সময়ের বিতর্ক-সভা বিদ্যালয়ের হলঘরে অথবা কোনো নির্দিষ্ট কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। ঐ বিতর্ক সভায় উপস্থিত পরীক্ষকের যে কেউ অধ্যক্ষের আসন গ্রহণ করতে পারেন। তবে মনে হয় পর্ষৎকর্তৃক প্রেরিত ভদ্রলোকই অধ্যক্ষ হবেন।

এরপর উপরিউক্ত নিয়ম অনুসারে অধ্যক্ষ একটি বিষয় প্রস্তাব করে, পরীক্ষার্থীদের উপরিউক্ত নিয়ম মত দুই দলে বিভক্ত হয়ে দলের নেতা নির্বাচন করতে বলবেন। দলের নেতা স্থির হবার পর পূর্ববর্তী নিয়ম অনুসারে অধ্যক্ষ বিতর্ক সভা পরিচালনা করবেন।

অবশ্য স্কুলে পরীক্ষা গ্রহণের সময় নেতা নির্বাচন করা নাও হতে পারে। যে গ্রুপকে ডাকা হবে, তাদের প্রত্যেককেই সমান সময় দেওয়া হবে। প্রয়োজন বুঝলে তাঁরা মাত্র দুজনকে ডেকেও বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে বলতে পারেন।

একটি বিতর্ক সভা

(সভার মতে ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়।)

আটজন ছাত্রকে ডাকা হয়েছে। পরীক্ষক তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের এবার একটি বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে হবে। আমি দুটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। তোমরা পরস্পর আলোচনা করে ঠিক করে নাও কোন্ বিষয়টি গ্রহণ করবে। এরপর বাদীপক্ষ ও বিবাদী পক্ষে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা এবং কে কার পরে বলবে তা লিখে আমাকে জানাও। এর জন্য সময় পাবে পাঁচ মিনিট।"

বিতর্কের বিষয়বস্তু

(১) সভার মতে নব-প্রবর্তিত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা অপেক্ষা নানাদিক থেকে শ্রেষ্ঠ।

(২) সভার মতে ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত না।

পরীক্ষকের নির্দেশে ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দ্বিতীয় বিষয়টি গ্রহণ করলো। এরপর তারা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে এবং প্রত্যেক দলের জন্য একজন করে নেতা নির্বাচন করে অংশগ্রহণকারীদের নামের ক্রমিক তালিকা সভাপতির হাতে দিলো।

পরীক্ষক : এবার তাহলে সভার কাজ আরম্ভ করা যাক। এ সভায় আমিই অধ্যক্ষের আসন গ্রহণ করছি। বাদী পক্ষের নেতাকে প্রথমে তার বক্তব্য রাখতে হবে। এর জন্য

আমি পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। বাদীপক্ষ নেতার বক্তব্য শেষ হলে বিবাদী পক্ষের নেতা তার বক্তব্য রাখবে। তাকেও পাঁচ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করতে হবে।

বিবাদী পক্ষের নেতার বক্তব্য শেষ হলে পর্যায়ক্রমে একবার বাদী পক্ষ এবং একবার বিবাদী পক্ষের সভ্যরা তাদের বক্তব্য রাখবে। তাদের তিন মিনিট করে সময় দেওয়া হচ্ছে। ২৮ মিনিটের মধ্যে বক্তৃতা শেষ করতে হবে। তারপব বাদী পক্ষেব নেতা জবাবী ভাষণ
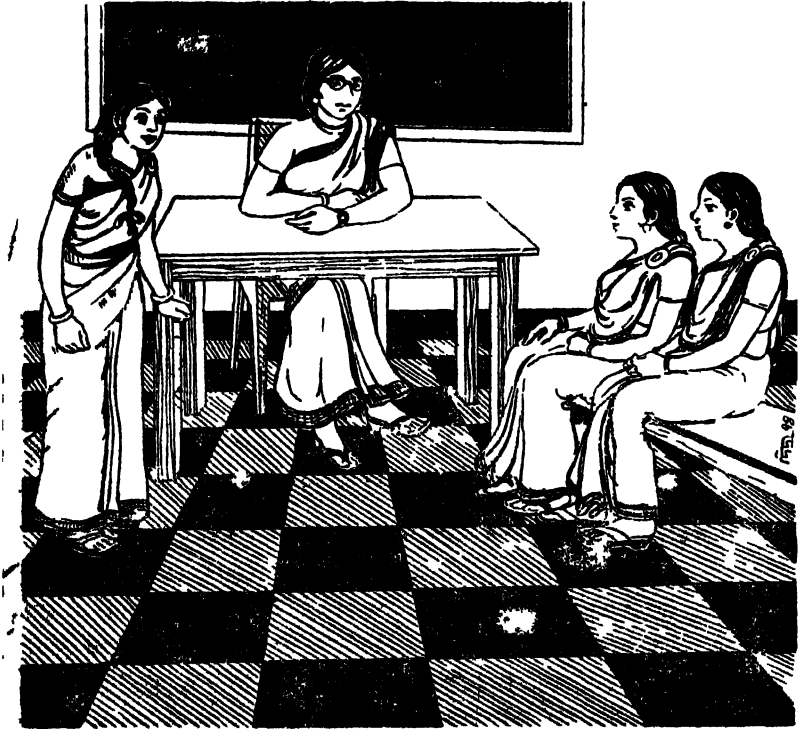
একটি বিতর্ক সভা

দেবে এবং সর্বশেষে আমি আমার ভাষণ দেব এবং উভয় পক্ষের বক্তব্য বিচার-বিবেচনা করে আমার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবো। এতে মোট সময় লাগবে ৪০ মিনিট।

এখন বাদী পক্ষের নেতা তার বক্তব্য রাখো। প্রস্তাবিত বিষয়টি হচ্ছে, "সভার মতে ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়"।

বাদীপক্ষের নেতা তার বক্তৃতা শুরু করলো :

- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

আমরা আজ এই বিতর্ক সভার যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে ছাত্রসমাজ ও রাজনীতি। আমার মতে ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা মোটেই

উচিত নয়। সংস্কৃতে বলা হয়েছে, ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ—অর্থাৎ অধ্যয়নই ছাত্রের তপস্যা। ঋষিরা যেমন কায়মনোবাক্যে ভগবানের আরাধনা করেন, ছাত্রদের ঠিক সেইভাবে কায়মনোবাক্যে পড়াশুনা করতে হবে। ছাত্রেরা যদি পড়াশুনার সময়ে রাজনীতি বা অন্যান্য বিষয়ে মনোযোগ দেয় তাহলে তারা ঠিকমত পড়াশুনা করতে পারবে না। ফলে তাদের শিক্ষার দিক থেকে নিম্নগামী হবে পড়বে। আজ আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্রেরা হটে আসছে। এর একমাত্র কারণ হলো, বাঙালী ছাত্ররা লেখাপড়ার দিকে মনোযোগ না দিয়ে রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি করছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছাত্রদের রাজনীতিতে টেনে আনেন এবং অপর দলের বিরুদ্ধে তাদের প্ররোচিত করেন। ছাত্রেরা স্বভাবতঃই উত্তেজনা ভালবাসে। বর্তমান রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে তারা যথেষ্ট উত্তেজনার খোরাক পায় বলেই তারা প্রদীপের শিখালুব্ধ পতঙ্গের মতো রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং সব সময় হানাহানি, মারামারি, মিছিল আর সভা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। লেখাপড়ার দিকে এরা মোটেই মন দেয় না। ফলে পরীক্ষার হলে এসে এরা অসদুপায় অবলম্বন করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চেষ্টা করে। কিন্তু অসদুপায়ে পরীক্ষা পাশ করলে প্রকৃত জ্ঞান হয় না। এই কারণেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এরা ভাল ফল করতে পারে না।

এ অবস্থা আর চলতে দেওয়া উচিত নয়। এক সময় বাঙালী ছাত্ররাই ছিল সারা ভারতের ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সব রকম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেই তারা সম্মানের আসন লাভ করতো। কিন্তু সে অবস্থা আজ আর নেই। আজ বাঙালী ছাত্ররা সব দিক থেকেই পিছিয়ে পড়ছে। এর একমাত্র কারণ হলো তারা আজ লেখাপড়া অবহেলা করে রাজনীতির পঙ্কিল পথে অবতরণ করেছে।

আমি তাই বলতে চাই যে, এই সর্বনাশা পথ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, রাজনীতি করবার সময় পরেও পাওয়া যাবে। কিন্তু লেখা-পড়া করার সময় ভবিষ্যতে আর পাওয়া যাবে না। সুতরাং ছাত্র জীবনে তাদের একমাত্র কাজ হবে অধ্যয়ন।

এ ব্যাপারে শিক্ষকদেরও বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। ছাত্রদের কর্তব্যপথের সন্ধান একমাত্র তাঁরাই দিতে পারেন। ছাত্রদের রাজনীতিতে টেনে না এনে তারা যাতে সত্যিকারের মানুষ হতে পারে সে বিষয়ে এঁরা যেন সচেষ্ট হন।

আমি আশা করবো ছাত্রসমাজ রাজনীতি হতে দূরে থেকে পড়াশুনায় যেন মনোনিবেশ করে। তবেই তারা বাঙালী ছাত্রদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবে।

অধ্যক্ষ। (বিরোধী দলের নেতার দিকে তাকিয়ে) এবার তুমি তোমার বক্তব্য রাখো।

বিরোধী পক্ষের নেতার বক্তব্য:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

বাদী পক্ষের সুবিজ্ঞ নেতার বক্তব্য শুনলাম। তাঁর মতে, ছাত্রদের শুধু লেখাপড়া ছাড়া আর কোন কাজই করা উচিত নয়। তিনি একটি সংস্কৃত বচনের উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝাতে

চেয়েছেন যে, অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা হওয়া উচিত। সুবিজ্ঞ বক্তা বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন যে, আমরা এখন বৈদিক যুগে বাস করছি না। বৈদিক যুগে ছাত্ররা গুরুগৃহে থেকে পড়াশুনা করতো। গুরুদেবরা থাকতেন লোকালয় থেকে দূরে কোনো বনে অথবা উপবনে। সেখানে নিজের চাষের ক্ষেতের ফসল থেকে উৎপন্ন খাদ্য আহরণ করে এবং গোয়ালের গাভীর দুগ্ধ পান করে, সবল এবং সুস্থ হয়ে, ছাত্রদের শ্রুতি, স্মৃতি, ব্যাকরণ এবং অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। ছাত্ররা গুরুর সেবা করে এবং কখনও কখনও গুরুর ক্ষেতে চাষীর কাজ করে এবং গুরুর গরু চরিয়ে যে সময়টুকু অবসর পেতো, সেই সময় গুরুর কাছে বসে অধ্যয়ন করতো। অর্থাৎ, সে আমলেও দেখা যেতো যে, ছাত্ররা পড়াশুনার বাইরেও কোনো কোনো কাজ করতো। তারা গুরুর ক্ষেতে চাষীর কাজ করতো এবং গুরুর গরু চরাতো। এটা গুরুভক্তির নিদর্শন বলে জাহির করবার চেষ্টা করা হলেও, এবং তা মেনে নিলেও দেখা যাবে যে, ছাত্ররা লেখাপড়ার বাইরেও অন্য কাজ করতো।

বৌদ্ধ যুগেও দেখা যায় যে, ছাত্ররা সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও ধর্মপ্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করতো। এবং সে ধর্মপ্রচারের সঙ্গে রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচারেও অংশগ্রহণ করেছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচীন ভারতেও ছাত্রসমাজ অধ্যয়ন বহির্ভূত কাজ করতো।

প্রাচীন কালের কথা বাদ দিয়ে এবার আধুনিক কালে আসছি। আমরা জানি যে, অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছাত্রসমাজকে রাজনীতিতে টেনে এনেছিলেন। সে দিনের সেই ধারা আজও সমান তালেই চলছে। প্রভেদের মধ্যে এই যে সে সময় দেশের একমাত্র রাজনীতি ছিল স্বাধীনতা অর্জন এবং একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল কংগ্রেস। পরবর্তীকালে মুসলমানরা যখন মুসলীম লীগ স্থাপন করেন তখন মুসলীম নেতারা মুসলমান ছাত্রদের রাজনীতিতে টেনে নেন। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জিত হবার পরে দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আবির্ভূত হবার ফলে ঐ সব দলের নেতারা এখন ছাত্র সমাজকে নিজ নিজ দলে টানতে চেষ্টা করছেন। ফলে দলীয় স্বার্থের সংঘাত ছাত্রদের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করে। দলীয় সংঘাতের সময় ছাত্ররা ভুলে যায় যে, তারা সবাই ভাই ভাই। তারা তখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করতেও পিছ্‌পা হয় না। এমনকি এক দলভুক্ত ছাত্র অপর দলের ছাত্রদের মেরেই শায়েস্তা করতে চায়। যে দল মার খায় সে দল চেষ্টা করে প্রতিশোধ নিতে। তারা তখন দলবদ্ধ করে সুযোগ পেলেই মার দেনেওয়ালা দলকে প্রত্যাঘাত করে। এইভাবে ছাত্রসমাজের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয় এবং এক দলের ছাত্রেরা অন্যান্য দলের ছাত্রদের শত্রু মনে করতে থাকে।

শুধু তাই নয়, লেখাপড়ার কথাও তারা ভুলে যায় এবং দিনের পর দিন সভাসমিতি ও মিছিল করতে ব্যস্ত থাকে। ফলে পরীক্ষার হলে এসে তারা অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে পরীক্ষা-সাগর পার হতে চায়।

ছাত্র সমাজের এই রকম অসুস্থ অবস্থার জন্যে রাজনৈতিক নেতারাই বিশেষভাবে দায়ী। তাঁরা যদি ছাত্রসমাজকে রাজনৈতিক দাবাখেলার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার না করতেন তাহলে তারা নিজেদের বিচার বুদ্ধি অনুসারে সঠিক রাজনৈতিক পন্থা খুঁজে বের করতো এবং সেই পথেই তারা একতাবদ্ধ হয়ে চলতো।

আমি তাই বলতে বাধ্য যে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করাটা ছাত্র সমাজের পক্ষে মোটেই দূষণীয় কাজ নয়। দূষণীয় কাজ হলো অসুস্থ রাজনীতির আগুনে পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়া। আমাদের তাই সর্বপ্রযত্নে ওদের ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, দলীয় কোন্দল রাজনীতি নয়, আসল রাজনীতি হলো দেশের সামগ্রিক মঙ্গল; এবং এই সামগ্রিক মঙ্গলের দিকেই তাকে এখন দৃষ্টি ফেরাতে হবে।

অধ্যক্ষ—এবার এই বিতর্কের পক্ষে ও বিপক্ষে যারা বলতে চাও তারা অল্প কথায় তাদের বক্তব্য রাখতে পার। এখন বাদীপক্ষের প্রথম বক্তা বলবে।

আধ্যক্ষের কথায় তখন মঞ্চে উঠে দাঁড়ালো (এখানে একটু এগিয়ে এসে দাঁড়াতে হবে) বাদী পক্ষের একজন সভ্য (ছাত্র)।

বাদী পক্ষের প্রথম বক্তা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটু আগে বিরোধী পক্ষের নেতা যে বক্তব্য রাখলেন, আমি তার বিরুদ্ধে দু'চারটি কথা বলতে চাই। তিনি রাজনৈতিক নেতাদের ওপরে দোষ চাপিয়ে ছাত্র-সমাজের উচ্ছৃংখলতার জন্যে পুরোপুরিভাবে তাঁদেরই দায়ী করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে, কোনো রাজনৈতিক নেতাই ছাত্রদের মারামারি করতে বলেন না, এমন কি মারামারি করতে উস্কানিও দেন না। তাঁরা নিজ নিজ দলের রাজনৈতিক মতবাদ ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করে দল ভারী করতে চেষ্টা করেন ঠিকই, কিন্তু কখনই উচ্ছৃংখলতাকে প্রশ্রয় দেন না। সুতরাং ছাত্র-সমাজের অধোগতির জন্য তাঁরা দায়ী নন। দায়ী হলো ছাত্ররা নিজেরাই। তারা যদি সুষ্ঠুভাবে পড়াশুনা নিয়ে থাকতো তাহলে তাদের মধ্যে উচ্ছৃংখলতা দেখা দিত না। ছাত্ররা যদি পড়াশুনা নিয়ে থাকে এবং পরীক্ষায় ভাল ফল করতে সচেষ্ট হয় তখন মারামারি, হানা-হানি এবং উচ্ছৃংখলতা আর থাকবে না।

(এই ছেলেটির বক্তৃতা শেষ হলে বিরোধী পক্ষের একটি ছাত্র বক্তব্য রাখতে এগিয়ে এলো।)

বিবাদী পক্ষের প্রথম বক্তা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা বাদীপক্ষের এবং বিবাদী পক্ষের নেতার বক্তৃতা শুনলাম। বাদী পক্ষের নেতা যে বক্তব্য রেখেছেন তা বাস্তবতা বর্জিত, অন্যদিকে বিবাদী পক্ষের নেতার বক্তব্য যথার্থ বাস্তবতাসম্মত। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ছাত্ররাও রক্ত-মাংসের মানুষ, তাদের বুদ্ধি আছে, বিবেচনা আছে; কোনটা ন্যায় এবং কোনটা অন্যায় তা বুঝবার মতো ক্ষমতা আছে। সুতরাং তারা যদি নিজ নিজ জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদকে অভ্রান্ত বলে মনে করে এবং সেই মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে তখন তাদের ওপরে দোষারোপ করা চলে না। রাজনীতি আজ সমাজ জীবনের প্রতিটি অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বত্রই আজ রাজনীতির ছড়াছড়ি। চাল, ডাল, আলু, পটল, তেল, বেবীফুড থেকে শুরু করে ভারত মহাসাগরে বিদেশী ঘাঁটি স্থাপন—সব জায়গাতেই রাজনীতি চলছে। দেশীয় রাজনীতির সঙ্গে বিদেশী রাজনীতিও সুযোগ পেয়ে অনুপ্রবেশ করেছে। এই অবস্থায় ছাত্রসমাজ কখনও রাজনীতি থেকে বাইরে থাকতে পারে না। শত চেষ্টা করলেও তাদের আজ রাজনীতি থেকে ফিরিয়ে হাতে বই দিয়ে গৃহকোণে আবদ্ধ রাখা যাবে না। সুতরাং তারা রাজনীতিতে

অংশগ্রহণ করবেই। তবে রাজনীতিটা যাতে দলীয় স্বার্থবাদী অসুস্থ রাজনীতি না হয় তার জন্য ছাত্রসমাজকে অবহিত হতে হবে।

বাদীপক্ষের দ্বিতীয় বক্তা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এইমাত্র যিনি বক্তৃতা করলেন তার বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। চাল, ডাল, আলু, পটলে রাজনীতি চলছে বলে পড়াশুনা পরিত্যাগ করে আলু পটলের সামিল হতে হবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের দেশে একটা গ্রাম্য প্রবাদ আছে, 'যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে'। ছাত্রসমাজের পক্ষেও এটা খাটে। তারা রাজনীতি করে করুক, কিন্তু পড়াশুনা তাদের করতেই হবে।

বিবাদী পক্ষের দ্বিতীয় বক্তা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা এখানে বাদী পক্ষের নেতার বক্তব্য এবং তার উত্তরে বিবাদী পক্ষের নেতার বক্তব্য শুনলাম। উভয়ের মতবাদের সমর্থনে যাঁরা বক্তব্য রাখলেন তাঁদের বক্তব্যও শুনলাম। কিন্তু উভয় পক্ষের বক্তব্য বিষয় বিবেচনা করলে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, বাদী পক্ষের মতবাদ অবাস্তব এবং বিবাদী পক্ষের মতবাদ বাস্তব। আমি তাই বাস্তব মতবাদের পক্ষেই সমর্থন জানাচ্ছি।

বাদী পক্ষের তৃতীয় বক্তা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিবাদী পক্ষের যুক্তি মানলে স্বীকার করে নিতে হয় যে, ছাত্রদের পক্ষে পড়াশুনা করাটা তেমন কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় নয়।' এটা একটা মারাত্মক মতবাদ। সর্বভারতীয় চাকরির ক্ষেত্র থেকে বাঙালী ছাত্ররা আজ যে হটে আসছে তার মূলে রয়েছে এই সর্বনাশা মতবাদ, সুতরাং এই সর্বনাশা মতবাদ পরিহার করে ছাত্র-সমাজকে পড়াশুনায় মনোযোগ দিতেই হবে।

বিবাদী পক্ষের তৃতীয় বক্তা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বাদীপক্ষের শেষ বক্তা একটি মোক্ষম অস্ত্র ছেড়েছেন। অস্ত্রটা কি? রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করলে ছাত্ররা চাকরি পাবে না বলে ভয় দেখিয়েছেন। ভাবছেন, ভয়ের কাছে নতি স্বীকার করে আমরা সকল যুক্তি ও নীতি বিসর্জন দেব। কিন্তু তা হবে না এবং কোনদিন হয়নি। আমি বক্তা মহোদয়কে জানিয়ে দিতে চাই যে, যে রাজনীতি করে সে পরবর্তী জীবনে কর্মক্ষেত্রেও সাফল্য লাভ করে, সে চাকরির ক্ষেত্রই হোক বা অন্য ক্ষেত্রই হোক। এর সংগে আমি বলতে চাই, রাজনীতি জ্ঞান ছাত্রাবস্থা থেকেই যদি না জন্মে, ছাত্রাবস্থা থেকেই যদি তরুণদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার শিক্ষা না হয়, তবে কর্মজীবনে রাজনীতির ক্ষেত্রে যে আমাদের রাজ্যের লোকেরা পিছিয়ে যাবেন, তা বাদীপক্ষ ভেবে দেখেছেন কি? ছাত্ররা বাদীপক্ষের ইচ্ছামত ভালভাবে লেখা-পড়া করলো, রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করলো না, পরীক্ষায় পাশ করলো, ভবিষ্যৎ জীবনে ভাল চাকরিও পেল এবং নীরব নির্বিরোধ গতানুগতিক জীবন যাপন শুরু করলো; আর অন্যদিকে দেশ চালাতে লাগলো মজুতদার, মুনাফাখোর, চোরাকারবারী, একচেটিয়া পুঁজিপতি প্রভৃতি শোষকের দল। তাতে কি দেশের উন্নতি হবে? বাদী পক্ষ কি নিজেদের বাক্‌চাতুরির আড়ালে এদের টিঁকে থাকার পথকে প্রশস্ত করছেন না? অতএব আমাদের পড়তেও হবে—আবার রাজনীতিতে অংশও গ্রহণ করতে হবে।

বাদীপক্ষের নেতার জবাবি ভাষণ: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা বিরোধীপক্ষের নেতা ও বক্তাদের অনেক বাগাড়ম্বর শুনলাম। বিরোধী পক্ষের নেতা নিজমুখে স্বীকারোক্তি

করেছেন যে ছাত্ররা রাজনীতি করলেই একদল ছাত্র অপর একদল ছাত্রের সঙ্গে মারামারি করে; তারা পড়াশুনার কথা ভুলে যায়; রাতদিন মিছিল মিটিং মারামারিতে ব্যস্ত থাকে, পরীক্ষার হলে ছাত্রগণ টোকাটুকি করে। তারপর তিনি এর দায়ভার রাজনৈতিক দলের নেতাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

ছাত্ররা রাজনীতি করবে, কিন্তু দলীয় রাজনীতির অপবিত্র স্পর্শ থেকে শতসহস্র হস্ত দূরে থাকবে, এ কখনও হয় না, হতে পারে না। এ যেন সেই

"রাঁধিব বাড়িব ব্যঞ্জন বাটিব

তবু আমি হাঁড়ি ছোঁব না।

আমার যেমন বেণী তেমনি রবে

চুল ভেজাব না।"—গানের মত; এ যেন সোনার পাথর বাটির কল্পনা। অতএব রাজনীতি করতে গেলে ছাত্রেরা দলীয় ধান্দাবাজ নেতাদের খপ্পরে পড়বেই এবং তাদের পড়াশুনার দফারফা হবেই। সেইজন্যই বলি ছাত্রজীবনে রাজনীতি নয়—লেখাপড়া করতে হবে।

একজন বিরোধী বক্তা বললেন, চাল, ডাল, বেবীফুডেও যখন রাজনীতি ঢুকেছে, তখন পড়াশুনাতেও রাজনীতি ঢোকাতে হবে। আলু, পটল, চাল-ডাল, বেবীফুডে যখন ভেজাল ঢুকেছে, তখন কি তিনি লেখাপড়াতেও ভেজাল দিতে চান।

বিরোধী পক্ষের অপর একজন বক্তা ভয় দেখিয়েছেন, ছাত্ররা রাজনীতি না করলে চোরা-কারবারী, মজুতদার, মুনাফাখোর, জমিদার, জোতদার, একচেটিয়া পুঁজিপতি ইত্যাদি ইত্যাদি দেশের কর্ণধার হবে এবং দেশ একেবারে ধ্বংসের অতল কুম্ভীপাক নরকে তলিয়ে যাবে। এ তো সস্তা শ্লোগানের কথা; তাঁদের রাজনৈতিক দাদাদের শেখানো বুলি। আমরা কি ছাত্রদের লেখাপড়ার পর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে মানা করছি? তখনই তো পরিণত বুদ্ধি নিয়ে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার সময়। তখন তারা রাজনীতি করবে এবং ঐ সব দুশমনদের দূরে হটাবে।

অতএব বিরোধী পক্ষের যুক্তিজালকে আমি অন্তঃসারশূন্য মনে করি এবং আমি দৃঢ়তার সংগে বিশ্বাস করি যে ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়।

অধ্যক্ষ। আজ এই বিতর্ক সভায় বাদী পক্ষের নেতা ও বিবাদী পক্ষের নেতা তাদের সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছে। উভয়ের বক্তব্যের সমর্থনে অন্যেরাও বক্তব্য রেখেছে। বাদী পক্ষের প্রধান বক্তব্য হলো, ছাত্রসমাজকে রাজনীতি পরিহার করে পড়াশুনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। অপর দিকে বিরোধী পক্ষের মতবাদ হলো, রাজনীতিতে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করবেই, তবে পড়াশুনাকেও পরিহার করলে চলবে না। উভয় পক্ষের মতবাদের মধ্যেই যুক্তি আছে। তবে বিরোধী পক্ষের নেতার বক্তব্যই ছাত্রসমাজের পক্ষে গ্রহণীয়। আমার সিদ্ধান্ত এই যে, ছাত্ররা সুস্থ রাজনীতিতে অবশ্য অংশ গ্রহণ করবে। তার সঙ্গে সঙ্গে পড়া-শুনার দিকেও মনোযোগ দেবে। অর্থাৎ ছাত্ররা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে, কিন্তু সে

রাজনীতি সুস্থ এবং কলুষবর্জিত হওয়া চাই। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে, অধ্যয়ন-বর্জিত এবং উচ্ছৃংখল মানসিকতা সম্পন্ন রাজনীতিচর্চা সর্বদাই বর্জনীয়।

অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বিতর্ক সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়ে থাকে। অবশ্য পরীক্ষাগ্রহণের সময় স্কুলে আয়োজিত ছাত্রছাত্রীদের বিতর্ক সভায় অধ্যক্ষ নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করতেও পারেন। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা-হল ত্যাগ করার পর পরীক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য এবং প্রকাশভঙ্গী বিচার করে তাদের প্রাপ্য নম্বর (marks) দিয়ে থাকেন।

আরও একটি বিতর্ক সভা

(এই সভা যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়।)

ছ'জন ছাত্রকে ডাকা হয়েছে। পরীক্ষক তাদের নিম্নলিখিত দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি বেছে নিতে বললেন ঃ

(১) নাগরিক জীবন পল্লী জীবন অপেক্ষা সর্বদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ।

(২) যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই।

তিনি তাদের আরও জানালেন, তিনিই বিতর্ক সভার অধ্যক্ষ।

ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দ্বিতীয় বিষয়টি গ্রহণ করলো। তারা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে এবং প্রত্যেক দলের জন্য একজন করে নেতা নির্বাচন করে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা অধ্যক্ষের হাতে দিলো।

তিনি বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষের নেতাদের প্রত্যেকের প্রারম্ভিক বক্তব্যের জন্য পাঁচ মিনিট করে সময় নির্দিষ্ট করলেন। অন্যান্য বক্তাদের প্রত্যেকের জন্য তিন মিনিট করে ও বাদী পক্ষের নেতার জবাবি ভাষণের জন্যও তিন মিনিট ধার্য করলেন। অধ্যক্ষ নিজের সমাপ্তি-ভাষণের জন্য সময় নির্দিষ্ট করলেন তিন মিনিট। মোট সময় লাগবে ২৮ মিনিট।

বিতর্কসভা আরম্ভ হলো। অধ্যক্ষ সভাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজকের বিতর্ক-সভার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, "এই সভা সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করছে যে, এই সভা যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়।" এখন বাদীপক্ষের নেতা বক্তব্য উপস্থিত করবে।

বাদী পক্ষের নেতার বক্তৃতা ঃ

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

আমরা আজ এই বিতর্ক সভায় "যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই"—এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো। আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, আমি যুদ্ধ বিরোধী ; আমি শান্তিকামী, শান্তি আমার চাই, আমাদের চাই, জাতির জন্য চাই, সমগ্র মানব জাতির জন্য চাই। কারণ যুদ্ধ আনে হতাশা, ব্যর্থতা এবং ধ্বংস। যাঁরা ইতিহাসের পাতা একটু উল্টে-পাল্টে দেখেছেন, তাঁরা জানেন, বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধ—১ম ও ২য় মহাযুদ্ধ, বিশ্বের বুকে কি ভয়ঙ্কর ধ্বংসের লেলিহান অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেছিল। সেই বহ্নিশিখা শুধু রাজধানী শহরকে, রাষ্ট্র-নায়কদের বা সৈনিক-সেনাপতিদেরই স্পর্শ করে নি, সেই আগুনের লোল জিহ্বা কলকারখানার

কর্মমুখর কোণ থেকে পল্লীবাসী কৃষকের শান্তির কুটির পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো। কত জননী তাঁদের পুত্র-কন্যা হারিয়েছেন, কত পত্নী তাঁদের পতি হারিয়েছেন, কত বোন তাঁদের ভাই হারিয়েছেন, তার হিসেব নেই। হাজার হাজার শিশু তাদের মা-বাবা হারিয়ে অনাথ হয়েছে। কত শহর-বন্দর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে, কলের চাকা স্তব্ধ হয়েছে, কত শস্যক্ষেত্র মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে, তার হিসেবই বা কে রাখে! এ দুটি মহাযুদ্ধ মানব জাতির যে কি ভয়ানক ক্ষতি সাধন করেছে—তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

আর অন্যদিকে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হয়। যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপ থাকে না; সেই অর্থ নিয়োজিত হয় নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য, কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য, দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য। দেশ ও জাতি যাতে একটা সুষম অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে পৌঁছোতে পারে তার জন্যই দরকার দেশের শান্তিপূর্ণ অবস্থা।

শান্তিপূর্ণ অবস্থায় দেশ যখন অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে এগোতে থাকে, তখনই কেবল দেশের শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য মেহনতি জনতা তাদের নিজেদের দাবি আদায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হতে পারে। যুদ্ধের সময় এটা কিছুতেই সম্ভব হয় না।

অতএব, যুদ্ধ আমাদের কাম্য হতে পারে না, শান্তিই আমাদের কাম্য। তাই আজ সারা পৃথিবী ব্যাপী ধ্বনি উঠেছে—যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই! শান্তি চাই!!

প্রতিবাদী পক্ষের নেতার বক্তব্য:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

বাদীপক্ষের নেতা মহোদয়ের বক্তৃতা শুনলাম। তিনি অত্যন্ত বাগাড়ম্বরের সঙ্গে যুদ্ধের ভয়াবহতার নিদারুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি কথার ধূম্রজাল বিস্তার করে. যুদ্ধের মঙ্গলময় রূপটিকে আড়াল করবার চেষ্টা করেছেন।

আমি বক্তাকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের মহান জন্মভূমি ভারত যদি বিদেশী শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে তিনি কি যুদ্ধ না করে শুধু শান্তির ললিত বাণী শুনাবেন? শান্তি নিশ্চয়ই আমাদের সকলেরই কাম্য—কিন্তু যে শান্তির বাণী বোঝে না, বোঝে অস্ত্রের ঝনঝনা, তাকে তো অস্ত্র দিয়েই তা বোঝাতে হবে। আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতি-আক্রমণের মধ্য দিয়েই স্তব্ধ করতে হবে। অতএব যুদ্ধ যত ভয়াবহই হোক না কেন, বিদেশী শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে যুদ্ধ ছাড়া গতি নেই—একথা মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না। যাঁরা যুদ্ধের ধ্বংস লীলার কথা ভেবে বিদেশী আক্রমণের মুখে হাত গুটিয়ে থাকবেন, তাঁরা দেশকে অধিকতর ধ্বংস ও পরাধীনতার মুখে ঠেলে দেবেন, তাঁরা দেশের শত্রু।

এই তো অল্পদিন আগের কথা, পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছিলো; তখন যদি ভারতীয় বাহিনী শান্তির রামধুন গাইতো তবে কি আমাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষা হতো? সে দিন যদি বাদী পক্ষের নেতা মহোদয় তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি বলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তেন, তাহলে তাঁদের স্থান কি শ্মশান ঘাটে অথবা জেলখানায় হতো না?

যুদ্ধ শুধু বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকেই দেশকে রক্ষা করে না, যুদ্ধের মধ্য দিয়েই কোন জাতির জাতীয় ক্ষমতা সাধারণ মানুষের হাতে আসতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

রাজনীতি সুস্থ এবং কলুষবর্জিত হওয়া চাই। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে, অধ্যয়ন-বর্জিত এবং উচ্ছৃংখল মানসিকতা সম্পন্ন রাজনীতিচর্চা সর্বদাই বর্জনীয়।

অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বিতর্ক সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়ে থাকে। অবশ্য পরীক্ষাগ্রহণের সময় স্কুলে আয়োজিত ছাত্রছাত্রীদের বিতর্ক সভায় অধ্যক্ষ নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করতেও পারেন। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা-হল ত্যাগ করার পর পরীক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য এবং প্রকাশভঙ্গী বিচার করে তাদের প্রাপ্য নম্বর (marks) দিয়ে থাকেন।

আরও একটি বিতর্ক সভা

(এই সভা যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়।)

ছ'জন ছাত্রকে ডাকা হয়েছে। পরীক্ষক তাদের নিম্নলিখিত দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি বেছে নিতে বললেন :

(১) নাগরিক জীবন পল্লী জীবন অপেক্ষা সবদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ।

(২) যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই।

তিনি তাদের আরও জানালেন, তিনিই বিতর্ক সভার অধ্যক্ষ।

ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দ্বিতীয় বিষয়টি গ্রহণ করলো। তারা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে এবং প্রত্যেক দলের জন্য একজন করে নেতা নির্বাচন করে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা অধ্যক্ষের হাতে দিলো।

তিনি বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষের নেতাদের প্রত্যেকের প্রারম্ভিক বক্তব্যের জন্য পাঁচ মিনিট করে সময় নির্দিষ্ট করলেন। অন্যান্য বক্তাদের প্রত্যেকের জন্য তিন মিনিট করে ও বাদী পক্ষের নেতার জবাবি ভাষণের জন্যও তিন মিনিট ধার্য করলেন। অধ্যক্ষ নিজের সমাপ্তি-ভাষণের জন্য সময় নির্দিষ্ট করলেন তিন মিনিট। মোট সময় লাগবে ২৮ মিনিট।

বিতর্কসভা আরম্ভ হলো। অধ্যক্ষ সভাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজকের বিতর্ক-সভার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, "এই সভা সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করছে যে, এই সভা যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়।" এখন বাদীপক্ষের নেতা বক্তব্য উপস্থিত করবে।

বাদী পক্ষের নেতার বক্তৃতা :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

আমরা আজ এই বিতর্ক সভায় "যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই"—এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো। আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, আমি যুদ্ধ বিরোধী; আমি শান্তিকামী, শান্তি আমার চাই, আমাদের চাই, জাতির জন্য চাই, সমগ্র মানব জাতির জন্য চাই। কারণ যুদ্ধ আনে হতাশা, ব্যর্থতা এবং ধ্বংস। যাঁরা ইতিহাসের পাতা একটু উল্টে-পাল্টে দেখেছেন, তাঁরা জানেন, বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধ—১ম ও ২য় মহাযুদ্ধ, বিশ্বের বুকে কি ভয়ংকর ধ্বংসের লেলিহান অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেছিল। সেই বহ্নিশিখা শুধু রাজধানী শহরকে, রাষ্ট্রনায়কদের বা সৈনিক-সেনাপতিদেরই স্পর্শ করে নি, সেই আগুনের লোল জিহ্বা কলকারখানার

কর্মমুখর কোণ থেকে পল্লীবাসী কৃষকের শান্তির কুটির পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো। কত জননী তাঁদের পুত্র-কন্যা হারিয়েছেন, কত পত্নী তাঁদের পতি হারিয়েছেন, কত বোন তাঁদের ভাই হারিয়েছেন, তার হিসেব নেই। হাজার হাজার শিশু তাদের মা-বাবা হারিয়ে অনাথ হয়েছে। কত শহর-বন্দর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে, কলের চাকা স্তব্ধ হয়েছে, কত শস্যক্ষেত্র মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে, তার হিসেবই বা কে রাখে! এ দুটি মহাযুদ্ধ মানব জাতির যে কি ভয়ানক ক্ষতি সাধন করেছে—তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

আর অন্যদিকে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হয়। যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপ থাকে না; সেই অর্থ নিয়োজিত হয় নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য, কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য, দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য। দেশ ও জাতি যাতে একটা সুষম অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে পৌঁছোতে পারে তার জন্যই দরকার দেশের শান্তিপূর্ণ অবস্থা।

শান্তিপূর্ণ অবস্থায় দেশ যখন অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে এগোতে থাকে, তখনই কেবল দেশের শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য মেহনতি জনতা তাদের নিজেদের দাবি আদায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হতে পারে। যুদ্ধের সময় এটা কিছুতেই সম্ভব হয় না।

অতএব, যুদ্ধ আমাদের কাম্য হতে পারে না, শান্তিই আমাদের কাম্য। তাই আজ সারা পৃথিবী ব্যাপী ধ্বনি উঠেছে—যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই! শান্তি চাই!!

প্রতিবাদী পক্ষের নেতার বক্তব্য:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

বাদীপক্ষের নেতা মহোদয়ের বক্তৃতা শুনলাম। তিনি অত্যন্ত বাগাড়ম্বরের সঙ্গে যুদ্ধের ভয়াবহতার নিদারুণ চিত্র অংকন করেছেন। তিনি কথার ধূম্রজাল বিস্তার করে, যুদ্ধের মঙ্গলময় রূপটিকে আড়াল করবার চেষ্টা করেছেন।

আমি বক্তাকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের মহান জন্মভূমি ভারত যদি বিদেশী শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে তিনি কি যুদ্ধ না করে শুধু শান্তির ললিত বাণী শুনাবেন? শান্তি নিশ্চয়ই আমাদের সকলেরই কাম্য—কিন্তু যে শান্তির বাণী বোঝে না, বোঝে অস্ত্রের ঝনঝনা, তাকে তো অস্ত্র দিয়েই তা বোঝাতে হবে। আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতি-আক্রমণের মধ্য দিয়েই স্তব্ধ করতে হবে। অতএব যুদ্ধ যত ভয়াবহই হোক না কেন, বিদেশী শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে যুদ্ধ ছাড়া গতি নেই—একথা মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না। যাঁরা যুদ্ধের ধ্বংস লীলার কথা ভেবে বিদেশী আক্রমণের মুখে হাত গুটিয়ে থাকবেন, তাঁরা দেশকে অধিকতর ধ্বংস ও পরাধীনতার মুখে ঠেলে দেবেন, তাঁরা দেশের শত্রু।

এই তো অল্পদিন আগের কথা, পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছিলো; তখন যদি ভারতীয় বাহিনী শান্তির রামধুন গাইতো তবে কি আমাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষা হতো? সে দিন যদি বাদী পক্ষের নেতা মহোদয় তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি বলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তেন, তাহলে তাঁদের স্থান কি শ্মশান ঘাটে অথবা জেলখানায় হতো না?

যুদ্ধ শুধু বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকেই দেশকে রক্ষা করে না, যুদ্ধের মধ্য দিয়েই কোন জাতির জাতীয় ক্ষমতা সাধারণ মানুষের হাতে আসতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

সময় পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শ্রমিক কৃষক প্রমুখ মেহনতি মানুষদের হাতে এসে পড়েছে। উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনামকে যুদ্ধ করেই জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। ভারত, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি ঔপনিবেশিক দেশগুলি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হওয়ার দরুনই স্বাধীনতা লাভ করতে পেরেছিল।

এই সেদিন মাত্র, বাংলাদেশের জনগণকে ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্য দিয়েই নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে।

অতএব, যুদ্ধকে ভয়াবহ বলে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। যুদ্ধ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; যুদ্ধ অপরিহার্য। যুদ্ধ আমরা অযথা চাইব না; কিন্তু তাই বলে শান্তি শান্তি বলে যুদ্ধকে পরিত্যাগ করে আমরা আমাদের জাতির ভাগ্যকে অন্যের হাতে তুলেও দেব না।

বাদীপক্ষের প্রথম বক্তা :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

বিরোধী পক্ষের নেতার বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। তিনি যে ভাবে যুদ্ধের গুণ-কীর্তন করেছেন, তাতে তাঁকে যুদ্ধবাদী বলা ছাড়া আর কোন ভাষা আমার নেই। হিটলার যুদ্ধবাদী ফ্যাসিস্ট ছিলেন। তিনি জার্মান জাতির উন্নতির জন্য যুদ্ধের সপক্ষে প্রচার করে জার্মানদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন। তার ফল কি হয়েছে, তা এখনও ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয় নি, জার্মানিতে গেলেই তা বোঝা যায়। যে জাতি পৃথিবী শাসন করার স্বপ্ন দেখেছিলো, সে জাতি আজ দ্বিখণ্ডিত, আজ হতমান, হৃত-ঐশ্বর্য।

আমি বিরোধীপক্ষের নেতাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছি যে, যুদ্ধ মানুষের বা জাতির ক্ষমতালিপ্সাকে বৃদ্ধি করে এবং পর-রাজ্যগ্রাসে অনুপ্রাণিত করে। আমরা ইতিহাসে এর অনেক নজির দেখেছি। আমরা জানি আলেকজাণ্ডারের কাহিনী, জানি আলাউদ্দিন খিলজীর কথা। আবার আমরা জানি মহানুভব সম্রাট অশোকের কথা। মানুষ কিন্তু আলাউদ্দিন খিলজীর চেয়ে অশোককে বেশী ভালবাসে। কারণ, অশোক ছিলেন যুদ্ধবিরোধী, শান্তিকামী। তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠায় তৎপর ছিলেন।

প্রতিবাদী পক্ষের প্রথম বক্তা :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

আমার পূর্ববর্তী বাদীপক্ষের বক্তারা বুঝাইবার চেষ্টা করেছেন যে, শান্তির-সময় দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ খুব তাড়াতাড়ি ঘটে; আর যুদ্ধের সময়—ঘটে না, বা ঘটলেও খুব ধীর গতিতে ঘটে। কথাটা কি ঠিক হলো? যুদ্ধের সময়—আত্মরক্ষার তাগিদে যখন সমস্ত জাতি দলাদলি ভুলে এক মন, এক প্রাণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন জাতির প্রয়োজনে—যুদ্ধের প্রয়োজনে বহু সংখ্যক নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে, কত নতুন নতুন রাস্তাঘাট তৈরি হয় রেল-লাইন বসে, বিমান বন্দর গঠিত হয়—তার সংখ্যা গণনা করা কঠিন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের হিসেব নিলেই আমার কথার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হবে। সুতরাং যুদ্ধকে আমি অপরিহার্য বলে মনে করি।

বাদীপক্ষের দ্বিতীয় বক্তা :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

আমার পূর্ববর্তী বিরোধী পক্ষের বক্তা যথেষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় বুঝাবার চেষ্টা করলেন, যুদ্ধের সময়ই দেশের উন্নতি হয়, শান্তির সময় তার শতাংশের একাংশও হয় না। কথাটা ঠিক নয়। যুদ্ধের সময় নিশ্চয়ই কিছু কিছু কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়—কিন্তু কিসের কারখানা? অস্ত্রের কারখানা, ওষুধের কারখানা নয়; সৈন্যদের জন্য ছাউনি তৈরি হয়, স্কুল কলেজের জন্য ঘর তৈরি হয় না। যানবাহনের উন্নতি যথেষ্টই হয়—এটা যেমন ঠিক, শত্রুর আক্রমণে রাস্তাঘাট ধ্বংস হয়—তার চেয়েও বেশী—এটাও ঠিক। সবচেয়ে বড় কথা, এই সব তৈরি করতে গিয়ে তাড়াহুড়োর মধ্যে যা তৈরি হয়, তার আয়ু বেশী দিন থাকে না। বরং অসাধু ব্যবসায়ী, বিত্তবান কনট্রাকটরদের ঘর টাকায় ভরে ওঠে। সাধারণ শ্রমিক কৃষকদের দেশের জরুরী অবস্থায় বাধ্য করা হয় কম বেতনে বেশী পরিশ্রম করতে। দ্রব্যমূল্য অসাধারণ বেড়ে যায়। ফলে, এইসব মেহনতি মানুষদের দুর্দশা আরও বেড়ে যায়। সুতরাং আমরা যুদ্ধের বিরোধী এবং শান্তির পক্ষে।

প্রতিবাদী পক্ষের দ্বিতীয় বক্তা :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

বাদীপক্ষের সমস্ত বক্তব্য শুনে আমার মনে হয়েছে আমি যেন কতকগুলো দুর্বল আত্ম-প্রবঞ্চকের দেশে বাস করছি। শান্তি, শান্তি, শান্তি! শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা ধরিয়ে দিলে। শান্তি কি? শান্তি দুর্বলের আত্মপ্রবঞ্চনার ঢাল স্বরূপ। সে যে নিজে নিজেকে প্রবঞ্চিত করছে. শান্তির প্রলাপ দিয়ে তাকে মধুর করতে চায়, আর অন্যকে মোহগ্রস্ত করতে চায়। আমরা দুর্বল নই; সুতরাং শান্তি শান্তি বলে আমরা ছিঁচকাঁদুনে মেয়ের মত কাঁদবো না। প্রয়োজন হলে আমরা যুদ্ধ করবো। যুদ্ধের মধ্য দিয়েই পুরাতন জীর্ণ সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে নতুন কল্যাণপ্রসূ প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা গড়া যায়।

বাদীপক্ষের নেতার জবাবি ভাষণ :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

বিপক্ষ দলের নেতা ও অন্য দুইজন বক্তা আমাদের দাবির বিরুদ্ধে অর্থাৎ যুদ্ধের সপক্ষে যেসব যুক্তি রেখেছেন, সেগুলো যে ভাষা- বা যে ভঙ্গিতেই আসুক না কেন, তার মধ্যে খুব একটা যুক্তি আছে বলে আমার মনে হয় না।

বিরুদ্ধ পক্ষের প্রধান যুক্তি, বহিরাক্রমণের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে যুদ্ধ ছাড়া গতি নেই। এটাও সঠিক নয়। শান্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এ কথা বলা হয় নি; অন্যান্য দেশের লোকদের মধ্যেও শান্তির আকাঙ্ক্ষা আছে, সাধারণ মানুষ, সে যে দেশেরই হোক না কেন, শান্তি তার কাম্য। অতএব সব দেশেই শান্তির আন্দোলনে সেই সব দেশের জনসাধারণকে একত্রিত করেই যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করতে হবে, যুদ্ধবাজদের কোণঠাসা করতে হবে। সব রকম চেষ্টা সত্ত্বেও যদি দেশ আক্রান্ত হয়, তখন শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধ হবে সর্বশেষ উপায়। অতএব যুদ্ধ উদ্দেশ্য নয়, উপায় মাত্র।

তাঁরা আরও বলেছেন, যুদ্ধের মধ্য দিয়েই নাকি সাধারণ মানুষ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তার উদাহরণে তাঁরা চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের মুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে গেছেন যে ঐ সব দেশ দখল করেছিল রাশিয়া। সেখানে শ্রমিক-কৃষকরাজ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। রাশিয়া সাহায্য করেছিল ঐ সব দেশে মেহনতি মানুষের শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে। সে রকম পরিস্থিতি কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজ করছে না। এটা তাঁরা জানেন কি?

বিরুদ্ধ পক্ষের অপর একটি প্রবল যুক্তি হলো, শান্তি দুর্বলের আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। এ কথাটাও অন্তঃসারশূন্য। কারণ দুর্বল কখনও শান্তি চায় না, সে এক প্রবলের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্য প্রবলের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তারপর তর্জন গর্জন করতে থাকে। যারা সবল, যারা প্রকৃত শক্তিমান তারাই শান্তি চায় এবং আন্তরিক ভাবেই শান্তি চায়। পৃথিবীর যে সব দেশ শান্তিকামী, সেদিকে যদি বিরোধী পক্ষের সম্মানিত নেতা এবং বক্তারা দৃষ্টি দেন, তা হলেই আমার কথার সারবত্তা বুঝতে সক্ষম হবেন। তাঁরা বুঝতে চাইছেন না, কারণ তাঁরা যুদ্ধবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। যুদ্ধ কোন সমস্যার সমাধান করে না; শান্তিই সর্বসমস্যার সমাধানকারক। সুতরাং আমরা শান্তি চাই, আমরা চিরকাল শান্তি চাইব। যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই; শান্তি-সুখে বাঁচতে চাই।

অধ্যক্ষের সমাপ্তি ভাষণ:

আজ এই বিতর্ক সভায় বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষের নেতৃদ্বয় সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছে। উভয় পক্ষের সমর্থনে যারা বক্তব্য রেখেছে, তাদের বক্তব্যও বেশ যুক্তিপূর্ণ। বাদী পক্ষ যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়, আর প্রতিবাদী পক্ষ যুদ্ধের যে প্রয়োজনীয়তা আছে তা বোঝাতে চেষ্টা করেছে। উভয় পক্ষই তাদের বক্তব্যের সমর্থনে নানা সু-যুক্তি এবং নানা স্থান থেকে বিবিধ উদাহরণ প্রয়োগ করেছে। আমি উভয় পক্ষের বক্তব্য বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনেছি এবং আমার মনে হয়েছে বাদীপক্ষের বক্তব্যই আমাদের গ্রহণীয়। মানুষ স্বভাবতঃ শান্তি কামনা করে। সে তার পারিবারিক জীবনে শান্তি চায়, রাজনৈতিক জীবনে শান্তি চায়, সমাজ জীবনে শান্তি চায়, আন্তর্জাতিক জীবনেও শান্তি চায়। মানুষের সর্ব কর্মপ্রচেষ্টা শত সহস্র ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে শান্তি পারাবারে মিলিত হবার জন্য। মানুষের সাহিত্য সাধনা, বিজ্ঞান সাধনা, দর্শন সাধনা—সব সাধনাই শান্তির জন্য। অতএব শান্তি আমাদের সকলের কাম্য। কিন্তু তাই বলে এখনই যুদ্ধ বিভাগ দেশ থেকে তুলে দেওয়া সঙ্গত হবে না; সৈনিকদের কৃষিক্ষেত্রে, শিল্প-কারখানায় পাঠিয়ে দেওয়া চলবে না। কারণ, এখনও যুদ্ধবাজরা বেঁচে আছে; দেশ যে কোন সময় আক্রান্ত হতে পারে। আমরা চেষ্টা করবো যুদ্ধকে এড়িয়ে চলবার জন্য। কিন্তু সর্বপ্রকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি যুদ্ধ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে আমরা লড়বো—শান্তির জন্যই লড়বো। কারণ শান্তিই আমাদের একমাত্র কাম্য।

বিতর্কের কয়েকটি সংকেত:

(১) স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পাঠক্রম, হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার পাঠক্রম অপেক্ষা উত্তম।

পক্ষের যুক্তি :

(ক) নতুন পাঠ্যক্রমে পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা (Work Education) যুক্ত হয়েছে।

(খ) বাংলায় এবং অন্যান্য প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে।

(গ) ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে।

(ঘ) প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে।

(ঙ) বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের মুহূর্তে নবপ্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা কালোপযোগী হয়েছে।

বিপক্ষের যুক্তি :

(ক) একাদশ শ্রেণীর পাঠক্রমে উচ্চশিক্ষার ভিত্তি অনেকখানি তৈরী করে দেওয়ার সুযোগ ছিল।

(খ) আগ্রহ এবং রুচি অনুযায়ী পাঠ্যবিষয় নির্বাচনের সুযোগ ছিল।

(গ) সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ ছিল; এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীগণও তাদের আকাঙ্ক্ষিত পথে (ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি) শিক্ষালাভের সুযোগ পেত।

(২) আধুনিক ভারতে ইংরেজী ভাষা এখনও অপরিহার্য।

পক্ষের যুক্তি :

(ক) ইংরেজী আন্তর্জাতিক ভাষা, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হলে এই ভাষার অনুশীলন এবং জ্ঞান অপরিহার্য।

(খ) ইংরেজী ভাষাকে অস্বীকারের অর্থ, আমাদের সভ্যতার অপমৃত্যু। কারণ ইংরেজদের প্রভাবেই আমাদের দেশ সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এমন কি আমাদের জাতীয়তাবোধের উন্মেষেও তাদের দান অস্বীকার করার নয়।

(গ) বাংলা বা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় এখনও পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার জন্য উচমানের গ্রন্থের অভাব।

(ঘ) যে কোন উন্নত দেশের ছাত্রছাত্রীরাই মাতৃভাষা ব্যতীতও আর একটি ভাষা শিক্ষা করে; এদিক থেকে সাহিত্যরসপুষ্ট ইংরেজী ভাষাই গ্রহণীয়।

বিপক্ষের যুক্তি :

(ক) ইংরেজশাসন থেকে মুক্ত হয়েছি আমরা প্রায় তিরিশ বছর হতে চললো। কিন্তু আমাদের দাস-মনোবৃত্তি যে এখনো কাটে নি, তার অন্যতম প্রমাণ, এখনও আমরা ইংরেজী ভাষাকে অপরিহার্য ভাবছি।

(খ) বিদেশী ভাষাটি শিখতেই নতুন শিক্ষার্থীর অধিকাংশ সময় অপব্যয়িত হয়; বিষয়টি আর শেখা হয়ে ওঠে না।

(গ) বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের মধ্যে অপসংস্কৃতি প্রবেশ করে যুগযুগান্তরের শিক্ষা-সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটিয়েছে।

(ঘ) আজকাল বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় উচ্চশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ রচিত হচ্ছে, দর্শন বিজ্ঞান অর্থনীতি সমাজনীতি সংক্রান্ত যথেষ্ট বই লেখা হচ্ছে, তবে এ বিষয়ে আরও সাফল্য লাভ করা যাবে, যদি সরকারের কাছ থেকে অর্থানুকূল্য পাওয়া যায়।

(ঙ) ইংরেজ শাসনে শিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজী ভাষা, কিন্তু বর্তমান স্বাধীন ভারতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে মাতৃস্তন্যের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন; গান্ধীজী বলেছিলেন, 'Among the many evils of foreign rule this flighting imposition of a foreign language upon the youth of the country. will be counted by the history is one of the greatest'.

(চ) শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় শক্তির অপচয় বোধ করতে হলে শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় জীবনের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করতেই হবে; আর তার জন্য প্রয়োজন ইংরেজী ভাষার বন্ধন-মুক্তি।

(৩) নাগরিক জীবন পল্লীজীবন অপেক্ষা সর্বদিকে শ্রেষ্ঠ।

পক্ষের যুক্তি :

(ক) নগরে জীবিকা অর্জনের পথ প্রশস্ততর।

(খ) জীবন ধারণের পক্ষে আবশ্যিক এবং উপযোগী সমস্ত বস্তুই সহজলভ্য।

(অ যাতায়াত ব্যবস্থা ও যোগাযোগের সুবিধা।

(আ) স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল-ডাক্তারখানার প্রাচুর্য।

(ই) বিজলী বাতি ও পাখা একদিকে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে ক্লান্তি অপনোদন করে।

(ঈ) কর্মক্লান্ত মানুষকে আনন্দদান করবার জন্য সিনেমা, থিয়েটার এবং নানা প্রমোদ-উপকরণে প্রাচুর্য।

(গ) নগরজীবন পল্লীজীবনের সংকীর্ণ দলাদলি, কুসংস্কার ও অস্পৃশ্যতা থেকে মুক্ত।

বিপক্ষের যুক্তি :

(ক) স্বাধীনতা-উত্তর বর্তমান পল্লীজীবনে বিরাট এবং ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগের সেই পঙ্কশেষ মশায় পূর্ণ পুষ্করিণীও এখন নেই, নেই কুসংস্কার আর দলাদলিও।

(খ) বর্তমান পল্লীজীবনে যাতায়াত ব্যবস্থা অনেক উন্নত, সরকারী সাহায্যে স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল-ডাক্তারখানা গড়ে উঠছে, পতিত জমি চাষ হচ্ছে, বিদ্যুতের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাচ্ছে।

(গ) পল্লীজীবনে প্রাচুর্য এবং বিলাসিতা না থাক, শান্তি ও চাহিদা পূর্ণ হওয়ার মত উপকরণ আছে।

(ঘ) পল্লীজীবনে শহরের মত জনসংখ্যার স্ফীতি নেই, অবিশ্রান্ত কোলাহল নেই, বিষাক্ত আবহাওয়া নেই,—এমন কি যে বিদ্যুতের জন্য শহরবাসীদের এত গর্ব, আজ ব্যাপক বিদ্যুৎ ছাটাইয়ে গ্রাম-শহরের বিভেদ লুপ্ত হতে বসেছে—কার্যতঃ হাঁপিয়ে ওঠা শহরবাসী গ্রামে ফিরে যেতে চাইছে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যেন আজও স্পষ্ট কানে আসছে: দাও ফিরে সে অরণ্য লহ এ নগর···হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী—দাও সে তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি।

কিংবা মহাত্মাজীর সেই বাণী: Go back to village স্মরণীয়।

(ঙ) নগর জীবনে আজ যেন চতুর্দিকেই কলুষতা আর অপসংস্কৃতি—এখানকার মানুষ আগে খাদ্যে ভেজাল দিত, এখন ওষুধেও দিচ্ছে, যানবাহন ব্যবস্থা বেশ অপ্রতুল, প্রাণ হাতে করে ঝুলে ঝুলে কর্মস্থলে যেতে আসতে হয়, রাস্তা-ঘাট এক একটি মৃত্যু-ফাঁদ। অন্যদিকে প্রকৃতিদেবী এখান থেকে নির্বাসিতা, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনয়-নম্রতা-ভদ্রতা-শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণাবলী অপসারিত, আচারে-আচরণে, পোশাক-পরিচ্ছদে অপসংস্কৃতি বাসা বেঁধেছে। কিসের লোভে মানুষ থাকবে এখানে?

(৪) বর্তমান সর্বজনীন পুজোয় আড়ম্বরেরই মুখ্য স্থান, পুজার্চনার স্থান গৌণ।

পক্ষের যুক্তি:

(ক) পুজোর লক্ষ্য আধ্যাত্মিকতা, কিন্তু বর্তমান সর্বজনীন পুজোয় উল্লাস আর মত্ততারই আধিক্য।

(খ) পুজোটা ব্যক্তিগত ব্যাপার; সর্বজনীনতার মাধ্যমে ভক্তি ও ঐকান্তিকতা আসা কতদূর সম্ভব?

(গ) সর্বসাধারণের নাম করে এবং সাধারণ মানুষের চাঁদায় তথাকথিত অনুষ্ঠান এবং আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে অকারণ অর্থ ব্যয়।

(ঘ) আধুনিক কর্মব্যস্ত নগর-জীবনে এতগুলি উৎসব পালন সময়ের অপব্যবহার মাত্র।

বিপক্ষের যুক্তি:

(ক) বর্তমানে পুজোয় আড়ম্বর মুখ্যস্থান অধিকার করেছে, এ কথা অস্বীকার না করা গেলেও এর জন্য দায়ী সর্বজনীন পুজো নয়।

(খ) সর্বজননীন পুজোর অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অধিকারবোধ এবং গণতান্ত্রিক সঙ্ঘশক্তির প্রতিষ্ঠা।

(গ) এই ধরনের পুজোয় অর্থবল চাই, লোকবল চাই। যেহেতু জমিদার শ্রেণী লুপ্ত, ধনীরা ধর্মবিমুখ, সুতরাং জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা ছাড়া সর্বজনীন পুজো অসম্ভব। সাধারণ গৃহস্থের অর্থবলও নেই, লোকবলও নেই।

(ঘ) এই ধরনের সর্বজনীন পুজো ও আনন্দানুষ্ঠান জটিল এবং সমস্যা-পীড়িত জীবনযাত্রায় মুক্তির আস্বাদ আনে বই কি!

(৫) নতুন সিলেবাসে খেলাধুলার অন্তর্ভুক্তি এক সার্থক সংযোজন।

পক্ষের যুক্তি ঃ

(ক) শিশুরা খেলার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী আনন্দ লাভ করে।

(খ) খেলাধুলার আনন্দের মধ্য দিয়ে শ্রেণীকক্ষের একটানা পাঠের একঘেয়েমি দূরীভূত হয়।

(গ) খেলার মাঠে খেলাধুলার নিয়মকানুন মানতে মানতে ছাত্ররা নিয়মানুবর্তী ও সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠে।

(ঘ) খেলার সময় নিজের টিম পরিচালনা করতে গিয়ে ছাত্ররা যে জ্ঞান লাভ করে পরবর্তী জীবনে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে তার ফল পায়। যে ভাল ক্যাপ্টেন ছিল, সে হয়তো ভবিষ্যৎ জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বের অধিকারী হয়।

(ঙ) খেলাধুলার মধ্য দিয়ে ছাত্ররা খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি অর্জন করে; জয় এবং পরাজয়কে সমান ভাবে গ্রহণ করতে শেখে। কর্মজীবনে এ শিক্ষা তাদের সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ সর্ব অবস্থায় শান্ত রাখে।

(চ) খেলাধুলার মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শরীর চর্চা হয়। নিয়মিত শরীর চর্চা স্বাস্থ্য ভাল রাখে। স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।

(ছ) সিলেবাসে খেলাধুলার অন্তর্ভুক্তির ফলে ছাত্রছাত্রীরা মানসিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উৎকর্ষ লাভ করে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা লাভ করতে পারবে। সুতরাং এটা সিলেবাসে সার্থক সংযোজন।

বিপক্ষের যুক্তি ঃ

(ক) ছাত্রছাত্রীরা যেটুকু লেখাপড়া করে, খেলাধুলায় মেতে তাও করবে না।

(খ) অত্যধিক খেলাধুলায় স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কোন কোন খেলায় সময় সময় হাত-পা ভাঙ্গে।

(গ) খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ে একদল ছাত্রের সঙ্গে অন্যদলের ঝগড়া ও মারামারি হয়। এক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে অন্য বিদ্যালয়েব ছাত্রদের ঝগড়া ও মারামারির সম্ভাবনাও থাকে।

(ঘ) শক্তিমান খেলোয়াড়-ছাত্ররা পড়াশুনায় ভাল না হয়েও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাণ্ডা হয়।

(ঙ) খেলাধুলার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করে।

(চ) অতিরিক্ত খেলাধুলা পড়াশুনার ক্ষতি করে।

(৬) বিভিন্ন বিষয়ের পাঠক্রমে মৌখিক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্তি ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সহায়ক।

পক্ষের যুক্তি ঃ

(ক) মৌখিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষকশিক্ষিকার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে

খুব অল্প সময়ের মধ্যে উত্তর দিতে হয়। এতে তাদের ভয় ও জড়তা কাটে। কি ভাবে মান্য ব্যক্তিদের সামনে চলতে ফিরতে হয়, দাঁড়াতে হয়, কথা বলতে হয়, তা তারা শেখে।

(খ) প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিকশিত হয়।

(গ) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ্য বিষয় আয়ত্ত করতে হয় ; ফলে জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটে।

(ঘ) মুখস্থবিদ্যা ও লিখিত পরীক্ষার উপর নির্ভরশীলতা কমে।

(ঙ) পরীক্ষার হলে দুর্নীতি করার প্রবণতা হ্রাস পায়।

বিপক্ষের যুক্তি :

(ক) অতি অল্প সময়ে মুখে মুখে দু'চারটে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, কোন পরীক্ষার্থীর জ্ঞান পরিমাপ করা যায় না।

(খ) যারা লাজুক, তারা ভাল ছাত্রছাত্রী হয়েও সত্ত্বেও মৌখিক পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(গ) মৌখিক পরীক্ষায় পক্ষপাতিত্বদোষ দেখা দিবার সম্ভাবনা বিদ্যমান।

(ঘ) বহুসংখ্যক ছাত্রের সুষ্ঠু পরীক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

(ঙ) ছাত্রছাত্রীদের অযথা ভয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়।

(৭) চলচ্চিত্র শিক্ষার সুন্দরতম বাহন।

পক্ষের যুক্তি :

(ক) চলচ্চিত্র শিশুর চক্ষু ও কর্ণ—একসঙ্গে দুই ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে বলে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিশু একই সঙ্গে শুনে ও দেখে শিখতে পারে।

(খ) যে বিষয় বইয়ে পড়ে বা স্কুলে পড়ানো সত্ত্বেও ভালভাবে বুঝতে পারা যায় না, সিনেমায় দেখে তা অনায়াসে বোঝা যায়। যেমন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার, হিমবাহ, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি ; মহাকাশ অভিযানের মত দুরূহ বিষয় চলচ্চিত্রের মাধ্যম ছাড়া শ্রেণীকক্ষে বোঝানো মোটেই সম্ভব নয়।

(গ) পৃথিবীর দূর দূরান্তরের দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানুষের জীবনযাত্রা প্রভৃতিও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে চোখের সামনে দেখা যায়।

(ঘ) ঐতিহাসিক পুরুষদের জীবন-কাহিনী চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে।

(ঙ) স্বনামধন্য শিক্ষকগণের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানের ছবি তুলে স্কুলে স্কুলে দেখালে ছাত্রছাত্রীরা আনন্দের সঙ্গে দুরূহ বিষয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের কাছে শিখতে পারে।

(চ) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যদি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হত, তবে শ্রেণীকক্ষের পাঠের একঘেয়েমি থেকে ছাত্রছাত্রীরা মাঝে মাঝে মুক্তি পেত এবং আনন্দের সঙ্গে কঠিন কঠিন বিষয় আয়ত্ত করতে পারত।

(ছ) শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন হিসেবে নয়, গণ-শিক্ষার বাহন হিসেবেও চলচ্চিত্রের স্থান অতি উচ্চে। নিরক্ষর লোকদের শিক্ষা দেওয়া যায় ; স্বাক্ষর লোকদেরও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, জাতি, ঘটনা, যুদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভে সাহায্য করা যায়।

বিপক্ষের যুক্তি :

(ক) চলচ্চিত্রকে শিক্ষার বাহন করলে ছাত্রছাত্রীরা সিনেমা দেখায় অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।

(খ) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যা শিখবে তা তাদের মনে দীর্ঘস্থায়ী কোন প্রভাব রাখবে না; কারণ ছাত্রছাত্রীদের তো চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণে নিজেদের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হয় না।

(গ) অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে শিক্ষকগণের চক্ষুর অন্তরালে বসে তারা আরও পাকা হুল্লোড়-বাজ হয়ে উঠবে এবং স্কুলের নিয়ম শৃঙ্খলা নষ্ট করবে।

(ঘ) বিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখে যখন আর মন ভরবে না, তখন তারা ছুটবে বাইরের সিনেমা হলে এবং ছাত্রজীবনে সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা দেখার যা কুফল সবটাই ছাত্রদের মধ্যে ফলবে।

(৮) **শিক্ষার বর্তমান দুরবস্থার জন্য ছাত্ররাই দায়ী।**

পক্ষের যুক্তি :

(ক) ছাত্ররা বর্তমানে দলীয় রাজনীতির সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, দলের প্ররোচনায় তারা তাদের বিদ্যালয়ের ভিন্ন মতাবলম্বী ছাত্রদের বা শিক্ষকদের চরম অমর্যাদা করতে পর্যন্ত দ্বিধা বোধ করে না।

(খ) রাজনৈতিক দলের জন্য মিছিল করতে, পোস্টার মারতে, চাঁদা তুলতে, মারামারি করতে, কিংবা পালিয়ে থাকতে তাদের এত সময় যায় যে, তারা আর স্কুলে আসবার ও পড়বার সময় পায় না। এর ফলে পড়াশুনো বন্ধ। পরীক্ষার হলে গণটোকাটুকি।

(গ) স্কুলে এসে একদল ছাত্রের সঙ্গে অপর দলের ছাত্রদের তর্কাতর্কি, বাদপ্রতিবাদ, ঝগড়াঝাঁটিই চলতে থাকে, ক্লাস করা আর হয় না।

(ঘ) ছাত্ররা বিদ্যালয়কে হৈ-হুল্লোড় আর মারামারির আখড়া করেছে।

(ঙ) বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বর্তমান ছাত্রগণের কাছে একটা উপহাসের বস্তু।

বিপক্ষের যুক্তি :

(ক) শিক্ষার দুরবস্থার জন্য ছাত্ররা দায়ী নয়, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও দেশের পরিস্থিতিই দায়ী।

(খ) যারা সমাজে বিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে চায়, সেই সব লোকদের সাহায্যে কোন কোন রাজনৈতিক দল ছাত্রদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ইন্ধন যুগিয়ে থাকে। কোন কোন দল আসে শান্তির বুলি নিয়ে, কোন কোন দল আসে বিপ্লবের আওয়াজ দিতে দিতে।

(গ) বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি ও শিক্ষক মহাশয়গণের মধ্যে দলাদলিও বিদ্যালয়ের পড়াশুনায় অবনতি ঘটায়।

(৯) পরীক্ষাকেন্দ্রে অসদ্‌পায় অবলম্বন রোধ করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন।

পক্ষের যুক্তি :

(ক) বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে যার মুখস্থ শক্তি যত বেশী, সে তত ভাল ছাত্র ; তার পরীক্ষার ফল তত ভাল। যতই বুঝুক, যতই পড়াশুনা করুক, যদি মুখস্থ করতে না পারলো, তবে পরীক্ষার ফল খারাপ হবেই। তাই ছাত্রদের মধ্যে দেখা দেয় অসদুপায় গ্রহণের প্রবণতা। মুখস্থ যখন হচ্ছে না, মাথায় করে যখন নিতে পারলাম না, পকেটে করেই নেব। সুতরাং এই পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন চাই।

(খ) এমন পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে, যাতে সারা বছরের অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা একদিন পরীক্ষার হলে বসে তিন ঘণ্টার মধ্যে দিতে না হয়। সপ্তাহের পড়ার পরীক্ষা যেন সপ্তাহ শেষেই লিখিতভাবে হয়ে যায়। 'বাড়ীর কাজের' উপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মাসে মাসে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বার্ষিক পরীক্ষার সময় ছাত্রছাত্রীর সারা বছরের হোমটাস্ক, প্রাকটিকাল খাতা, সাপ্তাহিক পরীক্ষায় নম্বর, খেলাধুলায় যোগদানের রেকর্ড, আচরণ, নিয়মশৃঙ্খলা প্রভৃতির রিপোর্ট পর্যালোচনা করে প্রমোশন দেওয়া হবে।

(গ) পরীক্ষা পদ্ধতি বদল করলে কেবলমাত্র পরীক্ষা কেন্দ্রের অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতাই কমবে না, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ প্রভৃতিও বৃদ্ধি পাবে।

বিপক্ষের যুক্তি :

(ক). পরীক্ষা পদ্ধতি বদলালেই পরীক্ষা কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা কমবে না ; কারণ অসদুপায় অবলম্বন আমাদের সামাজিক ব্যাধি। সে ব্যাধির প্রভাব ছাত্রদের উপরও পড়েছে।

(খ) ভালভাবে লেখাপড়া করে, পরীক্ষায় ভাল ফল করেও যখন ছেলেরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে না, এই চিত্র দেখে পরবর্তী ছাত্রদের মধ্যে হতাশা আসে, তারা পড়াশুনা করে না, পরীক্ষায় পাশ করার জন্য অসদুপায় অবলম্বন করে।

(গ) ভাল পড়াশুনা করে ভাল ফল করে, ভাল চাকুরি পাওয়া যাবে—যখন এমন অবস্থা হবে, তখনই কেবল পরীক্ষা কেন্দ্রে দুর্নীতি বন্ধ হবে।

(ঘ) বেকার সমস্যার সমাধান হলে পরীক্ষার হলেও আর অসদুপায় থাকবে না।

(ঙ) পরীক্ষা কেন্দ্রের অসদুপায় অবলম্বন সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হলে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

(১০) যুদ্ধ ও পৃথিবীর যুদ্ধজনিত দুর্দশার জন্য বিজ্ঞানই দায়ী।

পক্ষের যুক্তি :

(ক) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে আণবিক বোমা ও আণবিক অস্ত্র যুদ্ধের ভয়াবহতা অনেকগুণ বর্ধিত করেছে।

(খ) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃত্রিম উপায়ে বাজার সৃষ্টি করবার জন্য যুদ্ধ ও অশান্তিকে উসকিয়েও প্ররোচিত করা হচ্ছে।

(গ) বিমান, বেতার, রকেট, মিসাইল প্রভৃতির সাহায্যে মানুষ খুব সহজে বহুদূর দেশও আক্রমণ করতে পারে।

(ঘ) কোন জাতিরই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবার উপায় নেই।

বিপক্ষের যুক্তি :

(ক) সমস্ত দুর্দশার মূলে মানুষের তথা জাতির লোভী মন। বিজ্ঞান মানুষের অশেষ কল্যাণ করেছে, কিন্তু কতকগুলি স্বার্থপর দুরাত্মার হাতে আজ বিজ্ঞানের শক্তির এমন মারাত্মক অপব্যবহার হচ্ছে যে পৃথিবীর সমস্ত দেশে হাহাকার উঠেছে। এর জন্য বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানী দায়ী নয়, দুষ্টবুদ্ধি রাষ্ট্রনায়কেরা, অর্থলোভী ব্যবসায়ীরা ও সাম্রাজ্যবাদীরা দায়ী।

(খ) বরং বিজ্ঞানীরা মানুষের মঙ্গলের জন্য, মানবজাতির উন্নতির জন্য অবিরাম সাধনা করছেন। অতএব বিজ্ঞানকে যারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপব্যবহার করছে তারাই যুদ্ধের জন্য ও পৃথিবীর বর্তমান দুর্দশার জন্য দায়ী।

উপরের উদাহরণগুলি অবলম্বন করে ছাত্রছাত্রীরা 'বিতর্ক' অভ্যাস করবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, তাদের বক্তব্য যেন নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং তাদের প্রকাশ ক্ষমতা ও বাচনভঙ্গী যেন মনোমুগ্ধকর হয়।

॥ উত্তর দাও ॥

১। 'বিতর্ক' বলতে কি বোঝ? বিতর্কে অংশগ্রহণকারীকে কোন্ কোন্ নিয়ম পালন করে চলতে হয়? বিতর্কে সাফল্যলাভ করতে গেলে কোন্ কোন্ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে?
[উ : পৃঃ ১১৫—১১৭]

২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিতর্ক কর :
বিতর্ক সভার মতে :

(ক) আধুনিক জীবনে শিক্ষার সুন্দরতম বাহন চলচ্চিত্র।
[উঃ পৃঃ ১৩৩—১৩৪]

(খ) বিভিন্ন পাঠ্যক্রমে মৌখিক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্তি:ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।
[উঃ পৃঃ ১৩২—১৩৩]

(গ) বর্তমানে নতুন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সিলেবাস্ প্রবর্তন সময়োপযোগী হয়েছে।

(ঘ) আধুনিক ভারতে ইংরেজী ভাষা এখনও অপরিহার্য।
[উঃ পৃঃ ১২৯-১৩০)

(ঙ) নাগরিক জীবন পল্লীজীবন থেকে সর্বদিকে শ্রেষ্ঠ।
[উঃ পৃঃ—১৩০-৩১]

(চ) বর্তমান সর্বজনীন পূজায় আড়ম্বরেরই মুখ্যস্থান, পূজার্চনার স্থান গৌণ।
[উঃ পৃঃ—১৩১]

(ছ) নতুন সিলেবাসে খেলাধুলার অন্তর্ভুক্তি এক সার্থক সংযোজন।
[উঃ পৃঃ—১৩২]

(জ) শিক্ষার বর্তমান দুরবস্থার জন্য ছাত্ররাই দায়ী।
[উঃ পৃঃ—১৩৪]

(ঝ) যুদ্ধ ও পৃথিবীর যুদ্ধজনিত দুর্দশার জন্য বিজ্ঞানই দায়ী।
[উঃ পৃঃ—১৩৫-৩৬]

(ঞ) বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি ছাত্রছাত্রীদের অসদুপায় অবলম্বনে বাধ্য করে।
[উঃ পৃঃ—১৩৫]

৩। নিম্নোক্ত বিতর্কগুলি অভ্যাস কর ঃ

বিতর্ক সভার মতে ঃ

(ক) কলকাতার যানবাহন সমস্যা মানুষকে নিয়মনিষ্ঠ হতে বাধা দিচ্ছে।

(খ) ব্যাপক এবং নৈত্যনৈমিত্তিক বিদ্যুৎ ছাঁটাই (load-shading) ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার প্রধান কারণ।

(গ) দাবি আদায়ের একমাত্র পথ ধর্মঘট।

(ঘ) নব প্রবর্তিত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য কর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা।

(ঙ) ঋতুর রানী বর্ষা।

(চ) গণতন্ত্রই একমাত্র সার্থক শাসন ব্যবস্থা।

(ছ) বিজ্ঞান অপেক্ষা সাহিত্য মূল্যবান।

(জ) ছাত্র বিক্ষোভের অন্যতম কারণ বেকার সমস্যা।

(ঝ) স্বদেশের ইতিহাস পাঠ্যক্রমের অপরিহার্য সংযোজন।

(ঞ) বর্তমান পৃথিবীব্যাপী হতাশার যুগে চন্দ্রাভিযানে কোটি কোটি টাকার অপব্যয় মারাত্মক অপরাধ।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ কথোপকথন ॥

কথোপকথন বলতে কি বোঝায় :

মানুষ সামাজিক জীব। সে একা থাকতে পারে না। সমাজজীবনে বাস করতে গেলে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতেই হয়। 'কথন' এবং 'উপকথন', প্রশ্ন-উত্তর, উত্তর-প্রত্যুত্তর এই সব নিয়েই গড়ে ওঠে পারস্পরিক আলাপ-পরিচয়, বেড়ে ওঠে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে নিজের জ্ঞান।

সুতরাং একাধিক ব্যক্তি যখন বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে কোন বিষয় অবলম্বন করে তাদের বক্তব্য, মতামত এবং ভাবের আদান-প্রদান করে তখন তাকেই আমরা কথোপকথন বলতে পারি। অবশ্য এই 'কথোপকথন কাজটি দৈনন্দিন জীবনে আমরা সর্বদাই করে থাকি— বাবা, মা, ভাই বোনের সঙ্গে কিংবা শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে, বন্ধুবান্ধব বা প্রতিবেশীর সঙ্গে। সাধারণ ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট বিষয় অবলম্বন করে হয়তো কথোপকথন শুরু হলো, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই অ প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলো—আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা এ রকম ব্যাপার ঘটতে দেখে থাকি। সুতরাং দৈনন্দিন জীবনে সময়কাটানো অসারকথার (loose talks) ক্ষেত্রে কোন নিয়ম-কানুন মেনে চলা সম্ভব নয়—উচিতও নয়।

তবে 'কথোপকথন প্রস্তুতি'র ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। 'পরীক্ষা আছে' কথাটা ভাবলেই সবকিছু স্বতন্ত্র একটা মূল্য পেয়ে যায়। বাংলা মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষক যখন একটি বা দুটি ছাত্র বা ছাত্রীকে ডেকে কথোপকথন করবার জন্য একটি নির্দিষ্ট বিষয় ঠিক করে দেবেন, তখন তো আর এলোপাথাড়ি যা-মনে-আসে গোছের কথাবার্তা শুরু করা চলবে না। অতএব প্রস্তুতি প্রয়োজন। আমরা দেখি আন্তরিক প্রস্তুতি, অভ্যাস, আর অনুশীলন সব কিছুকেই ধীরে ধীরে সহজ করে দেয়।

শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করে। শৈশবের কথাবার্তা কোন ধরাবাঁধা নিয়ম মেনে চলে না। তারা নিয়ম মানুক না মানুক সে বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করি না। একটি পাঁচ ছ' বছরের ছেলে অক্লেশে ছোট বড় সকলকেই 'তুমি' বলে সম্বোধন করছে, অপরিচিত লোককেও 'আপনি' বলছে না, এমন কি অপরিচিত কোন মানুষের কাছে এটা চাই, ওটা দাও বলে আবদার করছে। কিন্তু একটি চৌদ্দ বৎসরের তরুণ কিংবা পনেরো বৎসরের তরুণীর কাছে কি আমরা এ জাতীয় ব্যবহার বা কথোপকথন আশা করব? নিশ্চয়ই নয়।

কথোপকথনের রীতি ও পদ্ধতি :

কাজেই কথোপকথনের নিশ্চয়ই কিছু নিয়ম আছে।

গুরুজন এবং বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা যে কোন সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তার সময় 'আপনি' সম্বোধন ব্যবহার করতেই হবে। বাবা মা-র সঙ্গে কথা বলার সময় 'তুমি' ব্যবহার করলেও বিনীত ভাবটি বজায় রাখতে হবে। বন্ধুবান্ধব বা অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠজনের

সঙ্গে 'তুমি' বা 'তুই' ব্যবহারই স্বাভাবিক। তবে বয়সের ও পরিচয়ের মাত্রা বা গুরুত্ব দেখে ঠিক করে নিতে হবে 'আপনি' 'তুমি' না 'তুই' বলা হবে।

কথোপকথন যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে যে কোন ব্যক্তিরই হতে পারে ; যে কোন বিষয়ই এই কথোপকথনের অঙ্গীভূত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শ্রদ্ধা, ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবার সময় শ্রদ্ধা এবং বিনতির ভাব, অনুজদের ক্ষেত্রে সস্নেহ ভাব, এবং সমবয়স্কদের সঙ্গে

কথোপকথনের সময় প্রীতির সুর ফুটে ওঠা চাই। আর সর্বদা লক্ষ রাখতে হবে যার সঙ্গে কথা বলছি তার বয়স, সামাজিক প্রতিষ্ঠা আর আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধের গভীরতা কতটুকু।

কথা বলবার সময় এমন ভাবে ভাষা প্রয়োগ করতে হবে, যাতে যার সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে, কোন ক্রমেই তার মর্যাদা বা আত্মসম্মানে আঘাত না লাগে। এই ক্ষেত্রে শালীনতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী। অশ্লীল শব্দ ব্যবহার বা অনাবশ্যক রূঢ় বাক্য ব্যবহারও বর্জন করতে হবে। একটি রিক্সাওয়ালার সঙ্গে ভাড়ার রফা করতে গিয়ে, মাঝির কাছে নৌকো সারাবার সময়, কিংবা বাজারে গিয়ে মাছের দরাদরির মুহূর্তে তাদের তুমি 'তুমি' বলে

সম্বোধন করতে পারো। (কোনো ক্ষেত্রেই 'তুই' নয়, 'আপনি' সম্বোধনও বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে), কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই ওদের আত্মমর্যাদায় আঘাত করা চলবে না। মনে রাখতে হবে, যিনি যে কর্মেই নিয়োজিত থাকুন, যার যে জীবিকাই হোক, প্রত্যেকরই আত্মসম্মান আছে। আর সম্মান করতে না জানলে সম্মান ফিরে পাওয়া যায় না।

সার্থক কথোপকথনের কয়েকটি নিয়ম ঃ

সার্থক কথোপকথনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি স্মরণে রাখা প্রয়োজন ঃ

(এক) যারা কথোপকথনে অংশগ্রহণ করবে, তারা প্রত্যেকে **কথ্য ভাষায়** তাদের সংলাপ বলবে ; পুস্তকে ব্যবহৃত ভাষা বা সাহিত্য-গন্ধী সংলাপ এক্ষেত্রে অচল।

(দুই) সংলাপ চরিত্রের মুখশ্রী। সুতরাং লক্ষ্য রাখতে হবে বক্তার **ব্যক্তিত্ব এবং বিশেষ চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য** যেন তার সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। একজন শিক্ষক নিশ্চয়ই আশিক্ষিতের মতো কথা বলবেন না, আবার চিকিৎসক চিকিৎসকের মতোই কথা বলবেন, রিক্সাওয়ালা কথা বলবে তার মতোই।

(তিন) **সাবলীলতা** সংলাপের অন্যতম প্রধান লক্ষণীয় বস্তু। বক্তার চিন্তাধারা যেন সহজ ভঙ্গিতে স্বাভাবিক যুক্তির পথ ধরে তার মুখে নেমে আসে।

(চার) কথোপকথন বক্তৃতা নয়, আলোচনাও নয়। সুতরাং প্রত্যেকের **সংলাপ ছোট** হবে, উত্তর দানও দ্রুত হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, একজন বক্তা যেন দীর্ঘকাল ধরে তার বক্তব্য না বলে পক্ষান্তরে উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা সমান ভাবে ভাগ করে নিতে হবে।

(পাঁচ) পারস্পরিক **শ্রদ্ধা, বিনীত, স্নেহ, প্রীতি, নম্রতা ও ভদ্রতা** (যে ক্ষেত্রে যেটির প্রয়োজন) যেন উভয়ের কথাবার্তার মধ্যে সর্বদা বজায় থাকে. কথোপকথনের সময় সর্বদা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ছয়) মতপার্থক্য হলেও কথোপকথনকে কখনও **ব্যক্তিগত আক্রমণের** পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না ; সর্বপ্রকার অশালীন কথাবার্তা, আত্মসম্মানে আঘাতকারী ভাষা বর্জন করতে হবে।

(সাত) কথোপকথনকে বাস্তব এবং আকর্ষণীয় করতে হলে সংলাপে—**কথা বলার ভঙ্গীতে বৈচিত্র্য** আনতে হবে। এই বৈচিত্র্য আনয়নের সহজ উপায়-কথা বলতে বলতে বার বার বিস্ময় প্রকাশ, প্রশ্নাত্মক ভঙ্গী আনয়ন, অপরের বক্তব্য অনুমান করে মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিয়ে, তার বাক্যাংশ পূরণ করা ইত্যাদি।

কথোপকথন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঃ

(এক) কথোপকথন পদ্ধতি ভাল হলে **বক্তব্য আকর্ষণীয়** হয় : **চিন্তাধারায় সাবলীলতা** আসে।

(দুই) কথোপকথন পদ্ধতি ভাল হলে, পরিবারে, বিদ্যালয়ে, ক্লাবের সভায়, ক্লাবের আড্ডায় সর্বত্র অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়।

(তিন) পরবর্তী সময়ে কর্মজীবনে ভাল কথোপকথনের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে এবং সহকর্মীদের কাছে **সমাদর লাভ** করা যায়।

(চার) অপরিচিত পরিবেশে অপরিচিত লোকদের সঙ্গে কথা বলার ভয় দূর হয় এবং ভাল বাচনভঙ্গির গুণে অপরিচিতদের আকৃষ্টও করা যায়।

কয়েকটি কথোপকথনের নিদর্শন

এবার কথোপকথনের কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে :

(১) বাড়ির পরিচারিকা ও গৃহকর্ত্রীর মধ্যে কথোপকথন :

(বিখ্যাত লা মিসারেবল্ নাটকের কিছু অংশ অনুবাদ করে দেখানো হচ্ছে।)

বিশপের বোন পারসোমে এবং পরিচারিকা মেরি রান্নাঘরে ব্যস্ত। উনুনে ঝোল চড়ানো —মেরি নাড়াচাড়া করছে, পারসোমে টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন :

পারসোমে। মেরি, ঝোলটা এখনো ফুটলো না ?

মেরি। এখনও ফোটে নি, মা।

পারসোমে : এতক্ষণ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তুমি উনুনটা ঠিক মতো দেখোনি।

মেরি। কিন্তু মা, আপনিই তো উনুনে আগুন দিয়েছিলেন।

পার। মুখে মুখে তর্ক করো না। ভীষণ খারাপ অভ্যেস!

মেরি। আচ্ছা, মা।

পার। এই নিয়ে আর যেন তোমাকে বলতে না হয়।

মেরি। না, মা।

পার। আশ্চর্য, দাদা যে কোথায় গেল এগারোটা বেজে গেছে, এখনো তার দেখা নেই। মেরি

মেরি। বলুন, মা।

পার। আচ্ছা, মঁসিয়ে বিশপ কি আমাকে কোন খবর দিতে বলে গেছেন ?

মেরি। না, মা।

পার। উনি কোথায় তা' কি তোমায় বলে গেছেন ?

মেরি। হ্যাঁ, মা।

পার। 'হ্যাঁ মা' (অনুকরণ করে)। তাহলে এতক্ষণ আমাকে বলো নি কেন, বোকা কোথাকার

মেরি। আপনি তো আমায় জিজ্ঞেস করেন নি, মা।

পার। আমাকে না জানানোর এটা কোন কারণই নয়। তাই নয় কি ?

মেরি। আজ সকালেই তো আপনি আমাকে বকবক করতে বারণ করলেন ; তাই ভাবলাম—

পার। ও, তুমি ভাবলে! ইস্

মেরি। হ্যাঁ, মা।

পার। তোতাপাখির মতো খালি 'হ্যাঁ মা', 'হ্যাঁ মা' করো না।

মেরি। না, মা।

পার। আচ্ছা, মঁসিয়ে কোথায় গেছেন, তোমাকে বলেছেন ?

মেরি। আমার মা'র কাছে, মা।

পার। তোমার মার কাছে! আশ্চর্য! কিন্তু কেন?

মৌব। মা কেমন আছে, গাঁসিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন—আমি বললাম, মার মনটা ভালো নেই...

পাব। তুমি বললে, তার মন ভালো নেই! ব্যাস অমনি আমার ভাই রাত্তিরের খাবার না খেয়ে, না ঘুমিয়ে চলে গেল। কারণ—তোমার মার মন খারাপ! সত্যিই আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ!

বিরাট একটি নাটকের দৃশ্যাংশ এটি। কিন্তু নাট্যকারের সংলাপ রচনার বৈশিষ্ট্যের গুণে দুটি চরিত্রই স্বল্প কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

(২) মফস্বল শহরের রেলওয়ে স্টেশনে কয়েকজন লোক ট্রেনের অপেক্ষায় বসে আছেন। এদের মধ্যে দুজন অপরিচিত যাত্রীর মধ্যে কথোপকথন ঃ

১ম যাত্রী। (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) সাড়ে তিনটায় গাড়ি ইন করবার কথা। তিন ক্রোশ দূর থেকে দুপুরের রোদের মধ্যে দৌড়ে এলাম। এখন দেখছি গাড়ি লেট!

২য় যাত্রী। আর মশায় বলছেন কেন? গাড়ি তো দৈনিক লেট। আমি তো এই শহরেই থাকি; কাজকর্মে প্রায়দিনই এদিক সেদিক যেতেও হয়। ট্রেন দৈনিক লেট দৈনিক লেট। কোথাও সময় মত পৌঁছোবার উপায় নেই।

১ম যাত্রী। তা যা বলেছেন। আমার ভাগ্য, মাঝে মাঝে ছাড়া আমাকে গাড়ির মুখ দেখতে হয় না।

২য় যাত্রী। মশায়ের নিবাস?

১ম যাত্রী। কেয়াতলা গ্রাম, এখান থেকে তিন ক্রোশ উত্তরে।

২য় যাত্রী। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি চিনি। আমি বছর দুয়েক আগে আপনাদের গাঁয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। চৌধুরীদের বড় পুকুরে। (কথা বলতে বলতে ডিসট্যান্ট সিগনালের দিকে তাকালেন)।

১ম যাত্রী। আমাদের বাড়ি চৌধুরী বাড়ির দক্ষিণে পোটাক পথ হবে। আর দাদা, দেখছেন কি? গাড়ির পাত্তা নেই; কিন্তু ব্যাটারা সিগনাল দিয়ে রেখেছে।

২য় যাত্রী। রেল ধর্মঘটের সময় থেকেই এ গোলমাল আরও বেড়ে গেছে।

১ম যাত্রী। তা বাড়বে না! কর্মচারীদের অসন্তুষ্ট রেখে দাদা কোন কিছু ঠিকমত চালানো যায় না। সে নিজের খামারই হোক, আর রেলগাড়িই হোক।

২য় যাত্রী। তা যা বলেছেন। কিন্তু এই সাদা কথা বোঝে কে? আরে, ট্রেনের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।

(এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে নিজ নিজ মালপত্রের দিকে যেতে যেতে)

আরে মশায়। আপনার নামটাই তো জানা হলো না। যদি আবার আপনাদের গাঁয়ে মাছ ধরতে যাই।

১ম যাত্রী। শ্রী অনাথবন্ধু রায়। যাবেন নিশ্চয়। আপনার বাপ মায়ের আশীর্বাদে আমারও ছোট একটা পুকুর আছে। আপনার মাছ ধরার নেমন্তন্ন রইলো। মশায়ের পরিচয়টা—

২য় যাত্রী। শ্রীহলধর বসাক। 'মধুসূদন বস্ত্রালয়'—কাপড়ের দোকান আমাদের। আসবেন। (ট্রেন এসে পড়লো। দুজনে দু কামরায় উঠে পড়লেন)

[এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হলো, গ্রামের লোকেরা কত তাড়াতাড়ি অপরিচিত লোকদের সঙ্গে অপরিচয়ের ব্যবধান দূর করে আপন হয়ে যায়।]

(৩) গ্রামের ছেলে নতুন কলকাতায় এসেছে। অপরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার কথোপকথন :

জনৈক ছাত্র। মশায় শুনছেন?

জনৈক ভদ্রলোক। আমাকে বলছো?

ছাত্র। হ্যাঁ। গোলদীঘিটা কোথায় বলতে পারেন?

ভদ্রলোক। তুমি কি নতুন এসেছো বুঝি?

ছাত্র। হ্যাঁ, আমি আজই সকালে আমার দাদার বাড়ীতে এসেছি

ভদ্রলোক। দাদার বাসাটা কোথায়?

ছাত্র। এই কাছেই শ্রীরাম ঘোষ স্ট্রীট।

ভদ্রলোক। তুমি কি গোলদীঘিতে যাবে না অন্য কোথাও যাবে?

ছাত্র। আমি শুনেছি গোলদীঘির পশ্চিম দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তর দিকে হিন্দু স্কুল ও সংস্কৃত কলেজ। আমি সংস্কৃত কলেজটি দেখতে চাই।

ভদ্রলোক। (অঙ্গুল দিয়ে একটি বাড়ি দেখিয়ে)—ঐ যে বিশাল বাড়িটি দেখছো, ঐটিই হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। হ্যাঁ, ভাল কথা তুমি কি স্কুলে পড়ো?

ছাত্র। হ্যাঁ আমি এবার ক্লাস নাইনে পড়ছি। সামনের বছর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবো।

ভদ্রলোক। সংস্কৃত কলেজ দেখতে চাইছো কেন?

ছাত্র। ওখানে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পড়াশুনা করেছেন এবং ওখান থেকেই 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়েছেন। আমার তাই অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা ছিল, কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজটি দেখবো।

ভদ্রলোক। তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমি তোমাকে সব দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে দেখাচ্ছি মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের মূর্তি।

[ভদ্রলোক ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে কিছুটা অগ্রসর হলেন। কিছুদূর যাবার পর ডানদিকে একটি মূর্তির দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন।]

ঐ দেখ ডেভিড হেয়ারের মূর্তি।

ছাত্র। মূর্তির কাছে যাওয়া যায় না?

ভদ্রলোক। যায় বৈকি! চলো।

[এই বলে ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে ভদ্রলোক ডেভিড হেয়ারের মূর্তির কাছে গেলেন। ছেলেটি ভক্তিভরে হেয়ার সাহেবকে অভিবাদন করল।]

হেয়ার স্কুলের নাম শুনেছো?

ছাত্র। শুনেছি বৈকি।

ভদ্রলোক। ঐ হেয়ার স্কুল। আর রাস্তার পূর্বদিকে যে বড় বাড়িটি দেখছ, ওটা হলো হিন্দু স্কুল।

ছাত্র। প্রেসিডেন্সী কলেজটি কোথায় স্যার ?

ভদ্রলোক। আমরা প্রেসিডেন্সী কলেজ পার হয়ে এসেছি। ঐ দেখ পেছনে প্রেসিডেন্সী কলেজ। আর ঐ যে সামনে বিরাট আকাশচুম্বী অট্টালিকা দেখছো ওই হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ছাত্র। এবার আমাকে সংস্কৃত কলেজটা দেখিয়ে দিন না।

ভদ্রলোক। তা দিচ্ছি। তবে সংস্কৃত কলেজ দেখার আগে গোলদীঘি আর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তিটি দেখবে চলো।

[ভদ্রলোক তখন ছেলেটিকে সঙ্গে করে কলেজ স্কোয়ারের গেটের সামনে গেলেন।]

ঐ দেখ তোমার সামনেই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিমূর্তি।

[ছেলেটি সেই মর্মর মূর্তির সামনে এগিয়ে গিয়ে ভক্তিভরে ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রণাম করলো।]

ছাত্র। এইটিই বুঝি গোলদীঘি ?

ভদ্রলোক। হ্যাঁ। আর ঐ দেখ উত্তর দিকে সংস্কৃত কলেজ।

ছাত্র। ওখানে যাওয়া যায় না ?

ভদ্রলোক। কেন যাবে না। তবে ওখানে যেতে হলে বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট দিয়ে যেতে হবে। চলো তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

[ভদ্রলোক তখন ছেলেটিকে সঙ্গে করে সংস্কৃত কলেজে নিয়ে গেলেন। সেখানে প্রবেশ করতেই একজন দারোয়ান তাঁকে অভিবাদন করলো।]

এই দেখ সংস্কৃত কলেজ।

ছাত্র। আপনি কি এই কলেজের অধ্যাপক ?

ভদ্রলোক। কি করে বুঝলে ?

ছাত্র। দারোয়ান আপনাকে নমস্কার করলো দেখে আমার এ কথা মনে হলো।

ভদ্রলোক। তুমি ঠিকই অনুমান করেছ।

[ছেলেটি তখন হেঁট হয়ে ভদ্রলোককে প্রণাম করলো।]

ভদ্রলোক। আশীর্বাদ করি তুমি মানুষের মতো মানুষ হও।

[এই আলোচনায় গ্রাম্য ছাত্রটির শিক্ষক, অধ্যাপক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠেছে।]

(৪) **শিক্ষকমশাইয়ের প্রতি অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছে একজন ছাত্র। সে এবং তার এক বন্ধুর মধ্যে কথাবার্তা :**

কেশব—এই শোন !

অলোক—কি বলছিস শীগগির বল, আমার তাড়া আছে।

কেশব—ক্লাসে কাজটা তুই আজ ভালো করিস নি।

অলোক—থাক্, তোকে আর জ্ঞান দিতে হবে না !

কেশব—দেখ জ্ঞান দেবার কথা নয়, স্যারের মুখের উপর ঐ রকম তর্ক করা কি উচিত বলে তুই মনে করিস ?

অলোক—দ্যাখ কেশব, আমি ঠিক তর্ক করতে চাই নি। কিন্তু অংকটা 'রাইট' হবার পরও যদি স্যার ঐ রকম বকাবকি করে কথা বলেন—

কেশব—কিন্তু স্যার তো ভুল কিছু বলেন নি। সত্যিই তো অংকটা তুই নিজে করিস নি—সঞ্জয়ের খাতা দেখে করেছিস।

অলোক—সে আমি যার দেখেই করি, ভুল তো আর করি নি।

কেশব—তোর এ কথাটা আমি মানতে পারলাম না। ভুল হওয়া তবু ভালো. কিন্তু পরের খাতা দেখে দেখে 'টোকা' উচিত নয়। স্যার নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছিলেন।

অলোক—সবই তো বুঝি, কিন্তু স্যার যখন ক্লাসের ছেলেদের সামনে আমায় বকতে শুরু করলেন, তখন মেজাজ ঠিক রাখতে পারি নি।

কেশব—কিন্তু মেজাজ সংযত তো রাখতে হবে ভাই। আমরা এখন উঁচু ক্লাসের ছাত্র—ভদ্রতা. নম্রতা. গুরুজনের ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা যদি আমরাই বজায় রাখতে না পারি. তবে ছোট ভাইরা কি করবে। তারা যে আমাদের দেখেই শিখবে।

অলোক—ঠিকই বলেছিস। আমার সত্যিই ভুল হয়ে গেছে।

কেশব—তাহলে. কালই স্যারের কাছে ক্ষমা চাস।

অলোক—কাল কেন. ক্ষমা চাইতে আমি এখনই যাচ্ছি।

কেশব—চল্ তাহলে, তোকে এগিয়ে দিই।

(৫) চলচ্চিত্র সমাজজীবনকে কেমন ভাবে প্রভাবিত করে তাই নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কথাবার্তা ঃ

প্রমিতা। কাল তো স্কুল ছুটি, বিকেলে আমাদের বাড়ী আসিস না, আলপনা।

আলপনা। নারে যেতে পারবো না। কাল মার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবো।

প্রমিতা। ছুটি পেলেই তোর সিনেমা যাওয়া চাই। অবাস্তব ঐ সমস্ত ছবি যে তুই কি করে দেখিস—

আলপনা। ক্লান্তিকে মুহূর্তে দূর করে দিতে পারে তো ঐ একটি জিনিসই ভাই!

প্রমিতা। কিন্তু এখনকার সিনেমা মানেই তো খুন জখম, নানা উত্তেজক দৃশ্য আর নাচ গানের সমারোহ—

আলপনা। তা কেন, সব সিনেমাই কি তাই—এই তো সেদিন সত্যজিৎ রায়ের অশনি-সংকেত দেখে এলাম। কি অপূর্ব বই, মন্বন্তর যেন চোখের সামনে ঘটতে দেখলাম।

প্রমিতা। সত্যজিৎ রায়ের কথা ছাড়. কিন্তু অধিকাংশ সিনেমাই তো প্রযোজকদের মুনাফা অর্জনের সুন্দর একটি ব্যবসা।

আলপনা। দেখ, কিছু প্রযোজকের অপরাধে তো আর তুই গোটা চলচ্চিত্র শিল্পকে দোষারোপ করতে পারিস না—

প্রমিতা। কিছু প্রযোজক! তুই কি বলিস আলপনা—আজকাল লাভের সহজ পথ—বিকৃত রুচিকে মূলধন করে একটা ছবি তৈরী করা; অশোভন পোস্টার দিয়ে কিশোর কিশোরীর অপরিণত মানসকে আকর্ষণ করে তাদের সর্বনাশ করা।

আলপনা—সরকার এ ব্যাপারে তো কঠোরতা অবলম্বন করছেন আজকাল। এই তো সেদিন কাগজে দেখলাম এবার থেকে প্রতিটি সিনেমা পোস্টারও সেন্সর করাতে হবে।

প্রমিতা—খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু এ সব কাজ সরকারকে দিয়ে হবার নয়। রুচি-সম্পন্ন মানুষের উচিত এই জাতীয় বইগুলোকে 'বয়কট' করা। একাদিক্রমে এই রকম মনো-ভাব দেখালে প্রযোজকরা আর এমন বই তুলতে সাহস পাবে না।

আলপনা—ঠিক বলেছিস তুই। আনন্দ আর আরাম যে এক জিনিস নয় তা যে কবে লোকে বুঝবে! আমি সিনেমা দেখি বটে কিন্তু জানিস তো খুবই বেছে বেছে—

প্রমিতা—সন্ধ্যা হেকে আর দেরী করাবো না চল—

আলপনা—পরশু তাহলে দেখা হচ্ছে আবার।

(৬) আধুনিক পোশাক নিয়ে শিক্ষিকা এবং ছাত্রীর মধ্যে কথোপকথন ঃ

ছাত্রী—আমাকে ডেকেছিলেন, দিদি?

শিক্ষিকা—হ্যাঁ, শোন। তুমি আজ স্কুল-ইউনিফর্ম পরে আসোনি কেন?

ছাত্রী—না আমি মানে, ঠিক.. ...

শিক্ষিকা—তুমি জানো না, স্কুলে ইউনিফর্ম ছাড়া অন্য পোশাক পরে আসা নিয়ম-বিরুদ্ধ?

ছাত্রী—কি দিদি, রোজই তো ইউনিফর্ম পরে আসি, আজ মনে হলো একটু অন্য পোশাক পরে যাই না।

শিক্ষিকা—বাঃ, প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নিয়মশৃঙ্খলা আছে, তোমার ইচ্ছে হলো অমনি পরে ফেললে এটা কি একটা কথা হলো!

ছাত্রী—না দিদি, রোজ এক রকম পোশাক পরে আসতে একঘেয়ে লাগে তাই—

শিক্ষিকা—ইউনিফর্মটা একঘেয়ে বলে মনে হওয়া অবশ্য অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু স্কুল এমন একটা ক্ষেত্র, যেখানে কিছুক্ষণের জন্যও অন্ততঃ নিয়মের অধীনে থাকতেই হবে। বাড়ী ফেরার পর তোমার পোশাকের একঘেয়েমী দূর করতে তো বাধা নেই।

ছাত্রী—তা ছাড়া দিদি আজ দেরী হওয়ার জন্য তাড়াতাড়িতে এই পোশাকটাই পরে এসেছি।

শিক্ষিকা—কিন্তু তোমার দেরী হওয়া বাঁচাতে গিয়ে তুমি যে পোশাক পরে এসেছ তা মোটেই শোভন এবং শালীন নয়। ইয়াংকি ঘেঁষা এই যে উগ্র পোশাকটি তুমি পরেছ তা শুধু রুচির দিক থেকেই নিকৃষ্ট নয়, তা স্কুলের পরিবেশও যেমন নষ্ট করছে তেমনি তোমার সহপাঠিনীদের মনকেও বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল করে তুলেছে।

ছাত্রী—কিন্তু এই জাতীয় পোশাক তো এখন খুব চলছে দিদি; তাছাড়া ট্রামে বাসে যাতায়াতের পক্ষে যে কত সুবিধে...

শিক্ষিকা—এই রকম পোশাকের চলনকে রোধ করবে তো তোমাদের মতো ছাত্রছাত্রীরাই। পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে বাঙালীর যে নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে, তাকে বিসর্জন দিয়ে শুধু অনুকরণের মোহে চলতি সব কিছুকে গ্রহণ করতে তোমাদের মন সায় দেয় কি?

ছাত্রী—সত্যি দিদি, আমি এতটা ভেবে দেখিনি. সকলের দেখেই এই জামাটা তৈরী

করিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার কথাগুলো শুনে সত্যিই বুঝতে পারছি, বাঙালী মেয়েদের অন্ততঃ এ জাতীয় পোশাক পরা উচিত নয়।

শিক্ষিকা—আমি যা বলতে চাইছিলাম, তা তুমি ধরতে পেরেছ দেখে খুব খুশী হলাম।

(৭) **জীবনের লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষিকা ও ছাত্রীর মধ্যে কথোপকথন :**

ছাত্রী। আসবো দিদিমণি ?

শিক্ষিকা। এসো এসো। বসো কেমন পরীক্ষা হলো, বল। আমরা তো তোমার ওপর অনেক ভরসা করে আছি।

ছাত্রী। ভরসা করার কিছু নেই দিদিমণি

শিক্ষিকা। কেন, পরীক্ষা ভাল হয় নি ?

ছাত্রী। না, পরীক্ষা ভালই দিয়েছি, সব বিষয়ে সব প্রশ্নের উত্তর ভাল ভাবেই দিয়েছি।

শিক্ষিকা। তাহলে—

ছাত্রী। বুঝতেই তো পারছেন, দিদিমণি. গতবাবের সাধনা বসু এত ভাল ছাত্রী, এত ভাল পরীক্ষা দিলে. ফল বেরুলে দেখা গেল Ordinary 1st Division।

শিক্ষিকা। তোমার বেলাতেও যে তাই হবে, তা ভাবছ কেন ? গতবার যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে, এবাব তার সংশোধনও তো হতে পারে। আমার বিশ্বাস, তুমি ঠিক স্কলারশিপ পাবে।

ছাত্রী। পাই তো সে আপনাদের আশীর্বাদ। তবে পাব না বলেই আমার ধারণা হচ্ছে; বড় জোর দু একটা লেটার থাকতে পারে।

শিক্ষিকা। পরীক্ষা মনোমত হয়েছে, এই যথেষ্ট। দেখা যাক, কি হয়। এখন কি পড়বে বলে ভাবছ ?

ছাত্রী। এই তো সবে পরীক্ষা দিলাম ! কি আর ভাববো। ফল কেমন হয়, তার ওপর সব পড়া নির্ভর করছে।

শিক্ষিকা। শুধু পরীক্ষার ফলের উপর বরাত দিয়ে বসে থেকো না। তুমি জীবনে কি করতে চাও, কোন্ পেশা তোমার ভাল লাগবে পছন্দ হয়, তার উপরও পড়া নির্ভর করে।

ছাত্রী। রেজাল্ট ভাল হলে, ডাক্তারি পড়বো, ভেবেছি।

শিক্ষিকা। সে তো খুবই ভাল কথা। ছাত্রীদের মধ্যে ডাক্তার হলে আমাদের বুড়ো বয়সে খুবই সুবিধে হবে। বিনা পয়সায় চিকিৎসা। রাত্রি দুপুরে ডাক—ডাক্তার হাজির। কি বলিস্—

ছাত্রী। আশীর্বাদ করুন, তাই যেন হয়। তবে হওয়ার সম্ভাবনা কম। রেজাল্টের ওপব কোন ভরসা নেই।

শিক্ষিকা। যদি রেজাল্ট তেমন ভাল না হয়, তবে কি করবে ঠিক করেছ ?

ছাত্রী। দিদিমণি, আমি কলম পেশা চাকরি করবো না, মাস্টারি করতেও ইচ্ছে আমার নেই।

শিক্ষিকা। তবে ?

ছাত্রী। আমি বাবাকে বলে রেখেছি, যদি ডাক্তারিতে ভর্তি হতে না পারি, তবে আমি অনার্স নিয়ে B. Sc পাশ করে নার্সিং শিখবো। যদি ভাল ফল করতে পারি, আর সুবিধে পাই তবে নার্সিং সম্বন্ধে পড়াশুনা ও ট্রেনিং নেওয়ার জন্য রাশিয়ায় যাব।

শিক্ষিকা। বেশ ভাল idea। আমার তো তোমার কথা শুনে খুব ভাল লাগছে। মেয়েদের এখন পুরোনো চিন্তা ছেড়ে, নতুন ভাবে চিন্তা করার দিন এসেছে. সত্যি দীপিকা, আমি তোমার কথা শুনে বড় আনন্দ পেলাম।

[এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা শিক্ষিকাকে দিদি বা দিদিমণি বলে সম্বোধন করে। প্রধান শিক্ষিকাকে বড়দি বা বড় দিদিমণি বলে ডাকার রেওয়াজ চলে আসছে। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় হলো শিক্ষিকা যখনই ছাত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হচ্ছেন, তখনই 'তুই সম্বোধন করছেন।]

(৮) কয়েকজন বন্ধু দু'তিন দিনের জন্য বেড়াতে যাবে। কোথায় বেড়াতে যাবে, কেমন মজা হবে—তা নিয়ে কথোপকথন ঃ

হরি। পরীক্ষা তো যা হোক একটা দিলাম। ফল যা হবার, তাতো হবেই। আর এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা, ঘ্যানর ঘ্যানর ভাল লাগছে না। বাদ দেতো এ সব।

সোমনাথ। চল না ভাই, কোথা থেকে ঘুরে আসি।

নেপাল। হ্যাঁরে, বেশ ভাল হয় কিন্তু। চল্ না, আমার মামার বাড়ি আছে কোন্নগরের কাছে নবগ্রাম। ওখান থেকে কলকাতা খুব কাছে তোরা তো কলকাতা কেউ দেখিস নি। সব গেঁয়ো। বেশ ক'দিন থেকে কলকাতা দেখে আসি।

হরি। কলকাতা তো দেখতেই হবে। কলেজে পড়তে গেলে কলকাতা চাকরি করতে গেলে কলকাতা, হাসপাতালে গেলে কলকাতা। আজ না যাই কাল যাব, ইচ্ছায় না যাই অনিচ্ছায় যাব।

সোমনাথ। যা বলেছিস ভাই। পার্টির মিটিং, চল কলকাতা ময়দান। যা হয়েছে আজকাল।

হরি। বুঝলি নেপাল, তার চেয়ে চল, পুরী থেকে ঘুরে আসি। সমুদ্র দেখা হয় নি কোন দিন। সমুদ্র দেখে আসি।

সোমনাথ। আমরা শিলিগুড়ির ছেলে। জন্ম থেকে হিমালয় দেখে আসছি। সমুদ্র দেখলে দেখার অনেকটা হয়ে যায়। কি বলিস ভাই নেপাল ?

হরি। নেপ্লার রাগ হয়েছে। দেখ না, একটা কথাও আর বলছে না। ও ভাবছে, ওর মামাকে তুচ্ছ করলাম।

সোমনাথ। আরে নারে না। কলকাতা তো আমাদের যেতেই হবে। তখন তোর মামার বাড়ি ছাড়া আর কোথায় উঠবো বল্।

নেপাল। হরে তুই যাতা বলছিস কেন ? আমি কি তাই ভেবেছি নাকি ?

সোমনাথ। সত্যি হরি, তোর স্বভাব হচ্ছে নেপালকে খচান।

নেপাল। আমি কিন্তু ভাই অন্য কথা ভাবছি।

হরি। কি ভাবছিস, বল না।

নেপাল। আমার মনে হয়, আমাদের দীঘা যাওয়া ভাল। খড়্গপুর থেকে বাসে করে দীঘা যাব। সমুদ্রও দেখবো—

সোমনাথ। তোর মামার কাছে একটা চিঠি দে নেপুলা। আমরা ফেরাব পথে তোর মামার বাড়ি নবগ্রামে হপ্তাখানেক থেকে কলকাতা শহর দেখে, তবে বাড়ি ফিরবো।

হরি। বেশ হবে কিন্তু। সমুদ্র দেখাও হবে; কলকাতা দেখাও হবে। নেপাল মহারাজ কি—জয়। তাহলে নেপুলা, ঠিক আছে তো?

(৯) **পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইংরেজী পরীক্ষায় ভাল ফল হয় নি। এই বিষয়ে পিতা ও পুত্রের মধ্যে কথোপকথন ঃ**

পুত্র। বাবা, আমার Progress Report-টায় সই করে দাও।

পিতা। কিরে, এবার ইংরেজী পরীক্ষায় ফল এত খারাপ হলো কেন? মাত্র ৯৮—দু'শর মধ্যে তাই না?

পুত্র। কি করে বলবো। আমি তো সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম এবং ভালভাবেই দিয়েছিলাম।

পিতা। তুই নিজে লিখেছিস্ না মুখস্থ লিখেছিস্?

পুত্র। মাস্টার মশায় আমাদের উত্তর লিখিয়ে দিয়েছিলেন। আমি হুবহু তাই লিখেছি।

পিতা। হুঁ! খাতা কে দেখেছেন?

পুত্র। হেড স্যার।

পিতা। তবেই হয়েছে। বুড়োকে তো চিনি। আমরা যখন পড়েছি, তখনও তিনি বলতেন, যে বানিয়ে ইংরেজী লিখবে, যদি মোটামুটি উত্তর হয় এবং ভাষা শুদ্ধ হয়, তাকেই বেশী নম্বর দেওয়া হবে।

পুত্র। আমি বানিয়েই লিখি, আর মুখস্থই লিখি, উত্তর শুদ্ধ হলে, নম্বর দেবেন না কেন?

পিতা। দেখ নরেন! আবোল-তাবোল বোকো না। তিনি যা বলেন তা ঠিকই বলেন। তুমি শুদ্ধ উত্তর দিয়েছো, তোমাকে ফিফটি পারসেন্ট নম্বর দিয়েছেন। তুমি যদি নিজের ইংরেজীতে শুদ্ধ উত্তর দিতে, তবে সিকস্‌টি পারসেন্ট বা তারও বেশী নম্বর পেতে। তুমি নিজে ইংরেজী লিখতে শিখবে না, আর নম্বর চাইবে. তা হয় না।

(পুত্র নিরুত্তরে মাথা নিচু করে রইলো।)

পিতা। এখন থেকে নিজে ইংরেজী লেখা শেখ। খালি মুখস্থের উপর নির্ভর করো না।

[লক্ষ্য করবার বিষয়—পিতা পুত্রকে সাধারণতঃ 'তুই' সম্বোধন করছেন। কিন্তু যখন অসন্তোষ প্রকাশ করছেন বা উপদেশ দিচ্ছেন, তখন পুত্রকে তুমি সম্বোধন করছেন। পিতা যখন পুত্রের কাছে তাঁর নিজের প্রধান শিক্ষক (বর্তমানে ছেলেরও প্রধান শিক্ষক) মহাশয়কে 'বুড়ো' বলে উল্লেখ করছেন, তার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা যেন ঝরে পরছে।]

(১০) **বাংলায় নম্বর কম পাওয়া নিয়ে পুত্রের সঙ্গে পিতার কথোপকথন ঃ**

রাখাল। দেখ বাবা, আমার বাংলায় নম্বর খুব খারাপ হয়েছে।

পিতা। তাইতো দেখছি। বাংলায় এত কম নম্বর পেলি কেন?

রাখাল। সব প্রশ্নের উত্তরই তো ভালভাবে লিখেছিলাম।

পিতা। নিজে বানিয়ে লিখেছিলে, না মুখস্থ লিখেছিলে?

রাখাল। মুখস্থও লিখেছিলাম, বানিয়েও লিখেছিলাম।

পিতা। ব্যাকরণে ২৫-এর মধ্যে কত পেয়েছ?

রাখাল। ১৫ নম্বর পেয়েছি।

পিতা। মোটে ১৫ নম্বর! দশ নম্বর বাদ!

রাখাল। কি করবো, প্রত্যয় থেকে প্রশ্ন এসেছে। আমি প্রত্যয় ভাল বুঝি না, যা মনে এসেছে, তাই উত্তর দিয়েছি। সমাসও দু একটা ভুল হয়েছে।

পিতা। Test paper solve কর না? Test paper আছে?

রাখাল। আছে। Solve করবার সময় পাই না। ইংরেজী, বিজ্ঞান ভূগোল, অংক করতেই সময় যায়।

পিতা। বিনোদবাবু তো বাংলার খুব ভাল শিক্ষক। তিনি কিছু বলেন না?

রাখাল। বলে আর কি করবেন। আমরা অন্য subject পড়ে সময় করতে পারি না, তিনি তো দেখেন।

পিতা। সামনের পুজোর বন্ধে আমি তোমাকে বাংলা পড়াব। তুমি Test paper থেকে ব্যাকরণ, অনুবাদ আর ভাব-সম্প্রসারণ করে আমাকে দেখাবে।

রাখাল। আচ্ছা দেখাব। বন্ধের মধ্যে সময়ও পাব।

পিতা। বাংলায় জ্ঞান ভাল না হলে অন্য বিষয়েও ভাল ফল হবে না। মাতৃভাষায় জ্ঞান না হলে, প্রকাশ করবার ক্ষমতা না জন্মালে, অন্য বিষয়ে ফল কি করে ভাল করবে?

॥ উত্তর দাও ॥

১। কথোপকথন বলতে কি বোঝ? কথোপকথন শিক্ষা আমাদের কি উপকার করে?
[উঃ পৃঃ ১৩৮, ১৪০]

২। সার্থকভাবে কথোপকথনের সময় কোন্ কোন্ দিকে সচেতন দৃষ্টি রাখা দরকার?
[উঃ পৃঃ ১৩৮, ১৪০]

৩। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে "কথোপকথন" অভ্যাস কর:

(ক) 'খেলাধুলা' নতুন স্কুলফাইন্যাল পাঠ্যক্রমের অন্যতম বিষয়—এই বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন

(খ) ভবিষ্যতে কি হতে চাও—এই বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কথাবার্তা

(গ) সাতদিনের ছুটিতে ভ্রমণ—কোথায় যাওয়া যায়—তিন বন্ধুর ,, (উঃ পৃঃ ১৪৬)

(ঘ) দরোয়ানকে বকশিস দেওয়া উচিত না অনুচিত—দুই বন্ধুর ,,

(ঙ) একটি ফুটবল খেলা দেখে ফেরার পথে দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন

(চ) 'হোমটাস্ক' করে নিয়ে যায়নি—শিক্ষকমশাই এবং ছাত্রের মধ্যে ,,

(ছ) টিফিনে অনুমতি না নিয়ে স্কুল থেকে চলে গেলে—প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রের ,,

(জ) স্কুলে আসতে দেরী হয়েছে এই বিষয়ে ক্লাস-টীচার এবং ছাত্রের মধ্যে ,,

ষষ্ঠ অধ্যায়

।। আলোচনা ।।

আলোচনা কাকে বলে :

আলোচনা কথাটির অর্থ হচ্ছে কোন বিষয় সম্বন্ধে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান এবং স্পষ্ট ধারণা লাভ করা। পারস্পরিক কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বিষয়টির গুণগত উৎকর্ষই শুধু প্রতিভাত হয় না, সেই সঙ্গে আভাসিত হয় আলোচ্য বিষয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকটিও। বিতর্ক কথাটির মধ্যেও আলোচনা আছে কিন্তু বিতর্কে বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষের মধ্যে যুক্তি খণ্ডনের প্রাধান্যই পায়। আলোচনায় কিন্তু বক্তার মানসিক উপলব্ধি এবং অনুভূতি উৎসারিত চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে আলোচ্য বিষয়টির সামগ্রিক ভাববিস্তার করতে হয়।

আলোচনার প্রয়োজনীয়তা :

আলোচনার শিক্ষণীয় দিক ছাড়াও ব্যবহারিক মূল্য আছে। আজকের দিনে সকলেই স্বীকার করবেন যে, আলোচনাই বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায়। বাস্তব জীবনে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, ব্যক্তিতে প্রতিষ্ঠানে, ব্যক্তিতে সমাজে, প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে, ধর্মে ধর্মে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রতিনিয়ত যে সব সমস্যার উদ্ভব হয় তা সমাধান করবার শ্রেষ্ঠ পথই হলো আলোচনা। আলোচনার মাধ্যমে মত বিনিময় ঘটে; জনমত প্রতিফলিত হয়। বিদ্যালয় জীবনেও আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বিদ্যালয়ের কোন অনুষ্ঠানকে সাফল্য-মণ্ডিত করতে হোলে নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে, খেলাধূলা সুশৃঙ্খল ভাবে চালাতে হলে আলোচনা করতেই হবে।

এই আলোচনার মাধ্যমে সমাজ রাজনীতি, ধর্ম, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয় অবলম্বন বুদ্ধিজীবী মানুষের চিন্তার বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ আলোচনা শুধু কোন বিষয় সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণাই দেয় না, সেই সঙ্গে বক্তার মৌলিক চিন্তা-শক্তির ধারাটিকেও বিকশিত করে। গ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়া আমরা জ্ঞান আহরণ করি ঠিকই, সেই জ্ঞানকে সুদৃঢ় ভিত্তি ও চিরকালীন স্থিতি দান করে কিন্তু পারস্পরিক আলোচনা। শিক্ষাজগতে আলোচনার আবির্ভাব তাই দৃষ্টির উদারতা বর্জিত, মননের উদ্যম বিহীন সৃষ্টির উৎসাহহারা জড় শিক্ষার ক্ষেত্রে নব জীবনের রসধারা সঞ্চার করেছে। আমাদের নবপ্রবর্তিত যে পাঠক্রম তাতে আলোচনার অন্তর্ভুক্তি ছাত্র-ছাত্রীদের মৌলিক চিন্তাশক্তির বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করবে। সেই সঙ্গে কর্মভিত্তিক শিক্ষাধারার (work education) পাঠক্রমের মধ্যে 'বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নানা বিষয়ক অনুষ্ঠানের' যে কথা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ছাত্র-ছাত্রীকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে উৎসাহিত করবে।

আলোচনা কত রকমের হতে পারে :

(ক) কোন সাধারণ হলে সমবেত জনমণ্ডলীর সামনে পণ্ডিত ব্যক্তিদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা। ইংরেজীতে একে বলে symposium।

(খ) জনসভা ডেকে আলোচনা।

(গ) কোন ঘরে বসে পরস্পর মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে আলোচনা। ইংরেজীতে একে discussion বলা যায়। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানের পূর্বে এবং পরে এই জাতীয় আলোচনা সভা প্রত্যেক স্কুলেই হয়।

(ঘ) পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আলোচনা।

সার্থক আলোচনার কয়েকটি নিয়ম :

(১) সার্থকভাবে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রয়োজন

(২) যদিও আলোচনার নির্দিষ্ট সময়-সীমা থাকে না, তথাপি বক্তব্য অস্বাভাবিক দীর্ঘ করা উচিত নয়।

(৩) বক্তব্য সুশৃঙ্খলিতভাবে পারম্পর্য রক্ষা করে প্রসঙ্গচ্যুতি না ঘটিয়ে বলা চাই

(৪) শ্রোতৃমণ্ডলীর বিদ্যা-বুদ্ধি-বয়স এবং রুচির প্রতি লক্ষ্য রেখে তদনুযায়ী বক্তব্য পরিবেশন করা উচিত।

(৫) প্রসঙ্গানুযায়ী উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, উদ্ধৃতি আলোচনার মর্যাদা বৃদ্ধি করে, কিন্তু অবান্তর বিষয় অথবা পুনরাবৃত্তি আলোচনার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে।

(৬) প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্য এবং বিষয় অনুযায়ী ভাষা, আলোচনাকে সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক করে তোলে।

যে কোন বিষয় অবলম্বন করেই 'আলোচনা' হতে পারে। সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন যে কোন বিষয়ই 'আলোচনা'র এক্তিয়ারে। তবে প্রত্যক্ষভাবে ছাত্রছাত্রীরা 'আলোচনা'র প্রয়োজন অনুভব করে যখন বিদ্যালয়ে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আলোচনার সূত্রপাত নানাভাবে হতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের প্রাত্যহিক জীবনের অনেকটা সময়ই বিদ্যালয়ে অতিবাহিত হয়। এখানে সারা বছর ধরে বিভিন্নজাতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানের পরিচালনায় থাকলেও অংশগ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীরাই। ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ থাকে। অথচ তারা ঐ সমস্ত আলোচনায় যোগ দিতে ভয় পায়। ছাত্রছাত্রীরা যেন প্রথম থেকেই ঐ আলোচনায় সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে। প্রথম প্রথম কম্পিত কণ্ঠস্বর কিংবা শৃঙ্খলিত যুক্তি পরম্পরার অভাব অথবা প্রকাশের অনায়াস ভঙ্গী না থাকতে পারে; কিন্তু স্নায়ুশিথিল (nervous) হওয়ার কিছু নেই। ঐ সমস্ত ত্রুটি সংশোধনের একমাত্র উপায় সাহস এবং অনুশীলন। একনিষ্ঠ হৃদয় এবং মনোযোগী প্রচেষ্টা সহজেই প্রার্থিত সাফল্য এনে দিতে পারে।

বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা-সভাগুলোতে যে সব আলোচনা হয় সেগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) সাধারণ আলোচনা, (২) প্রস্তুতিহীন আলোচনা এবং (৩) বিদ্যালয়ের কোন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা।

সাধারণ আলোচনা

এবার আমরা বিদ্যালয়ে আয়োজিত প্রধান প্রধান অনুষ্ঠানে কি জাতীয় আলোচনা হতে পারে, তার কিছু ইঙ্গিত এখানে তুলে ধরছি। এই সমস্ত আলোচনাকে অবলম্বন করে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের প্রস্তুত করে তুলবে।

২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শুভ জন্মদিবস। এই উপলক্ষ্যে প্রতি স্কুলেই কোন না কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান নিয়ে একটি গীতি-আলেখ্যর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্ষার গান শুরু করার আগে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতেই হবে। সেই আলোচনা করতে করতে রবীন্দ্রসাহিত্যে 'প্রকৃতি' কেমন ভাবে এসেছে দেখতে হবে, এইভাবে প্রসঙ্গক্রমে বর্ষার কথা আসবে। তারপর শুরু হবে বর্ষার গান; কোন ছাত্র বা ছাত্রী তার আলোচনা এইভাবে আরম্ভ করতে পারে:

রবীন্দ্রসাহিত্যে বর্ষা

রবীন্দ্রনাথ। অদ্ভুত সুন্দর একটি নাম। একটি প্রতীক। একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁকে ঘিরে, তাঁকে জড়িয়েই তো আমাদের ভাব-ভাবনা, মনন-কল্পনার আজও আবর্তন। যে কোন মানুষ যা চায় সব পেতে পারে তাঁর কাছে। তাঁর কাব্য, সাহিত্য, গান থরে বিথরে সজ্জিত হয়ে আছে আজও নানা আবিষ্কারের প্রত্যাশায়।

রবীন্দ্রনাথ। তুমি বলেছিলে 'হায় গগন নহিলে তোমায় ধরিবে কেবা!' কাকে বলেছিলে? আমরা তোমাকে যে ঐ কথাই বলতে চাই। অথচ কি আশ্চর্য, তুমি এমন এক ব্যক্তিত্বময় প্রাণদ সত্তা যাতে সূর্যের দীপ্যমানতার সঙ্গে সহজ স্বাভাবিকতায় মিশে গেছে চন্দ্রের স্নিগ্ধ কোমলতা। এই তো তুমি। তুমি তো তাই আমাদের সব চাহিদারই পরিপূর্ণতা।

রবীন্দ্রনাথ এমন এক অনুভূতিপ্রবণ হৃদয় নিয়ে জন্মেছিলেন যে, অনুভূতিময় কোন কিছুই তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। সবই তিনি বিবৃত করেছেন, রূপায়িত করেছেন। বাংলা দেশের মানুষের বেড়ে ওঠা কিংবা গড়ে ওঠার সঙ্গে প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে রয়ে গেছে অনাদিকাল থেকে। এ সত্য রবীন্দ্রনাথ গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই ষড়ৈশ্বর্যময় প্রকৃতিকে তিনি যথাযথ ভাবে তাদের নিজ নিজ স্বরূপে আহ্বান করতে পেরেছেন।

এই কথাটার ওপরই জোর দিতে চাই। বাংলায় প্রকৃতি প্রত্যেক ঋতুতেই নতুন রূপ ধারণ করে। প্রত্যেকটি ঋতুরই যে একটি নিজস্ব শরীর আছে, মন আছে, রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে তা সুন্দরভাবেই ধরা পড়েছে।

কবির প্রিয় ঋতু বর্ষা। এই বিষয় নিয়ে কবি এত গান আর কবিতা লিখেছেন যা বোধ হয় অন্য কোন বিষয় নিয়ে লেখেন নি। ভাবুক কবিকে বর্ণগন্ধময় পুষ্পপল্লবিত সজল শোভন সৌন্দর্য আকর্ষণ তো করবেই। কিন্তু শুধু বাইরের শরীরী সৌন্দর্য নয়, বর্ষার অন্তরের অন্তরতম রূপটিও গীতিকার কবির লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এমন যে বর্ষা এ যেন কিছুটা অহংকারী—মদগর্বিতা। একে তাই আহ্বান করতে হয় গানে গানে। বৈশাখ তো রুদ্র সন্ন্যাসী—সমস্ত ভাবকে সংযত করে তিনি বসেছেন ধ্যানে। ধূসর রুক্ষ পিঙ্গল জটাজাল উড়িয়ে মুখে ভয়াল বিষাণ তুলে কাকে ডাকছেন তিনি কে জানে! বৈশাখী মৌনী তাপসকে তুষ্ট করেই শুরু হোক আমাদের সুরের জয়যাত্রা......

পরবর্তী আর এক অনুষ্ঠান হয়ত নজরুলজয়ন্তী। 'নজরুল-জন্মদিবসে' নজরুলের কবিতা আবৃত্তি হয়, নজরুল-গীতি হয়। যদি বলা হয় '**শিশু সাহিত্যিকরূপে নজরুল কেমন ছিলেন**' সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে, তখন ছাত্রছাত্রীরা এইভাবে আলোচনা করতে পারে:

শিশু সাহিত্যিকরূপে নজরুল

নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় একটি নাম। গতানুগতিকতার বিরুদ্ধেই যেন তাঁর আবির্ভাব। পাঠকরা যদিও বিদ্রোহী রূপেই তাঁকে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু কবির বিদ্রোহী মনের অন্তরালে কিংবা পাশাপাশি একটি শিশুসুলভ সৌন্দর্যসচেতন অকৃত্রিম স্নেহ-কোমল মন ছিল। এই নরম মনটিই নজরুলের শিশু কবিতার জন্মদাতা।

প্রাচীন কালের কথা থাক, কিন্তু বিগত শতাব্দীতেও শিশু-সাহিত্যের অস্তিত্ব প্রায় ছিল না। পৃথকভাবে যে শিশুদের জন্য সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব তা অনেকেই ভাবতেন না। গুরু-গম্ভীর ভঙ্গীতে জ্ঞানদান করেছেন অবশ্য অনেকে—কিন্তু উপদেশে ভর্তি পাঠ্যপুস্তকেই এঁরা

জীবিত রয়েছেন। শিশু-সাহিত্য প্রকৃত মর্যাদা পায় রবীন্দ্রনাথের হাতে। অবশ্য তাঁর পরে উপেন্দ্রকিশোর, দক্ষিণারঞ্জন, অবনীন্দ্রনাথ, যোগীন সরকার, সুকুমার রায় প্রভৃতি লিখেছেন। শিশু-সাহিত্যের প্রবহমান এই ধারাটিকেই নতুন এক দীপ্তিতে উজ্জ্বল করতে এগিয়ে এসেছিলেন কবি নজরুল ইসলাম।

নজরুলের শিশু কবিতার উৎস হচ্ছে শিশুর প্রতি তাঁর অন্তরের অকৃত্রিম গহন এবং গভীর ভালবাসা। যে কবি তাঁর বিদ্রোহী ভঙ্গিতে বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, সেই কবিই এই সব শিশু কবিতায় কত নরম, কত স্নিগ্ধ! তাঁর এ সব কবিতা পাঠে এই প্রত্যয়ই দৃঢ় হয় যে, কবি সহজেই নিজের বয়সকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন এবং সেজন্যেই শিশুদের সঙ্গে তাঁর মিলন এত অসংকোচ।

'প্রভাতী' আমরা কে না পড়েছি? ছোট ছেলেমেয়েকে ঘুম থেকে উঠিয়ে ভগবানকে প্রণামের পর কী সুন্দরভাবেই না নিত্য কর্তব্যের দিকে তাদের এগিয়ে দেওয়া হয়েছে:

ভোর হলো দোর খোলো
খুকুমণি ওঠ রে
ওই ডাকে যুঁই শাখে
ফুলখুকী ছোট রে।

এরপর পড়াশুনো। ছোটবেলায় নামতা পাঠে ভুল হলেই বাবা মার কাছে জোটে লাঞ্ছনা। শিশুর মনে এর স্মৃতি থেকেই জেগে উঠেছে:

আমি যদি বাবা হতাম, বাবা হতো খোকা।
না হলে তার নামতা পড়া মারতাম মাথায় টোকা।

'মা', 'লিচু চোর', 'খুকু ও কাঠবেড়ালী' জাতীয় শিশু কবিতা বাংলা সাহিত্যে কি খুব বেশী লেখা হয়েছে? ছোট মেয়ের সঙ্গে কাঠবিড়ালীর মান-অভিমানের কী সুন্দর চিত্রই না ফুটিয়ে তুলেছেন কবি:

কাঠবেড়ালী! কাঠবেড়ালী!
পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়মুড়ি খাও? দুধভাত খাও?
বাতাবী লেবু? লাউ?
বেড়াল বাচ্চা? কুকুর ছানা তাও?

নজরুল ইসলাম শিশুদের জন্য আর এক শ্রেণীর কবিতাও লিখেছেন। সেখানে তিনি প্রকৃতির রূপ, পৃথিবীর রূপ এবং শিশু মনের অন্তর্নিহিত সত্তাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

'বঙ্গজননী' কবিতায় বঙ্গজননীর অপরূপ রূপসৌন্দর্য, ছ'টি ঋতুর পটভূমিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন। 'দেখবো এবার জগৎটাকে' কবিতায় কিশোর মনকে তিনি ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে মুক্ত করে বৃহৎ জীবনের স্বাদ দিতে চেয়েছেন।

কবি শিশুদের শিশুকাল থেকেই এক মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি জানেন এদের মধ্যেই আছে ভবিষ্যতের মনীষী। তাই তাদের জোরালো কণ্ঠে ডাক দিয়েছেন—'সাম্যবাদ্য'/'মায়ামুকুর' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

শিশু শক্তিকে, কিশোর প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করে তিনি তাই গেয়েছেন :

ভাঙো ভাঙো এই ক্ষুদ্র গণ্ডি, এই অজ্ঞান ভোলো,
তুমি নহ শিশু দুর্বল, তুমি মহতো মহীয়ান।
জাগো দুর্বার, বিপুল, বিরাট, অমৃতের সন্তান।

বাংলা শিশু সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত গণ্ডির মধ্যে নজরুল ইসলাম সত্যিই স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিত্ব।

এইভাবে বিভিন্ন মনীষীর জন্মতিথি, স্মরণসভা, শিক্ষকদিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন আলোচনায় ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করতে পারে।

উপরে যে জাতীয় আলোচনার বর্ণনা দেওয়া হলো, তাতে আলোচ্য বিষয় পূর্বেই আলোচনাকারীদের মধ্যে প্রচার করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে কে কে আলোচনা করবেন তাও ঠিক করে দেওয়া হয়।

প্রস্তুতিহীন আলোচনা

অনেক সময় পূর্বাহ্ণে আলোচ্য বিষয় জানানো হয় না। উপস্থিত মত (extempore) প্রস্তুতিহীন ভাবেও কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হয়। এ ধরনের পদ্ধতি স্কুল-কলেজে বেশ প্রচলিত আছে। বিশেষ করে যেখানে নম্বর দেওয়া বা পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপার থাকে, সেখানে আলোচনা উপস্থিতমত বা প্রস্তুতিহীন (extempore) হওয়াই স্বাভাবিক।

উপস্থিতমত আলোচনা বা প্রস্তুতিহীন আলোচনা কি ভাবে করা হয় :

বিচারক বা বিচারকমণ্ডলী বসে থাকেন। তাঁরা ছোট ছোট কাগজের টুকরোতে বিভিন্ন রকমের আলোচ্য বিষয় লিখে ভাঁজ করে টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দেন। কোন ছাত্রকে বা পরীক্ষার্থীকে ডাকা হল। সে এলে পরীক্ষক বললেন ড্রয়ার খুলে একটা ভাঁজ করা কাগজ তুলে নিতে। তাতে যে বিষয় লেখা আছে তা নিয়ে ৫ বা ৭ মিনিট ধরে আলোচনা-মূলক বক্তব্য রাখতে হবে। যদি প্রথমবারের কাগজে লেখা আলোচ্য বিষয় পছন্দ না হয় তবে দ্বিতীয় বার আর একটি ভাঁজ করা কাগজ ড্রয়ার থেকে বার করে দেখা যাবে। কিন্তু এবার পছন্দ হোক বা না হোক দ্বিতীয় বারের কাগজে যে আলোচ্য বিষয় আছে, তা নিয়েই আলোচনা করতে হবে।

কোন পরীক্ষার্থী ছাত্র পরীক্ষকের নিকট সব বুঝে ড্রয়ার খুললো। প্রথম কাগজ তুলে দেখে, তাতে লেখা আছে—"বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলার অভাব"। তার মোটেই পছন্দ হলো না। সে পুনরায় ড্রয়ার খুলে কাগজ তুলে নিল। তাতে লেখা আছে—"দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।" বিষয়টি তার পছন্দ হলো। সে তার আলোচনা শুরু করলো—

মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং সভায় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী,

আমার আলোচ্য বিষয়—

দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ

মানুষ এককভাবে যে কাজ করে তার ভালোমন্দের দায়িত্ব সবই তার নিজের; কাজে সফল হলে—কাজের গৌরবও নিজের, তাতে অপরের কোন অংশ নেই। লোকে হয়তো

সেই গৌরবের দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে একটু দেখতে পারে—কিন্তু নিজের উন্নতির জন্য, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কাজ সম্পাদিত হয়েছে তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রাণের যোগ থাকে না। ঠিক তেমনই সেই ব্যক্তিগত কাজে অসাফল্যের যে লজ্জা, তাও একজনেরই—কারণ সে কাজের জন্য সেই একমাত্র দায়ী। সুতরাং লজ্জার সবটাই তার প্রাপ্য।

সমাজে আমরা দশজন মিলে-মিশে বাস করি। পরস্পরের সহযোগিতা এবং পরস্পর-নির্ভরতা আমাদের সামাজিক জীবনের পক্ষে একান্ত দরকার। সমাজের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষেও এই সহযোগিতার ভাব খুবই উপকারী। কারণ একলার পক্ষে সত্যকার কোন বড় কাজ, বড় পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্ভব নয়। তাই সমবায় পদ্ধতি সমাজ-কল্যাণের পক্ষে অপরিহার্য। সমবায় পদ্ধতি ছাড়া কোন বড় কাজে হাত দেওয়াই যায় না, কোন কিছু গড়ে তোলা যায় না। তা ছাড়া, এইভাবে দশজনে মিলে-মিশে কাজ করলে সমাজের সকলের মধ্যে আত্মীয়তার ও বন্ধুত্বের ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে সমাজ-সংহতির পক্ষেও অনেকখানি সাহায্য করে। এই ভাবে যা সকলেরই কাজ হয়ে ওঠে—তার ভালোমন্দের দায়িত্ব সকলের উপরেই এসে পড়ে। সকলের সহযোগিতায় যদি সে কাজ সফল হয়, তবে সবাই মিলে সমানভাবে সে আনন্দকে ভাগ করে ভোগ করে। আবার যদি সমবেত চেষ্টার ফলেও কার্যসিদ্ধি না হয়, তবে তার দুঃখ ও লজ্জা কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়, তা সকলের। যা সকলের তাতে আবার লজ্জা কিসের? কাজে বিফল হলে আবার দৃঢ়ভাবে সকলে মিলে তা সার্থক করবার জন্য তৎপর হওয়াই উচিত, বৃথা লজ্জায় সংকুচিত হবার অবকাশ সেখানে নেই।

পাড়ায় কোন উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে যখন দশজনে মিলে তা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, তখন সেই চেষ্টাতেই কাজের সার্থকতা ফুটে ওঠে। পরিণামে যদি পূর্ণাঙ্গ সফলতা নাও দেখা যায় তথাপি দশজনের উৎসাহ-উদ্দীপনাতেই সেই অপূর্ণতার লজ্জা অনেকখানি কেটে যায়।

বন্যা-দুর্ভিক্ষে যখন সবাই মিলে সাহায্য করবার জন্য দরদভরা অন্তর নিয়ে কাজ করে, তখন সেই আন্তরিকতাতেই কাজের মহত্ত্ব ফুটে ওঠে। সাহায্য কে কতটা করতে পারল তা বড় কথা নয়।

দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য সমবায়-ব্যবসায় বা শিল্পে, বিদ্যালয় বা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায়, স্বাধীনতার আন্দোলনে এবং সমাজ-সংস্কারমূলক যে কোন কাজে এই সহযোগিতা একান্ত কাম্য এবং এই ভাবে সকলে মিলে আগ্রহের সঙ্গে কাজ করলেই কাজও সার্থক হবে।

বিদেশে যে সব জাতি বর্তমান কালে উন্নতি করেছে, তারা সকলেই সমবেতভাবে সিদ্ধি-লাভের চেষ্টা করেছে বলেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পেরেছে। বহুবার তারা পরাজিত বা অকৃতকার্য হয়েছে, কিন্তু তাতে লজ্জা বা সংকোচ অনুভব না করে নতুন উদ্যমে আবার কাজ করেছে—তাতেই আজ তারা পৃথিবীতে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছে। আমরা এই পারস্পরিক সহযোগিতা ও আন্তরিকতা ভুলে গিয়ে যেন বড় বেশী ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছি—তাই অসাফল্যের লজ্জা সবটাই মাথায় নিয়ে আমরা ঘরের কোণে ক্রমশঃ আত্মগোপন করতে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের লজ্জার ভাগ নেবার জন্য সহযোগী নেই, তাই জাতীয় জীবনে আমাদের এই দুর্দশা। সমবায়-প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুললেই আবার আমরা মহৎ কাজ করে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারব—সাময়িক পরাজয় আমাদের দমাতে পারবে না।

সমবেতভাবে কোন কাজ করলে তাতে জয়যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী ; পরাজয়ের আশংকা খুবই কম। পরাজয় ঘটলেও তাতে ক্ষোভের কিছুই থাকে না ; কারণ সে পরাজয়ের দুঃখ দশজনে ভাগ করে নেয়। বলা বাহুল্য, জয়ের আনন্দও সকলেই সমানভাবে ভোগ করে।

বিদ্যালয়ের কোন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা

আলোচনা যেখানে ইংরেজী discussion অর্থে প্রয়োগ করা হয়, সেখানে কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য বা কোন পরিকল্পনা করবার জন্যই আলোচনা করা হয় ; শুধুমাত্র জ্ঞানলাভ তার উদ্দেশ্য নয়। এই আলোচনা কেবল আলোচনার জন্যই আলোচনা নয় অর্থাৎ কেতাবী আলোচনা নয়।

যেমন বিদ্যালয়ে কোন অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে শিক্ষকমণ্ডলী এবং মনিটরদের নিয়ে আলোচনা অথবা দুই রাষ্ট্রের কোন সমস্যা সমাধানকল্পে আলোচনা।

এই জাতীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী থাকে দুই বা তার বেশী। আলোচনাকারীরা আলোচ্য বিষয়ে প্রথমে নিজস্ব মত প্রকাশ করে। অন্যের বক্তব্য শোনার পর তার উত্তর প্রত্যুত্তর দেয়। তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হয়। সব আলোচনাই যে ফলপ্রসূ হবে, তা বলা যায় না। অনেক সময়েই রাজনৈতিক আলোচনা একবারেই ফলপ্রসূ হয় না।

নীচে বিদ্যালয়ের আসন্ন সুবর্ণ জয়ন্তী কি ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করা যায় তা নিয়ে শিক্ষিকা ও মনিটরদের সভায় আলোচনার বিবরণ দেওয়া হোলো :

প্রধান শিক্ষিকা—সব দিদি এসেছেন ? সব মনিটর উপস্থিত আছে ?

১ম মনিটর—না দিদি, সন্ধ্যাদির ক্লাস এখনও শেষ হয় নি। তাই তিনি এখনো আসতে পারেন নি, ও ক্লাসের মনিটরও আসতে পারে নি।

সহ-প্রধান শিক্ষিকা—সন্ধ্যাদি আর মনিটরকে ডাক।

সন্ধ্যাদি—ডাকতে হবে না। এসে গেছি। মণিকাও এসেছে।

প্রধান শিক্ষিকা—শিক্ষিকারা তো জানেনই, তোমরা ছাত্রীরাও অনেকে জান, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী। আমাদের ইচ্ছে যে, তিন দিন ব্যাপী উৎসব হোক। উপস্থিত দিদিরা বলুন, বল ছাত্রীরা এ বিষয়ে তোমাদের কি মত ?

১ম শিক্ষিকা—উৎসব তিন দিন হলে পড়াশুনার একটু বেশী ক্ষতি হবে না কি ?

২য় শিক্ষিকা—তা হবে। তবে কি জানেন, সুবর্ণ জয়ন্তী তো আর বছর বছর হয় না।

২য় মনিটর—না দিদি, সাতদিন উৎসব করতে হবে। নাটক করবো ২/৩ খানা। আবৃত্তি হবে, গান হবে, আলোচনা সভা হবে, খেলাধুলা হবে······

৩য় মনিটর—তা ঠিক দিদি। জোর উৎসব করতে হবে। আমাদের খাওয়াতে হবে কিন্তু একদিন ভাল করে। নইলে ভলান্টিয়ারি করবো না।

৩য় শিক্ষিকা—এক্‌জিবিশন করতে হবে।

১ম মনিটর—প্রথম দিন সকালে প্রভাতফেরি বের করবো ইউনিফর্ম পরা এক হাজার মেয়ে দিয়ে। আর স্কুল বা সাজাবো না—আলো দিয়ে......

প্রধান শিক্ষিকা—তবে সাতদিন উৎসবটা বড় বেশী হয়ে যাচ্ছে না......

সহ-প্রধান শিক্ষিকা—ঐ তিন দিনই কর তোমরা ভাল করে।

পণ্ডিত মশায়—ওদের কথাও থাক, আপনাদের কথাও থাক। চারদিন হোক।

প্রধান শিক্ষিকা—তা হতে পারে। প্রথম দিন উদ্বোধন, পরের তিনদিন অন্যান্য অনুষ্ঠান।

১ম মনিটর—বেশ, আমরা রাজী।

প্রধান শিক্ষিকা—তা হলে আমি পরিচালক সমিতিকে তোমাদের সব কথা জানাব। তারপর সেখানে যে সিদ্ধান্ত হবে সেই অনুসারে আমরা আবার বসে প্রোগ্রাম ঠিক করবো।

[অনুষ্ঠানের পূর্বে যেমন আলোচনা সভা বসে, অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার পরও তার সাফল্য অসাফল্য নিয়ে পর্যালোচনার জন্য আলোচনা সভা হয়। এ বিষয়ে এই পুস্তকের ১ম খণ্ডে (৭ম-৮ম শ্রেণীর পাঠ্য) বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।]

অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও আলোচনা হতে পারে। প্রতিদিনের সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভ, বিশিষ্ট ব্যক্তির আলোচনা ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত পাঠ করবে। বিখ্যাত বক্তার আলোচনাও তারা শুনতে পারে। আলোচনার সুন্দর এবং সার্থক নিদর্শন হিসেবে আমরা একটি রচনা উদ্ধৃত করছি। রচনাটি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর। আজ থেকে ৬০ বছরেরও আগে তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে আলোচনা করে গেছেন। এই জাতীয় আলোচনার ভঙ্গী অনুসরণ করলে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে। এরপরে একটি দৈনিক পত্রিকা থেকে আরও একটি আলোচনা তুলে দেওয়া হলো।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার প্রয়োজনীয়তা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

(সাধু ভাষায় লিখিত)

দেশের মধ্যে যে একটা নূতন হাওয়া বহিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কয়েক বৎসর মধ্যেই এ দেশের কতিপয় বিজ্ঞানসেবী যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যৎ আশামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে......বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংগে এ দেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু এতকাল আমরা সম্পূর্ণভাবে পরমুখাপেক্ষী ছিলাম। দূর দেশে কে কি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছে, গলা বাড়াইয়া দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব থাকিতাম ; কে কি নূতন কথা বলিতেছে, তাহা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ থাকিতাম। যাহা দেখিতাম এবং শুনিতাম, তাহাই প্রচার করিতে পারিলে আমাদের কর্তব্য শেষ হইল, ইহাই আমরা জানিতাম। এইরূপে দেখিয়া এবং শুনিয়াই আমাদের জীবন ধন্য হইল মনে করিতাম। স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করিয়া জগতের নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার আমাদের দ্বারা যে হইতে পারে, সে ক্ষমতা যে আমাদের থাকিতে পারে, এ বিষয়েই আমাদের সন্দেহ ছিল। বোধ করি, এখনও বিশ বৎসর অতীত হয় নাই, এশিয়াটিক সোসাইটির কাগজপত্র হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এদেশের লোক স্বাধীন বৈজ্ঞানিক আলোচনায় একান্ত অক্ষম। বিশ বৎসর একটা জাতির জীবনে অধিক দিন নহে. কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটির এখনকার সভাপতি বোধহয় সেইরূপ মন্তব্য প্রকাশে সংকোচ বোধ করিবেন। এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় বিশ বৎসর পূর্বে যে প্রমাণ পাওয়া যাইত না, পাশ্চাত্ত্য দেশের বিবিধ বৈজ্ঞানিক সভার পত্রিকা উদ্‌ঘাটন করিলেই আজকাল তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে।......

বিজ্ঞানমন্দিরে যাঁহারা সাধক, তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করেন, তাহা অন্যের পক্ষে দুর্বোধ্য। সাধনামন্দিরের বহির্দেশে আসিয়া প্রাকৃতজনের নিকট তাহাদের বোধ্য ভাষায় আত্মপ্রকাশে তাঁহারা স্বভাবতঃ সংকোচ বোধ করেন; অথচ তাঁহাদের সাধনালব্ধ ফলের আস্বাদনের প্রত্যাশায় অসংখ্য নরনারী মন্দিরের বাহিরে ঊর্ধ্বমুখে ও শুষ্কহৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা দেখিতেছেন। তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিকেরা যাহা অর্জন করেন ও আহরণ করেন, জনসাধারণ তাহার ফলাকাঙ্ক্ষী এবং ফলভোগে অধিকারী। বৈজ্ঞানিকের ধর্ম বস্তুতই নিষ্কাম ধর্ম। কর্মেই তাঁহাদের অধিকার; ফলে তাঁহাদের একেবারে অধিকার নাই। যাহা কিছু তাঁহারা আহরণ করিবেন, মুক্তহস্তে তাহা তাঁহাদিগকে বিতরণ করিতে হইবে। বিতরণ বিষয়ে অধিকারী নির্বাচন চলিবে না।..
বিজ্ঞানবিদ্যাকে সাধারণের উপভোগ্য করিতে পারা যায় কি না, এরূপ চেষ্টায় কোন লাভ আছে কিনা, ইহা লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা বাদানুবাদ চলিতে পারে। ইংরেজীতে বলিলে Science-কে Popularise করা চলে কি না এবং করা উচিত কি না, ইহা লইয়া মতভেদ আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও লর্ড কেলভিন অথবা পি. জি টেট্, হর্মান হেলম্ হোলৎজ, উইলিয়ম কিংডম্, ক্লিফোর্ড প্রভৃতির মতো ভাস্বরদ্যুতি জ্যোতিষ্ককে আলোক বিতরণ করিয়া ধরাধামের অজ্ঞান-তিমির অপসারণে প্রবৃত্ত দেখিতে পাই। এই কয়টা নাম উল্লেখের পর বোধ করি আর কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবেন না যে, প্রাকৃত জনের সম্মুখে বিজ্ঞান-প্রচারে নিযুক্ত হওয়ায় কোনোরূপ লজ্জা বা অগৌরবের হেতু আছে।...

বাঙলা ভাষা এখনও বিজ্ঞান প্রচারের যোগ্য হইতে বিলম্ব রহিয়াছে; কিন্তু এই বিলম্ব ক্রমেই অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। এই বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। মাতৃভাষাকে এতদর্থে সুগঠিত করিয়া লইবার জন্য যে যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক, আপনাদিগকেই তাহা করিতে হইবে। সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখা যদি বঙ্গভাষার এই অঙ্গের পুষ্টিসাধনে সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব নিরর্থক হইবে না।

আমাদের বাঙলা ভাষা বর্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র এবং অপুষ্ট হউক, উহা দ্বারা বিজ্ঞান বিদ্যার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য, তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি।

আরও একটি উদাহরণ ঃ

নিম্নে একটি দৈনিক পত্রিকা থেকে ১/১১/৭৪ তারিখে প্রকাশিত একটি আলোচনা তুলে দেওয়া হলো ঃ

এ সমাজ-ব্যবস্থায় জীবনের মূল্য নেই

(চলিত ভাষায় লিখিত)

মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা একমাত্র ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সম্ভব। নতুবা স্বাধীনতা অর্জনের ২৭ বছর পরেও দেশে দুর্ভিক্ষ হয় কেন, মানুষ না খেয়ে মরে কেন? কেনই বা মা ক্ষুধার জ্বালায় শিশু সন্তানকে অসহায় ভাবে ফেলে চলে যায়, কেনই বা মৃত মায়ের কোলে শিশুসন্তান অসহায় ভাবে ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদতে থাকে, আর কেনই বা যে শ্রমজীবি—যাদের শ্রমে মাঠে সোনার ফসল ফলে ও কোটি কোটি মানুষের জন্য খাদ্যভাণ্ডার সৃষ্টি হয় তারা হবে মৃত্যুপথের যাত্রী? অথচ দেশে বন্যা হয় নি, খরা হয় নি, বরং যথেষ্ট খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে।

তথাপি আলিপুরদুয়ারের ধুপগুড়ির তারাপদ ঘোষের স্ত্রী একমুঠো অন্নের জন্য নিজের অঞ্চল ত্যাগ করে আলিপুরদুয়ারে এসেছিল। এসেছিল লঙ্গরখানায় একটু খাবার আশায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় লঙ্গরখানায় পৌঁছবার পূর্বে তিন বছরের শিশু সন্তানকে বুকের উপর রেখে ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণত্যাগ করে। প্রায় প্রতিদিন ৬/৭ জন মানুষ অনাহারে মরছে।

সত্যই ধনতান্ত্রিক সমাজে কী সস্তা শ্রমজীবী মানুষের জীবনের মূল্য! যাদের শ্রমে দেশ গড়ে ওঠে, সম্পদ বৃদ্ধি হয়, যাদের সংগ্রামে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে, আজ তারাই পল্লী অঞ্চলে নিরন্ন, মৃত্যুর দিকে অনাহারে পা পা করে এগিয়ে চলেছে।

অথচ এই আলিপুরদুয়ারে রাজ্যপাল ও ত্রাণমন্ত্রী এলেন অবস্থা পরিদর্শনের জন্য। ভোজবাজির মত ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল উধাও হয়ে গেল। সরকারী ব্যবস্থায় ক্ষুধার্ত মানুষকে সরিয়ে দেওয়া হল রাজ্যপাল ও ত্রাণমন্ত্রীর চোখের আড়াল করার জন্য। অমানুষিক আচরণ, ক্ষুধিত মানুষের চীৎকার যেন রাজ্যপাল ও ত্রাণমন্ত্রীর কানে না পেঁছে, কঙ্কালসার মানুষ যাতে রাজ্যপালের চোখে না পড়ে তার জন্য কী ব্যবস্থা! মনুষ্যত্ব ও মানবতা-বোধের থেকে যারা বঞ্চিত তারাই সরকারের পদস্থ আসন দখল করে বসে আছে। এরা এমনভাবে গড়ে উঠেছে, মানবতার আর্তনাদ, জীবনের ক্রন্দনধ্বনি তাদের স্পর্শ করে না। পশুরও স্নেহ-মমতা আছে কিন্তু এরা পশুর থেকেও যে অধম তাদের কার্যকলাপই তার প্রমাণ। এটা কেবল আলিপুরদুয়ার, দিনহাটা এবং হাবড়ার ঘটনা নয়। নিরন্ন মানুষ মৃত্যুর জন্য দিন গুনছে, অথচ হাবড়ায় সরকার থেকে কোন ত্রাণের ব্যবস্থা হয় নি। সরকারী আমলারা দুর্নীতিগ্রস্ত অঞ্চলপ্রধানদের দিয়ে জি আর. এর তালিকা ও বণ্টন ব্যবস্থা করাচ্ছে, যার ফলে দুঃস্থ মানুষ জি. আর. পাচ্ছে না। এখনও সেখানে একটি লঙ্গরখানা খোলা হয় নি।

তাতেই আমরা বলছি—মেহনতী মানুষের জীবনের মূল্য নেই।

॥ উত্তর দাও ॥

১। আলোচনা বলতে কি বোঝ? আলোচনা করলে ছাত্রছাত্রী কোন্ কোন্ দিক থেকে উপকৃত হয়? [উঃ পৃঃ ১৫১]

২। সার্থক ভাবে আলোচনা করতে হলে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার? [উঃ পৃঃ ১৫২-৫৩]

৩। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর:

(ক) বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা, (খ) রবীন্দ্র সাহিত্যে বর্ষা, (গ) শিশু সাহিত্যে নজরুল। [উঃ পৃঃ ১৫৯-৬০/১৫৩-৫৪/১৫৪-৫৫]

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর আলোচনা অভ্যাস কর:

(ক) সাহিত্যপাঠের প্রয়োজনীয়তা (খ বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ও মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ (গ) সমাজসেবা ও ছাত্রসমাজ (ঘ) ছাত্র ধর্মঘট (ঙ) উচ্ছৃঙ্খলতা ও ছাত্রসমাজ (চ) বর্তমান পরীক্ষাব্যবস্থা ও ছাত্রসমাজ (ছ সরকারী কার্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার (জ) ছাত্রসমাজ ও সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি (ঝ) বিদ্যুৎসংকট ও ছাত্রসমাজ (ঞ) স্কুল ফাইনাল সিলেবাসে ছাত্রদের সুবিধা ও অসুবিধা (ট) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান (ঠ) বাণিজ্য ও বাঙালী (ড) সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগর (ঢ) স্কুল ম্যাগাজিন (ণ) বাংলার পশুপক্ষী (ত) কৃষি-সমস্যা (থ) বাংলার বর্তমান গ্রাম।

সপ্তম অধ্যায়

॥ প্রশ্নোত্তর ॥

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রবর্তিত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার বাংলা পাঠ্যক্রমের অন্যতম বিষয় প্রশ্নোত্তর। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বাংলা মৌখিক পরীক্ষাই যখন প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে, তখন আবার 'প্রশ্নোত্তর' দেবার উদ্দেশ্য কি? বস্তুতঃপক্ষে প্রশ্নোত্তরের এই অংশে ছাত্রছাত্রীদের বাংলা সাহিত্য বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা করা হবে। পাঠ্যপুস্তক থেকেও সামান্য কিছু জিজ্ঞাসা করা হতে পারে। কিন্তু সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন, কি ও কেন জাতীয় প্রশ্ন এবং চলতি বিষয়ের (Current Topics) ওপর প্রশ্ন কোনক্রমেই করা হবে না— বোর্ডের প্রাথমিক পাঠ্যক্রম থেকে এমন নির্দেশই আমরা পেয়েছি। উক্ত নির্দেশ অবলম্বন করে আমাদের প্রশ্নোত্তরের বিভাগ রচিত হয়েছে।

কেমন ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ঃ

প্রশ্নোত্তরের এই বিভাগ সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে, শিক্ষক-শিক্ষিকা বা পরীক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের শুধুমাত্র উত্তরদানের ক্ষমতারই বিচার করছেন না, তার ব্যক্তিত্বেরও
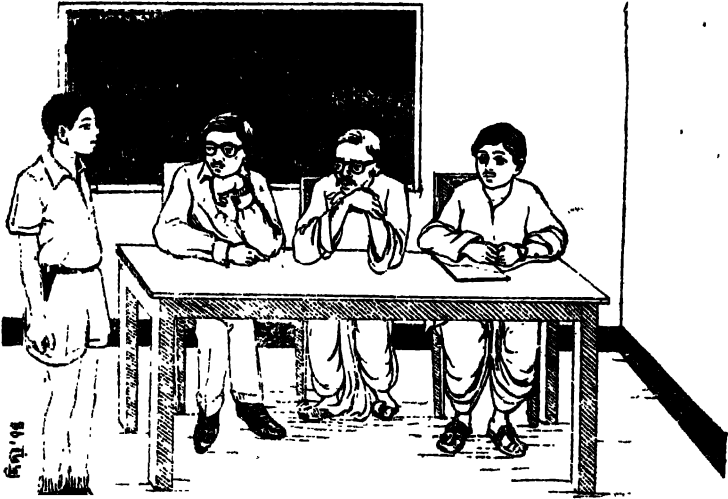
পরীক্ষা করছেন। এই ব্যক্তিত্বের মধ্যে পড়ছে ছাত্রছাত্রীর হাব-ভাব, চাল-চলন, উত্তরদানের ভঙ্গিমা, উপস্থিতবুদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাস। সুতরাং, প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তো দিতে হবেই, আর ঐ উত্তরদানের মধ্যেও একটি স্বাভাবিক সৌন্দর্য বজায় থাকা চাই।

প্রশ্নের উত্তর দ্রুত স্পষ্ট উচ্চারণে এবং জোরালো কণ্ঠে দেওয়া উচিত। কোন প্রশ্নের উত্তরেই চুপ করে থাকা, আমতা আমতা করা বা কোনো রকমের জড়তা দেখানো নিষেধ।

উত্তর জানা না থাকলে তাও স্পষ্টভাবে বিনীত ভঙ্গিতে বলতে হবে, যেমন : উত্তরটা ঠিক বলতে পারছি না, স্যার। কিংবা উত্তর আমার সঠিক মনে পড়ছে না, দিদি। এ ছাড়া প্রশ্নের উত্তরদানের সময় যতদূর সম্ভব "হাঁ" বা "না" শব্দ বর্জন করা উচিত। বক্তব্য যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্য দিয়ে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করতে হবে। কথা না বলে কেবলমাত্র মাথা নেড়ে প্রশ্নের উত্তর দিলে পরীক্ষক বিরক্ত হবেন এবং তিনি খুশী না হলে পরীক্ষার্থী পরীক্ষকের মনে ভালো আবেদন সৃষ্টি করতে পারিবে না।

॥ সাহিত্য সংক্রান্ত সাধারণ প্রশ্নোত্তর ॥

১। সাহিত্য বলিতে কি বোঝ?

—"নিজের কথা, পরের কথা বা বাহ্য জগতের কথা সাহিত্যিকের মনোবীণায় যে সুরে ঝঙ্কৃত হয়, তাহার শিল্প-সঙ্গত প্রকাশই সাহিত্য।" ('কবিতা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

২। সাহিত্যের কাজ কি?

—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের ও ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।"

৩। বাংলা সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত যুগবিভাগ কর।

১। আদিযুগ : আনুমানিক ৮০০—১২০০ খৃঃ

২। মধ্যযুগ : আনুমানিক ৮০০—১৮০০ খৃঃ

(ক) প্রাক্-চৈতন্য যুগ—আনুমানিক ১২০০—১৫০০ খৃঃ

(খ) চৈতন্য-পরবর্তী যুগ—আনুমানিক ১৫০০—১৮০০ খৃঃ

৩। আধুনিক যুগ—আনুমানিক ১৮০০ খৃঃ থেকে বর্তমান কাল।

৪। রূপকথাকে কি জাতীয় সাহিত্য বলা হয়?

—রূপকথা বস্তুতঃ লোকসাহিত্য।

৫। লোকসাহিত্য বলতে কি বোঝ?

—লোকসাহিত্য প্রকৃতপক্ষে কোন একজন লেখকের লেখা নয়। এই সাহিত্য সমগ্র সমাজ মানসেরই সৃষ্টি। লোকের মুখে মুখে এই সাহিত্য সৃষ্টি হয়—এর কোন লিখিত রূপ নেই।

৬। লোকসাহিত্যের মধ্যে কি কি বিভাগ আছে?

(ক) ছড়া, (খ) গীতি, (গ) ধাঁধা এবং (ঘ) কথা—সাধারণভাবে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত। গীতি বলতে আমরা লোকগীতি বুঝি। আর কথার মধ্যে পড়ছে রূপকথা, ব্রতকথা এবং উপকথা। বলা বাহুল্য কোন বিভাগেরই কোন নির্দিষ্ট লেখক নেই।

॥ কবিতা সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ॥

৭। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন গ্রন্থের নাম কি? কত সালে লিখিত হয়?

—চর্যাপদ, সম্পূর্ণ নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকটি রচিত হয়।

৮। আদিযুগের প্রধান প্রধান সাহিত্যিক নিদর্শন কি?

(ক) ধর্মপ্রধান সাহিত্য—চর্যাপদ।

(খ) ধর্মেতর সাহিত্য—ডাক ও খনার বচন, রূপকথা।

৯। মধ্যযুগের প্রধান প্রধান সাহিত্যিক নিদর্শন গ্রন্থগুলির নাম কর।

(ক) প্রাক্-চৈতন্য যুগ—মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী।

(খ) চৈতন্য-পরবর্তী—মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনী কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী।

১০। কয়েকটি মঙ্গলকাব্যের এবং ঐ সমস্ত কাব্যের প্রধান প্রধান কবির নাম কর।

(ক) মনসামঙ্গল কাব্য—প্রধান কবি : বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব।

(খ) চণ্ডীমঙ্গল কাব্য—প্রধান কবি : কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

(গ) ধর্মমঙ্গল কাব্য—প্রধান কবি রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী।

১১। প্রধান প্রধান অনুবাদ কাব্য এবং ঐ সমস্ত কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবির নাম কর।

(ক) অনুবাদ কাব্য : রামায়ণ—শ্রেষ্ঠ কবি : কৃত্তিবাস ওঝা, (খ) অনুবাদ কাব্য : মহাভারত—শ্রেষ্ঠ কবি : কাশীরাম দাস।

১২। প্রধান প্রধান চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলির এবং রচয়িতাদের নাম উল্লেখ কর।

(ক) চৈতন্য ভাগবত—রচয়িতা : বৃন্দাবন দাস।

(খ) চৈতন্যমঙ্গল—রচয়িতা : লোচন দাস।

(গ) " —রচয়িতা : জয়ানন্দ।

(ঘ) চৈতন্য চরিতামৃত—রচয়িতা : কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

১৩। চৈতন্য জীবনীকাব্যগুলির মধ্যে প্রথম গ্রন্থ কোন্‌টি? শ্রেষ্ঠ গ্রন্থই বা কোন্‌টি?

প্রথম গ্রন্থ—চৈতন্য ভাগবত।
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—চৈতন্য চরিতামৃত।

১৪। কয়েকজন বিখ্যাত বৈষ্ণবপদকর্তা বা কবির নাম কর।
প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি : চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি।
চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবি : জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস।

১৫। কয়েকজন বিখ্যাত শাক্ত পদকর্তার নামোল্লেখ কর।
—রামপ্রসাদ সেন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য।

১৬। শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা কে?
—রামপ্রসাদ সেন।

১৭। আধুনিক যুগের কোন্ কবি শাক্ত পদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঐ বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন?
—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

১৮। বাংলা সাহিত্যে যুগসন্ধির কবি কে?
—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

১৯। বাংলা কাব্যসাহিত্যে আধুনিকতা কে এনেছিলেন?
—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

২০। মধুসূদনের প্রধান প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলির নাম কর।
—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা এবং চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

২১। মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ কোন্‌টি ?
—মেঘনাদবধ কাব্য।

২২। ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি মহাকাব্যের নাম কর।
—মধুসূদনের মেঘনাদবধ, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার এবং নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস।

২৩। নবীনচন্দ্রের 'ত্রয়ী' কাব্য বলতে কোন্ কাব্যগুলিকে বোঝানো হয় ?
—রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসকে।

২৪। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক বা প্রধান চরিত্র কে ?
—রাবণ।

২৫। গীতিকবিতা কাকে বলে ?
—কবির মনের আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসকেই বলে গীতিকবিতা।

২৬। বাংলা সাহিত্যে ভোরের পাখী কে ?
—বিহারীলাল চক্রবর্তী। এঁর হাতেই প্রথম সার্থক সচেতন গীতিকবিতার জন্ম।

২৭। বিহারীলালকে ভোরের পাখী আখ্যা দিয়েছিলেন কে ?
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৮। কোন্ বাঙালী কবি সর্বপ্রথম বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন ?
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৯। রবীন্দ্রনাথ কোন্ কাব্যগ্রন্থের জন্য বিশ্ববিখ্যাত হন ?
—স্বরচিত গীতাঞ্জলি কাব্য-গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের জন্য।

৩০। রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের কয়েকজন বিখ্যাত কবির নাম কর।
—বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

৩১। এই সমস্ত কবিদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ কোনগুলি ?

বিহারীলাল—সারদামঙ্গল
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—মহিলা
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—স্বপ্নপ্রয়াণ
দেবেন্দ্রনাথ সেন—অশোকগুচ্ছ
অক্ষয়কুমার বড়াল—এষা
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—মন্দ্র

৩২। রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের কয়েকজন খ্যাতিময়ী মহিলা কবির নাম কর।
—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু এবং কামিনী রায়।

৩৩। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রধান প্রধান কাব্যগ্রন্থের নাম কর।
—সোনার তরী, মানসী, ক্ষণিকা, খেয়া, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, মহুয়া, পুনশ্চ, সেঁজুতি, আরোগ্য ইত্যাদি।

৩৪। রবীন্দ্র পর্বের কয়েকজন বিখ্যাত কবির নাম বল।

—প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায় ইত্যাদি।

৩৫। আধুনিক কয়েকজন কবির নামোল্লেখ কর।

—জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

॥ উপন্যাস ও ছোটগল্প সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ॥

১। ছোটগল্প ও উপন্যাসের পার্থক্য কি, দু' একটি বাক্যে উত্তর দাও।

—ছোটগল্প জীবনের একটি খণ্ডাংশ নিয়ে রচিত হয়, কিন্তু উপন্যাস জীবনের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দান করে। ছোটগল্প পাঠান্তে পাঠক-পাঠিকার মনে একটা অতৃপ্তির রেশ থেকে যায়। কিন্তু উপন্যাসে পাঠক-পাঠিকার সমস্ত কৌতূহল চরিতার্থ হয়।

২। বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস কি? রচয়িতা কে?

—ফুলমণি ও করুণার বিবরণ, রচয়িতা শ্রীমতী ম্যুলেন্স (১৮৫২)।

৩। সত্যিকারের উপন্যাসের লক্ষণ প্রথম কার লেখায় কোন্ বইতে পাওয়া যায়?

—প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ।

৪। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক কে? এবং উপন্যাসটির নাম কি?

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)।

৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কয়েকটি উপন্যাসের নাম কর।

—কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, রাজসিংহ ইত্যাদি।

৬। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কয়েকজন ঔপন্যাসিকের নাম এবং তাঁদের রচিত কয়েকটি উপন্যাসের নাম কর।

—রমেশচন্দ্র দত্ত—মাধবীকঙ্কণ, রাজপুত জীবনসন্ধ্যা, মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত।

—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কণ্ঠমালা, মাধবীলতা, দামিনী।

—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—স্বর্ণলতা।

—স্বর্ণকুমারী দেবী—স্নেহলতা, বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী।

—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—কঙ্কাবতী।

—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কল্পতরু।

৭। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী সার্থক ঔপন্যাসিক কে? তাঁর রচিত কয়েকটি উপন্যাসের নাম কর।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, শ্রীকান্ত, মেজদিদি, নিষ্কৃতি, গৃহদাহ, পল্লীসমাজ, চরিত্রহীন, পথের দাবী, শেষপ্রশ্ন ইত্যাদি।

৮। বাংলা সাহিত্যে সার্থক ছোটগল্প-রচয়িতা কে? তাঁর বিখ্যাত গল্প সংকলনটির নাম কি?

—রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ।

৯। রবীন্দ্র সমসাময়িক কয়েকজন ছোটগল্পকারের নাম উল্লেখ কর।

—প্রমথ চৌধুরী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

১০। বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন হাস্যরসাত্মক গল্পরচয়িতার নাম কর।

—প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।

১১। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকারের নাম উল্লেখ কর।

—বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু, প্রবোধ সান্যাল, নারায়ণ গংগোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, বাণী রায়, প্রতিভা বসু, লীলা মজুমদার ইত্যাদি।

১২। বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন মহিলা ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকারের নাম কর।

স্বর্ণকুমারী দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, বাণী রায়, প্রতিভা বসু, লীলা মজুমদার ইত্যাদি।

১৩। নিম্নলিখিত ছদ্মনামগুলি কোন্ কোন্ লেখকের ?

টেকচাঁদঠাকুর—প্যারীচাঁদ মিত্র
হুতোম—কালীপ্রসন্ন সিংহ
বীরবল—প্রমথ চৌধুরী
পরশুরাম—রাজশেখর বসু
বনফুল—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
প্র. না. বি.—প্রমথনাথ বিশী
কালকূট—সমরেশ বসু
শংকর—মণিশংকর মুখোপাধ্যায়
স্বপনবুড়ো—অখিল নিয়োগী
মৌমাছি—বিমল ঘোষ

১৪। আধুনিক যুগে সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন এমন কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর।

কবিতায়—সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি।

উপন্যাসে—বিমল মিত্র, সুবোধ ঘোষ, শংকর, বিমল কর, জরাসন্ধ, সন্তোষ ঘোষ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গংগোপাধ্যায় ইত্যাদি।

ছোটগল্পে—সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, রমাপদ চৌধুরী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

১৫। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাসগুলির নামোল্লেখ কর।

—রাজর্ষি, গোরা, চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা, যোগাযোগ।

১৬। নিম্নোক্ত চরিত্রগুলি কোন্ কোন্ গল্পে বা উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে?

মিনি, খোকাবাবু, ফটিক, ইন্দ্রনাথ, জয়রাম মুখোপাধ্যায়, গোরা, অমিত, কুমু, আনন্দময়ী, অপু, শ্রীকান্ত, নিখিলেশ, সূর্যমুখী।

মিনি—কাবুলীওয়ালা; অপু—পথের পাঁচালী; খোকাবাবু—খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন; শ্রীকান্ত—শ্রীকান্ত; নিখিলেশ—ঘরে বাইরে; গোরা—গোরা; অমিত—শেষের কবিতা; ফটিক—ছুটি; সূর্যমুখী—বিষবৃক্ষ; কুমু—যোগাযোগ; আনন্দময়ী—গোরা; ইন্দ্রনাথ—শ্রীকান্ত। জয়রাম—আদরিণী।

॥ প্রবন্ধ সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ॥

১। প্রবন্ধ কাকে বলে?

—"সাধারণতঃ কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া লেখক কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেন, তাহাকেই প্রবন্ধ বলা হয়।"

২। বাংলা গদ্যের প্রথম প্রবন্ধকার কে?

—রাজা রামমোহন রায়।

৩। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্যগ্রন্থটির নাম কি? রচয়িতা কে?

—রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রম্। রামরাম বসু (১৮০১)

৪। বাংলা গদ্যের জনক বলা হয় কাকে? তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর।

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাসুদেব চরিত, বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, বোধোদয়, কথামালা ইত্যাদি।

৫। বিদ্যাসাগরের পরবর্তী কয়েকজন সার্থক গদ্য-রচয়িতার নাম কর।

—অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬। নিম্নে উদাহৃত লেখকদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নামোল্লেখ কর।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার—রাজাবলি
অক্ষয়কুমার দত্ত—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়
ভূদেব মুখোপাধ্যায়—সামাজিক প্রবন্ধ
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আত্মজীবনী
কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম প্যাঁচার নক্সা

৭। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম কর।

—কমলাকান্তের দপ্তর, বিবিধ প্রবন্ধ, সাম্য, কৃষ্ণচরিত্র ইত্যাদি।

৮। নিম্নলিখিত লেখকবৃন্দের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ কর।

—শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, আত্মস্মৃতি।

—স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, পরিব্রাজক।

—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—পালামৌ।

৯। বঙ্কিমোত্তর কয়েকজন প্রবন্ধকারের নাম উল্লেখ কর।
—শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ।

১০। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকার নাম কি?
—বঙ্গদর্শন।

১১। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম কর।
—জীবনস্মৃতি, আত্মপরিচয়, ছেলেবেলা—আত্মজীবনীমূলক
—সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য—সাহিত্য বিষয়ক
—পঞ্চভূত, বিচিত্র প্রবন্ধ, লিপিকা—আত্মনিষ্ঠ
—শিক্ষা, স্বদেশ, কালান্তর, সভ্যতার সংকট—শিক্ষা, রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক
—ধর্ম, শান্তিনিকেতন—ধর্ম বিষয়ক
—শব্দতত্ত্ব, ছন্দ, বাংলাভাষা পরিচয়—ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ বিষয়ক
—বিশ্বপরিচয়—বিজ্ঞান বিষয়ক।

॥ নাটক সংক্রান্ত প্রশ্ন ॥

১। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাটক কি? রচনা করেন কে?
—বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাটক 'দি ডিসগাইস' নামক ইংরেজী নাটকের অনুবাদ। অনুবাদের নাম 'কাল্পনিক সংবদল'। রাশিয়ান লেবেডফ্ এবং বাঙ্গালী গোলকদাসের সহযোগিতায় এই নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৭৯৫ সালে।

২। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক নাটক কে কত খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন?
—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে দুটি মৌলিক নাটক প্রকাশিত হয়—ভদ্রার্জুন এবং কীর্তিবিলাস। প্রথম নাটকটির রচয়িতা তারাচরণ শিকদার, দ্বিতীয়টির যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত।

৩। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাট্যকার কে? তাঁর রচিত নাটকটির নাম কি?
—রামনারায়ণ তর্করত্ন। কুলীন কুল-সর্বস্ব, রচনাকাল ১৮৫৪।

৪। বাংলা নাটকে আধুনিকতা প্রতিষ্ঠিত করেন কে?
—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৫। মধুসূদনের কয়েকটি বিখ্যাত নাটকের নামোল্লেখ কর।
—পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা?

৬। ট্র্যাজেডি কাকে বলে?
—"আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত মানবজীবনের করুণ কাহিনীকে সাধারণতঃ ট্র্যাজেডি বলা হয়।"

৭। বাংলা নাটকের প্রথম ট্র্যাজেডি কি?
—মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী।

৮। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক কোনটি?
—মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী।

৯। দীনবন্ধু মিত্র কোন্ নাটকের জন্য বিখ্যাত?
—নীলদর্পণ।

১০। নীলদর্পণ নাটকের বিষয়বস্তু কি ?

—অতিরিক্ত লাভের জন্য ইংরেজ নীলকররা কি ভাবে বাংলার চাষীদের ওপর মর্মান্তিক অত্যাচার করতো, তার অপূর্ব চিত্র এই নাটকে ফুটে উঠেছে।

১১। গিরিশচন্দ্র ঘোষের কয়েকটি বিখ্যাত নাটকের নাম কর।

—জনা, সিরাজদ্দৌলা, প্রফুল্ল ইত্যাদি।

১২। সবীতা, পাষাণী, পরপারে, মেবারপতন, সাজাহান ইত্যাদি নাটকের রচয়িতা কে ?

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

১৩। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েকটি নাটকের নাম কর।

কাব্যনাট্য—বিসর্জন, মালিনী, রাজা ও রানী

কৌতুকনাট্য—চিরকুমার সভা

সংকেতনাট্য—রক্তকরবী, মুক্তধারা, রাজা, ডাকঘর

১৪। নিম্নোক্ত চরিত্রগুলি কোন্ কোন্ নাটকে আবির্ভূত হয়েছে ?

অমল, জয়সিংহ, উপনন্দ, নন্দিনী, নক্ষত্র রায়, ভীষ্ম, প্রফুল্ল, তোরাপ নিমচাঁদ, কেদার, নববাবু, কৃষ্ণকুমারী, বৈকুণ্ঠ।

প্রফুল্ল-দেবীচৌধুরাণী, তোরাপ—নীলদর্পণ, নিমচাঁদ—সধবার একাদশী, কেদার—বৈকুণ্ঠের খাতা, নববাবু—একেই কি বলে সভ্যতা, কৃষ্ণকুমারী—কৃষ্ণকুমারী, বৈকুণ্ঠ—বৈকুণ্ঠের খাতা, অমল—ডাকঘর, জয়সিংহ—বিসর্জন, উপনন্দ—অচলায়তন, নন্দিনী—রক্তকরবী, নক্ষত্র রায়—বিসর্জন, ভীষ্ম—ভীষ্ম।

॥ পাঠ্যাংশ হইতে প্রশ্ন-সংকেত ॥

[পাঠ্য বহির্ভূত প্রশ্ন ছাড়া পাঠ্যান্তর্গত বিষয় থেকেও মৌখিক পরীক্ষায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের সংকেত দেওয়া হল।]

১। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি তোমার পাঠ্যান্তর্গত কোন্ কোন্ গদ্যাংশে বা পদ্যাংশে পেয়েছো তা রচয়িতার নাম সহ উল্লেখ কর।

(ক) অতি বড় তুচ্ছ যা তাই ভালোবাসি আমরা সবাই—ছোটোর দাবি

(কুমুদরঞ্জন মল্লিক)

(খ) মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে

—দুই বিঘা জমি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(গ) আমাদের গ্রহবৈগুণ্যে বাঁকেনি, চোরেনি, নড়ে যায় নি ; আমাদের জিওগ্রাফিতে তার যেখানে স্থান ঠিক সেই জায়গাটিতে সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

—ভানুসিংহের পত্র (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(ঘ) তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিকে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিসাবে তুমিও একজন দেশ আবিষ্কারক।

—অচেনার আনন্দ (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

(ঙ) স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। —জীবনস্মৃতি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(চ) হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম উপার্জন! — সিদ্ধার্থ ও বিম্বিসার (নবীনচন্দ্র সেন)

(ছ) অন্তরে লভেছি তব বাণী,
তাইতো মানিনা ভয় জীবনের জয় হবে জানি"
—রবীন্দ্রনাথের প্রতি—(বুদ্ধদেব বসু)

(জ) তুমি আমাদের আদর্শ নহ, তুমি আমাদের প্রাপ্ত নহ, ভগবানের দান।
সীতা—রামায়ণী কথা (দীনেশচন্দ্র সেন)

(ঝ) "ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর তবে ত্যাগ কর।"
—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (স্বামী বিবেকানন্দ)

(ঞ) বকের পাখায় আলোক লুকায় ছাড়িয়া পূবের মাঠ। —হাট (যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

(ট) দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী, নিত্য নাটের খেলা। —হাট (যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

(ঠ) তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!
—দুই বিঘা জমি (রবীন্দ্রনাথ)

(ড) নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি। —দুই বিঘা জমি (রবীন্দ্রনাথ)

(ঢ) মুদে আসে আঁখি পাতা যেন কী আরামে। —মধ্যাহ্নে (অক্ষয়কুমার বড়াল)

(ণ) খসে খসে পড়ে পাতা মনে পড়ে কত গাথা —মধ্যাহ্নে (অক্ষয়কুমার বড়াল)

(ত) এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া!
—মেজদা (শরৎচন্দ্র)

(থ) লাও তো বটে, কিন্তু আনে কে! —মেজদা (শরৎচন্দ্র)

(দ) জীবনে এই প্রথম বাধাহীন, গণ্ডিহীন, মুক্তির উল্লাসে তাহাদের তাজা তরুণ রক্ত তখন মাতিয়া উটিয়াছিল... —অচেনার আনন্দ (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

(ধ) আমাদের ভাগ্যদেবতা বিনা অনুমতিতে আমাদের এ গাড়িতেও চড়ে বসেছেন।···
—ভানুসিংহের পত্র (রবীন্দ্রনাথ)

(ন) আমরা অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরান বাসন কিনিতে পারিব না।
—ঠাকুরদাসের বাল্যশিক্ষা (ঈশ্বরচন্দ্র)

(প) কিন্তু কী অমায়িক ছিলেন এই জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী!
—লুই পাস্তুর (চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য)

২। নিম্নলিখিত চরিত্রগুলি তোমার পঠিত কোন্ কোন্ গদ্যাংশে বা পদ্যাংশে আবির্ভূত হয়েছে তা রচয়িতার নাম সহ উল্লেখ কর:

সরমা, বিদুর, রামপ্রসাদ, দুর্গা, ছিনাথ, উপেন, কৈলাস মুখুজ্যে, শ্যাম, মোক্ষদা, কেষ্টা, দ্বারিকবাবু, গগনবাবু, নেপোলিয়ন, হুগো।

—সরমা— ছোটোর দাবি (কুমুদরঞ্জন মল্লিক)। বিদুর—ছোটোর দাবি (কুমুদরঞ্জন মল্লিক)। রামপ্রসাদ—ছোটোর দাবি (কুমুদরঞ্জন মল্লিক)। দুর্গা—অচেনার আনন্দ (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। ছিনাথ—মেজদা (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। উপেন—দুই

বিঘা জমি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। কৈলাস মুখুজ্জে—জীবনস্মৃতি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। শ্যাম—জীবনস্মৃতি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। মোক্ষদা—দেবতার গ্রাস—কথা ও কাহিনী (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। কেষ্টা—পুরাতন ভৃত্য-কথা ও কাহিনী (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। দ্বারিকবাবু, গগনবাবু—মেজদা—(শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। নেপোলিয়ন, হুগো—লুই পাস্তুর (চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ।)

৩। সমাস ও সন্ধির পার্থক্য কি ?

(ক) পদে পদে মিলন সমাস ; বর্ণে বর্ণে মিলন সন্ধি ।

(খ) সমাসের পদগুলি অর্থপূর্ণ ; সন্ধিতে বর্ণদ্বয়ের পারস্পরিক সন্নিহিত, অর্থ আবশ্যিক নয় ।

(গ) সমাসে বহুপদের একপদে পরিণতি ; সন্ধির লক্ষ্য উচ্চারণ সৌন্দর্য ।

(ঘ) সমাসে পূর্বপদে বিভক্তি লোপ ; সন্ধিতে ধ্বনি লোপ ।

৪। সাধু ও চলতি ভাষার পার্থক্য কি ?

(ক) সাধুভাষায় প্রাচীন ও তৎসম শব্দের ব্যবহার বেশী, পদস্থাপনরীতি জটিল, সমাস-বদ্ধ পদ প্রচুর। অপরপক্ষে চলতি ভাষা প্রাচীন শব্দ বর্জিত, তৎসম পদের ব্যবহার কম, পদবন্ধ অনেক স্বাধীন ।

(খ) সংস্কৃতানুগ সাধুভাষা মন্থরগতি, অপরপক্ষে চলতি ভাষার মধ্যে রয়েছে সজীব প্রাণময়তা ও লঘুগতি ।

(গ) ইডিয়মের যথাযথ প্রয়োগ সাধু ভাষায় সম্ভব নয়, কিন্তু চলতি ভাষা প্রবাদ, প্রবচন, বিশিষ্টার্থক শব্দ সমন্বয়ে অনেক শ্রীময়ী ।

(ঘ) সাধুভাষা বিদেশী শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল, অপরপক্ষে চলতিভাষা বহু বিদেশী শব্দ ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ।

(ঙ) সাধুভাষা ও চলতি ভাষায় ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের প্রয়োগক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় ।

৫। ছাত্রছাত্রীরা পাঠ-সংকলন (১ম খণ্ড), জীবনস্মৃতি, কাব্য সংকলন ইত্যাদি গ্রন্থ হতে কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্নও তৈরী করে রাখবে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

॥ ছোটর দাবী ॥

১। 'দ্বারাবতীর ঘটা' কথাটির অর্থ কি ? কি প্রসঙ্গে কবি এর উল্লেখ করেছেন ?

২। বুঝিয়ে দাও ঃ (ক) বিদুরক্ষুদের সৌরভ (খ) বুদ্ধদেবের বুকে কাতর হৃদে, (গ) রামের মিলন গুহক গৃহে ।

॥ মধ্যাহ্নে ॥

১। 'মধ্যাহ্নে' কবিতাটিকে কি জাতীয় কবিতা বলা যেতে পারে ?

(উঃ নিসর্গমূলক কবিতা)

২। কবিতাটি কে লিখেছেন ? ঐ কবির লেখা অন্য কোন কবিতা পড়েছ কি ?

[অক্ষয়কুমার বড়াল ; হ্যাঁ, শ্রাবণে]

৩। বুঝিয়ে দাও ; (ক) ডাকে কুবো 'কুব্, কুব্' লুকায়ে কোথায় ।

(খ) অন্যমনে চাহি চাহি কত ভাবি, কত গাহি

পড়িছে গভীর শ্বাস গানের বিরামে ।

॥ দুই বিঘা জমি ॥

১। 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটিতে প্রধান দুটি চরিত্র কে কে ?

২। উপেনের অভিযোগের মূল কথাটা কি ?

৩। বুঝিয়ে দাও : (ক) তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।

(খ) সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া ।

॥ হাট ॥

১। 'হাট' কবিতাটিকে কি জাতীয় কবিতা বলা যায় ? কেন এই শ্রেণীবিভাগ তা' দু' একটি কথায় বুঝিয়ে দাও ।

[উঃ রূপক কবিতা ; মানবজীবনের সঙ্গে হাটের সাযুজ্য কবি দেখিয়েছেন ।]

২। বুঝিয়ে দাও : (ক) উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে চিরকাল একই খেলা ; (খ) কত না ছিন্ন চরণ-চিহ্ন ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে ; (গ) বকের পাখায় আলোক লুকায় ছাড়িয়া পূবের মাঠ ।

৬। (ক) 'মেজদা' গল্পটি শরৎচন্দ্রের কোন্ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে ?

[উঃ শ্রীকান্ত (১ম পর্ব)]

(খ) 'অচেনার আনন্দ' বিভূতিভূষণের কোন্ উপন্যাসের অন্তর্গত ?

[উঃ পথের পাঁচালী]

(গ) 'ভানুসিংহের পত্র' রবীন্দ্রনাথের কোন্ গ্রন্থের অন্তর্গত ? ভানুসিংহ কে ? তিনি কোথা থেকে কাকে এই পত্র লিখেছিলেন ?

[উঃ ভানুসিংহের পত্রাবলী ; রবীন্দ্রনাথ ; ব্রুকসাইড, শিলং থেকে ফণীন্দ্রনাথ অধিকারীর কন্যা রানুকে এই পত্র লিখেছিলেন ।]

(ঘ) বিদ্যাসাগরের লেখা কোন রচনা কি তুমি পাঠ-সংকলনে পড়েছো ? ঐ রচনাটি বিদ্যাসাগরের কোন্ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ?

[উঃ হ্যাঁ, পড়েছি—ঠাকুরদাসের বাল্যশিক্ষা । ঐ রচনাটি বিদ্যাসাগরের লেখা 'বিদ্যাসাগর চরিত' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত]

(ঙ) 'লুই পাস্তুর' প্রবন্ধটির রচয়িতা কে ? উক্ত প্রবন্ধটি লেখকের কোন্ বইতে আছে বলতে পারো ?

[উঃ লুই পাস্তুর প্রবন্ধটির রচয়িতা চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য । এই প্রবন্ধটি লেখকের "বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী" থেকে গৃহীত হয়েছে ।]

৭ । ভিন্নজাতীয় আরও কয়েকটি প্রশ্ন :

(ক) রামপ্রসাদের বেড়ার ধারে দেখেই যে হয় হিংসা মনে—এখানে কবি রামপ্রসাদের কোন্ কাহিনীর প্রতি ইংগিত করেছেন ?

[উঃ রামপ্রসাদ যখন বেড়া বাঁধছিলেন, সেই সময় মা কালী কেমন ভাবে এসেছিলেন, সেই কাহিনীটি বলতে হবে ।]

(খ) ভুলতে নারি অশোক-কানন—কবি অশোক-কাননের কি ভুলতে পারেন না ?

[উঃ কবি অশোক-কাননে সীতা-সরমার বন্ধুত্বের কথা ভুলতে পারেন না ।]

(গ) 'ওটা রেখে দাও, তোমার কাজে লাগবে'—উক্তিটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে ? মূল গ্রন্থটি কি ? লেখকের নাম কি ? উক্তিটি কে কাকে করেছেন ?

[উঃ উক্তিটি 'মেজদা' নামক রচনাংশ থেকে করা হয়েছে । মূল গ্রন্থের নাম শ্রীকান্ত (১ম পর্ব)। লেখকের নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উক্তিটি পিসীমা পিসেমশাইকে করেছিলেন।]

[প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করতে পারেন ঐ পিসীমা কার পিসীমা—উত্তর হবে শ্রীকান্তের পিসীমা (শরৎচন্দ্রের নয়)।]

৮ । (ক) একটি কুকুর একটি মেষপালককে তাড়া করছে—মেষপালকটি বাধা দিচ্ছে—উক্তিটি কোন্ রচনার অংশ ? প্রসঙ্গটি কি বলো তো ?

[উঃ লুই পাস্তুর ; লুই পাস্তুরের স্মরণে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্তির বিষয়বস্তু এটি ।]

(খ) ফরাসী দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ লোক কে এই বিষয়ে একবার ভোট নেওয়া হয়েছিল । ঐ ভোটের ফলাফল কি হয়েছিল ?

[উঃ ভোটের ফলাফলে লুই পাস্তুর প্রথম, নেপোলিয়ন দ্বিতীয় এবং ভিক্টর হুগো তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন ।]

(গ) লুই পাস্তুর জগদ্বিখ্যাত কেন ?

[উঃ জলাতঙ্ক রোগের কারণ এবং নিবারণের পদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য ।]

৯ । (ক) 'আমরা অজ্ঞানিত লোকের নিকট হইতে পুরানো বাসন ক্রয় করিতে পারিব না'—উক্তিটি কাদের ? তারা কাকে এই উক্তি করেছিল ? তিনি কেন বাসন বিক্রয় করতে গিয়েছিলেন ? কেন তারা ঐ বাসন ক্রয় করতে চায় নি ?

(খ) 'মা টের পেলে, কিন্তু পিঠের ছাল তুলবে'—উক্তিটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? মূল গ্রন্থটির নাম কি? কে কাকে এই উক্তি করেছিল?

[প্রশ্ন দুটির উত্তরের জন্য পাঠ-সংকলনের 'ঠাকুরদাসের বাল্যশিক্ষা' এবং 'অচেনার আনন্দ' দ্রষ্টব্য]

১০। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

ক) বঙ্গের বধূ বুকভরা মধু জল লয়ে আসে ঘরে······

খ) তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ······

গ) অতি বড়ো তুচ্ছ যা তাই······

ঘ) ······ মেঠো পথ দিয়া

ঙ) ······ উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে······

চ) তপস্যা করিয়া গায়ত্রী······

ছ) ······ দূর্বাদল শ্যাম

এই জাতীয় প্রশ্নে সাফল্য লাভের একমাত্র উপায় ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তকগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখা এবং পড়া।

আধুনিক মৌখিক বাংলা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অনুসারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় নিম্নলিখিত রীতিতে বাংলা মৌখিকের প্রশ্ন ও নম্বর বিভক্ত হবে ঃ

১। (ক) সহায়ক পাঠ (গদ্য) থেকে
কয়েকটি প্রশ্ন ৮

(খ) সহায়ক পাঠ (পদ্য) থেকে
কয়েকটি প্রশ্ন ৭

(গ) পাঠ-সংকলন থেকে
দুটি প্রশ্ন ৫

২০

২। সহায়ক পাঠ (গদ্য বা নাট্যাংশ)
থেকে পাঠ (একটি ছোট অংশ) ৫

৩। সহায়ক পাঠ (পদ্য) থেকে
কোন কবিতার আবৃত্তি (বই না দেখে) ··· ১০
(মুখস্থ ঃ ৮, ভঙ্গী ঃ ২)

উত্তরদানের বাচন বা প্রকাশ-ভঙ্গী ৫

২০

মোট ঃ ২০ + ২০ = ৪০

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

* কেবলমাত্র বিদ্যালয়-নির্বাচিত গদ্য সহায়ক পাঠ, পদ্য সহায়ক পাঠ এবং পাঠ-সংকলন থেকে মৌখিক পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে।
* বিদ্যালয়-নির্বাচিত পদ্য সহায়ক পাঠের বিদ্যালয় নির্বাচিত পাঁচটি কবিতার মধ্যে আবৃত্তি সীমাবদ্ধ থাকবে।
* বিদ্যালয়-নির্বাচিত গদ্য সহায়ক পাঠ থেকে অংশ বিশেষ পাঠ করতে দেওয়া হবে।

আধুনিক মৌখিক বাংলা

প্রথম অধ্যায়

॥ প্রশ্নোত্তর ॥

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রবর্তিত নবতম মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা (মৌখিক) পাঠ্যক্রমের অন্যতম প্রধান বিষয় প্রশ্নোত্তর। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বাংলা মৌখিক পরীক্ষাই যখন প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে, তখন আবার 'প্রশ্নোত্তর' দেবার উদ্দেশ্য কি ? বস্তুতঃপক্ষে প্রশ্নোত্তরের এই অংশে ছাত্রছাত্রীদের, নিজ-নিজ বিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত সহায়ক পাঠ্য গ্রন্থ (গদ্য এবং কবিতা) এবং পাঠ-সংকলন থেকে ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে।

কেমন ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ঃ

(ক) প্রশ্নোত্তরের এই বিভাগ সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে, শিক্ষক-শিক্ষিকা বা পরীক্ষক ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে তাঁর **প্রশ্নের যথাযথ উত্তর**
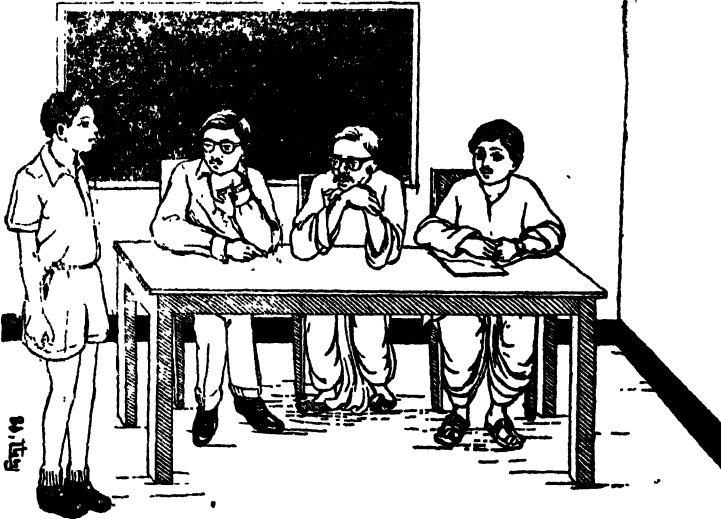
একটি ছাত্র প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে

যেমন চাইছেন তেমনি তার ব্যক্তিত্বেরও পরীক্ষা করছেন। সঠিক উত্তর দিতে গেলে মূল গ্রন্থ পুংখানুপুংখভাবে পড়া প্রয়োজন। (পরীক্ষক ছাত্রছাত্রীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা করবেন তার হাব-ভাব, চাল-চলন, উত্তরদানের ভঙ্গিমা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাস দেখে। সুতরাং, প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তো দিতে হবেই, আর ঐ উত্তরদানের মধ্যেও একটি স্বাভাবিক সৌন্দর্য বজায় থাকা চাই।)

(খ) প্রশ্নের উত্তর দ্রুত স্পষ্ট উচ্চারণে এবং জোরালো কণ্ঠে দেওয়া উচিত।

(গ) কোন প্রশ্নের উত্তরেই চুপ করে থাকা, আমতা আমতা করা বা কোন রকমের জড়তা দেখানো নিষিদ্ধ।

(ঘ) উত্তর জানা না থাকলে তাও স্পষ্টভাবে বিনীত ভঙ্গিতে বলতে হবে, যেমন ঃ 'উত্তরটা ঠিক বলতে পারছি না, স্যার।' কিংবা 'উত্তর আমার সঠিক মনে পড়ছে না, দিদি।'

(ঙ) এ ছাড়া প্রশ্নের উত্তরদানের সময় যতদূর সম্ভব "হ্যাঁ" বা "না" শব্দ বর্জন করা উচিত।

(চ) বক্তব্য যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্য দিয়ে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করতে হবে।

(ছ) কথা না বলে কেবলমাত্র মাথা নেড়ে প্রশ্নের উত্তর দিলে পরীক্ষক বিরক্ত হবেন এবং তিনি খুশী না হলে পরীক্ষার্থী পরীক্ষকের মনে ভালো আবেদন সৃষ্টি করতে পারবে না।

পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে ক্রমশঃ বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তক থেকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ও উত্তর দেওয়া হল।

ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, উত্তরদানের বাচন ও প্রকাশভঙ্গীর জন্য পাঁচ নম্বর নির্ধারিত আছে। সুতরাং শুধু উত্তর দিলেই পুরো নম্বর পাওয়া যাবে না; পুরো নম্বর পেতে হলে বাচন ও প্রকাশভঙ্গীর জন্য নির্ধারিত পাঁচটি নম্বরও পেতে হবে।

মৌখিক পরীক্ষার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুতরাং পরীক্ষা কক্ষে ঢোকা থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত পরীক্ষার্থীর আচরণ সম্বন্ধে পরীক্ষক নজর রাখবেন। সেইজন্য পরীক্ষাকক্ষে ঢোকা থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত পরীক্ষার্থীকে সোজা হয়ে চলতে হবে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে, ভদ্র ও বিনীত আচরণ করতে হবে। মুহূর্তের অসাবধানতা ও অসঙ্গত আচরণ পরীক্ষার্থীর ক্ষতির কারণ হবে।

॥ সহায়ক পাঠের প্রশ্নোত্তর ॥

(গদ্য)

জীবনস্মৃতি

['মৌখিক' পরীক্ষার সহায়ক পাঠ (গদ্য) থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে। প্রশ্ন চলিত বাংলায় করা হবে, সুতরাং উত্তরও চলিত ভাষায় দিতে হবে। এখানে কয়েকটি সার্থক প্রশ্নোত্তরের উদাহরণ দেওয়া হল। ছাত্রছাত্রীরা তাদের বিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত সহায়ক পাঠ্য গ্রন্থ দুটি যেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে রাখে।]

প্রশ্ন ১। 'জীবনস্মৃতি' কে লিখেছেন ?

উত্তর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রঃ ২। এই বইটিকে কি জাতীয় গ্রন্থ বলা হয় ?

উঃ। জীবনস্মৃতি আত্মজীবনীমূলক রচনা।

প্রঃ ৩। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে লেখকের আলোচ্য বিষয় কি ?

উঃ। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শৈশব, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের ঘটনাবলী, বিশেষতঃ তাঁর আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কবিত্বশক্তি ইত্যাদি ঐ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। এক কথায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরঙ্গ জীবনের স্মৃতিচিত্রণ করেছেন এই গ্রন্থে।

প্রঃ ৪। "আমরা তিনটি বালক একসঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম।"—উক্তিটি কোন্ রচনার অন্তর্গত ? ঐ রচনাটির লেখক কে ? তিনটি বালক কে কে ?

উঃ। উক্তিটি 'জীবনস্মৃতি'র অন্তর্গত। লেখক রবীন্দ্রনাথ। তিনটি বালকের একটি বক্তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় জন অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথ এবং অন্য একজন ভাগ্নে সত্যপ্রসাদ।

(**সহায়ক পাঠের যে কোন বাক্য, বাক্যাংশ বা উক্তি কিংবা মন্তব্য উদ্ধৃত করে পরীক্ষক কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে এবং লেখক কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। ছাত্রছাত্রীরা এ সম্বন্ধে সচেতন থাকবে।)

প্রঃ ৫। কবির বাল্যজীবনে কোন্ কবিতা বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল ?

উঃ 'জল পড়ে পাতা নড়ে' কবির জীবনে আদিকবির প্রথম কবিতা। এই পংক্তিটির অন্তর্নিহিত মিল কবির মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্রঃ ৬। 'আমার জীবনে এইটিই আদিকবির প্রথম কবিতা'।—এখানে কার কথা বলা হয়েছে ? আদিকবি বলতে কাকে বুঝানো হয়ে থাকে ? বক্তার জীবনের আদিকবি কে ? তাঁর কোন্ কবিতার কথা এখানে বলা হয়েছে ?

উঃ। এখানে রবীন্দ্রনাথের কথা বলা হয়েছে। আদিকবি বলতে আমরা রামায়ণস্রষ্টা বাল্মীকিকেই বুঝি। বক্তার জীবনের আদিকবি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর রচিত 'বর্ণপরিচয়'-এর অন্তর্গত 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র কথা এখানে বলা হয়েছে।

প্রঃ ৭। 'ওই ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত'— ঐ ছড়াটি কি ? মেঘদূত কি ? ছড়াটিকে রবীন্দ্রনাথ শৈশবের মেঘদূত বলেছেন কেন ?

উঃ। ছড়াটি হচ্ছে ঃ 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান'।

'মেঘদূত' মহাকবি কালিদাসের বিখ্যাত খণ্ড কাব্য। এই কাব্যে মেঘকে দূত করে নির্বাসিত যক্ষ তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বার্তা প্রেরণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বলতে চান ঐ ছড়াটি যেন তাঁর কাছে মেঘদূতের মত—'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'··· মনে পড়লেই শৈশবের সাহিত্য-রসভোগের স্মৃতি তাঁর মনে জেগে ওঠে।

প্রঃ ৮। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ কোন্ স্কুলে হয়েছিল ? এই সময় কোন্ কোন্ গ্রন্থ তাঁর মনকে আকর্ষণ করেছিল ?

উঃ। ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ; এই সময় চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ শিশু রবীন্দ্রনাথের মনকে আকর্ষণ করেছিল।

প্রঃ ৯। রবীন্দ্রনাথ প্রথম কোন্ স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন ? ঐ বিদ্যালয়ের কোন্ স্মৃতি তাঁর মনে আছে ? এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত কি ?

উঃ। রবীন্দ্রনাথ প্রথম ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হয়েছিলেন। ঐ স্কুলে কি কি পড়েছিলেন পরিণত বয়সে তার একটুও কবির মনে নেই, তবে একটা শাসনপ্রণালীর কথা তাঁর মনে আছে। পড়া না বলতে পারলে ছেলেদের বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে তার হাতের ওপর ক্লাসের অনেকগুলো স্লেট একত্র করে চাপিয়ে দেওয়া হত।

এই জাতীয় শাসনপ্রণালী রবীন্দ্রনাথ একেবারেই সমর্থন করতে পারেন নি।

প্রঃ ১০। ঈশ্বর কে ? অল্প কয়েকটি কথায় তার পরিচয় দাও।

উঃ। ঈশ্বর ছিল গ্রামের গুরুমশাই। সে গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিল, সাধুভাষা মিশ্রিত কথোপকথনের বিচিত্রতা এবং সংযত বাক্‌ভঙ্গীতে সে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। শাস্ত্রীয় আচার, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে তার মনোযোগ যতটা প্রবল ছিল, বাড়ীর ছেলেদের পথ্যাপথ্য বিষয়ে ততটা ছিল না।

প্রঃ ১১। 'কেবল একজনের কথা খুব স্পষ্ট মনে জাগিতেছে'—কার কথা বক্তার মনে জাগছে ? কেন মনে জাগছে, তার কিছু উদাহরণ দাও।

উঃ। বক্তার অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর নামে এক ভৃত্যের কথা মনে পড়ছে। তার ওপর রবীন্দ্রনাথের দেখাশোনার ভার ছিল। সে আগে তার গ্রামের গুরুমশাই ছিল। তার চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের মনে আছে। ঈশ্বর সাধু ভাষায় কথাবার্তা বলতো। শাস্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত তার পড়া ছিল। রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলায় তার মুখ থেকেই রামায়ণ-মহাভারত শুনে কাব্যরসতৃষ্ণা মেটাতেন। তবে এতগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও শিশুদের খাদ্য অপহরণের ব্যাপারে সে কোন নীতিজ্ঞানের ধার দিয়েও যেত না। এই সমস্ত কারণে তার কথা রবীন্দ্রনাথের মনে জাগছে।

প্রঃ ১২। 'আমার সেই নীরব ক্লাসটির উপর কী ভয়ঙ্কর মাস্টারি যে করিয়াছি, তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্য আজ কেহই বর্তমান নাই।'—এখানে কোন্ ক্লাসের কথা বলা হয়েছে ? বক্তা ক্লাসে কেমন মাস্টারি করতেন ?

উঃ। জীবনে প্রথম ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হয়ে মাস্টার-মশাইদের শিক্ষাদানের প্রহারমূলক পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের একেবারে ভাল লাগেনি। তিনি বলছেন, ছাত্র হয়ে থাকবার হীনতা মেটাবার জন্য তিনি বারান্দার কাঠের রেলিং-গুলিকে নিয়ে একটি ক্লাস খুলেছিলেন। বিদ্যালয়ের মাস্টার-মশাইদের অনুকরণে তিনি ঐ কাঠের রেলিংগুলির মধ্যে ভালমন্দ বিচার করে কাউকে বা ভালবাসতেন, কাউকে বা হাতের কাঠির সাহায্যে প্রচণ্ড প্রহার করতেন।

প্রঃ ১৩। রবীন্দ্রনাথকে কে প্রথম পদ্য লিখতে প্রেরণা দেন ?

উঃ। রবীন্দ্রনাথের এক ভাগ্নে জ্যোতিঃপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথকে প্রথম পয়ার ছন্দে কবিতা লিখতে প্রেরণা দেন। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স সাত-আট বছর।

প্রঃ ১৪। 'কেবল একটা লাইন মনে পড়িতেছে'—কোন্ লাইন ? লাইনটির মূল রূপ কি হতে পারে বলে বক্তা মনে করেছিলেন ?

উঃ। লাইনটি হচ্ছে 'কালোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং !' লাইনটির মূল রূপ কবির মনে হয়েছে—Full of glee, singing merrily, merrily, merrily.

প্রঃ ১৫। নর্মাল স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্টের কি আচরণ রবীন্দ্রনাথের মনকে ব্যথিত করেছিল ?

উঃ। ঐ স্কুলে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন বাচস্পতির কাছে বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর অর্জন করেছিলেন। কিন্তু এই নম্বরে সন্দেহ হওয়ায় সুপারিন্টেন্ডেন্ট পুনরায় পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন, রবীন্দ্রনাথ ঐ পরীক্ষাতেও সর্বোচ্চ সংখ্যক নম্বর পান। এই অবিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মনকে ব্যথিত করেছিল।

প্রঃ ১৬। রবীন্দ্রনাথের শৈশবে যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁদের নাম কর।

উঃ। নীলকমল ঘোষাল, অঘোরবাবু, বিষ্ণুবাবু, সীতানাথ দত্ত ইত্যাদি।

প্রঃ ১৭। পড়াশুনো ছাড়া রবীন্দ্রনাথকে আর কি কি বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে হতো ?

উঃ। সংগীত শিক্ষা, কুস্তি ও জিমনাস্টিক শিক্ষা।

প্রঃ ১৮। রবীন্দ্রনাথের কাছে কোন্ শিক্ষা সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়, কোন্ শিক্ষা সহজবোধ্য এবং কোন্ শিক্ষা দুর্বোধ্য ছিল ?

উঃ। সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষিত প্রকৃতিবিজ্ঞান শিক্ষা। সহজবোধ্য ছিল সংস্কৃত মুগ্ধবোধের সূত্র এবং অস্থিবিদ্যা আর ইংরেজী ভাষা ছিল দুর্বোধ্য।

প্রঃ ১৯। 'আমাদিগকে বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সেজদার বিশেষ উৎসাহ ছিল'—সেজদার নাম কি ? কি কি বিষয়ে তাঁরা শিক্ষা পেতেন ?

উঃ। রবীন্দ্রনাথের সেজদাদার নাম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা ভোরে ঘুম থেকে উঠেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তী লড়তেন। তারপর সকাল ছটা থেকে সাড়ে নটা পর্যন্ত নর্মাল স্কুলের শিক্ষক নীলকমলবাবুর কাছে পদার্থবিদ্যা, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল এবং মেঘনাদবধ কাব্য পড়তেন। এরপর স্কুল। বাড়ী ফিরে ড্রয়িং এবং জিমনাস্টিক শিক্ষা। সন্ধ্যে বেলায় তাঁদের হতো ইংরেজী শিক্ষা—পড়াতেন অঘোরবাবু। এ

ছাড়া প্রতি রবিবার সকালে বিষ্ণুর কাছে গান শেখা, মাঝে মাঝে সীতানাথ দত্তের কাছে যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রকৃতিবিজ্ঞান শিক্ষা, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা শিক্ষা এবং হেরম্ব তর্করত্ন মশায়ের কাছে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠও তাঁদের শিক্ষাসূচীর অন্তর্গত ছিল।

প্রঃ ২০। 'এই প্রথম বাহিরে গেলাম' —কে প্রথম বাহিরে গেলেন? তিনি কোথায় গিয়েছিলেন? কেন গিয়েছিলেন?

উঃ। রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথম বাইরে যাওয়ার সুযোগ এসেছিল কলকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের প্রাদুর্ভাবের জন্য। তাঁরা পানিহাটিতে গঙ্গার ধারে ছাতুবাবুর বাগান-বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

প্রঃ ২১। প্রথম জীবনে রচিত রবীন্দ্রনাথের দু'একটি কবিতার নমুনা দাও।

উঃ। একটি কবিতা ঃ মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

আর একটি উদাহরণ ঃ আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলি দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস্ হাপুস্ শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

প্রঃ ২২। রবীন্দ্রনাথের পিতার নাম কি? তিনি প্রবাস থেকে ফিরে যখন কলকাতা আসতেন, তখন কলকাতার বাড়ীর কি অবস্থা হত?

উঃ। রবীন্দ্রনাথের পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি প্রবাস থেকে যখন কলকাতা ফিরতেন, তখন তাঁর প্রভাবে সাড়া বাড়ী গম্ গম্ করতো। গুরুজনেরা গায়ে জোব্বা পরে, সংযত ও পরিচ্ছন্ন হয়ে তাঁর কাছে যেতেন। কারো মুখে পান থাকলে সেই পান মুখ থেকে ফেলে দিয়ে তবে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে যেতেন। রবীন্দ্রনাথের মা নিজে রান্নাঘরে গিয়ে রান্নার তদারকি করতেন, বৃদ্ধ কিনু হরকরা পাগড়ি-চাপকান পরে দরজায় অপেক্ষারত থাকতো; আর ছোট ছেলেদের প্রতি কঠোর নিষেধ ছিল, তারা যেন বারান্দায় গোলমাল না করে।

প্রঃ ২৩। 'এই ক্ষুদ্র অজ্ঞাত রাজ্যের আমি ছিলাম লিভিংস্টোন'—'আমি' কে? লিভিংস্টোন কে? বক্তা কি কারণে নিজেকে লিভিংস্টোনের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

উঃ। 'আমি' এখানে রবীন্দ্রনাথ। পৃথিবীবিখ্যাত পর্যটক হিসেবে লিভিং-স্টোনের নাম স্মরণীয়। লিভিংস্টোন যেমন আফ্রিকা মহাদেশের বহু অজ্ঞাত অঞ্চল আবিষ্কার করেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় তাঁর বাবার সঙ্গে বোলপুরে গিয়ে সেখানে খোয়াইয়ের মধ্যে একটি পরিষ্কার জলের কুণ্ড আবিষ্কার করেন। বলা বাহুল্য, এই তুলনার মধ্যে লেখকের কৌতুকময় ভঙ্গীটি লক্ষণীয়।

প্রঃ ২৪। দেবেন্দ্রনাথ যে মিথ্যা কথা বলতেন না, এ সম্বন্ধে কোন্ ঘটনার কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন?

অথবা, 'পথের মধ্যে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেটা এখনও আমার মনে স্পষ্ট আঁকা আছে'—কোন্ পথে কি ঘটনা ঘটেছিল?

উঃ। পিতার সঙ্গে বোলপুর থেকে ট্রেনে অমৃতসর যাওয়ার সময় এমন

একটা ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলে দেবেন্দ্রনাথের সত্যবাদিতা এবং দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন এগারো—তিনি হাফ টিকিটে ভ্রমণ করছিলেন তাঁর বাবার সঙ্গে। বয়স অনুপাতে তিনি দীর্ঘকায় ছিলেন, সেইজন্য টিকিট চেকার ও স্টেশন মাস্টারের মনে সন্দেহ হয়। তাঁরা দেবেন্দ্রনাথের কাছে অতিরিক্ত ভাড়া দাবি করেন। কোন বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে দেবেন্দ্রনাথ টাকা দিয়ে দেন। কিন্তু স্টেশন মাস্টার যখন ভাড়ার অবশিষ্ট অংশ তাঁকে ফেরত দিতে আসেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ সেই টাকা প্ল্যাটফর্মের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেন। সামান্য অর্থ বাঁচাবার জন্য যে তিনি মিথ্যা কথা বলেন নি, তিনি যে ক্ষুদ্র সন্দেহের বহু উর্ধ্বে, স্টেশন মাস্টার তা উপলব্ধি করে অত্যন্ত সংকুচিত হন। রবীন্দ্রনাথ পিতার এই তেজস্বিতার কথা ভুলতে পারেন নি।

প্রঃ ২৫। রবীন্দ্রনাথের পিতা কখন কি কারণে রবীন্দ্রনাথকে পাঁচশ' টাকার চেক উপহার দিয়েছিলেন ?

উঃ। একবার মাঘোৎসবের সময় দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে ডেকে গান শুনতে চেয়েছিলেন। তিনি তখন চুঁচুড়ায়। রবীন্দ্রনাথের গান শুনে পরিতৃপ্ত হয়ে তাঁর পিতা বলেছিলেন, দেশের রাজার উচিত ছিল কবিকে পুরস্কার দেওয়া, কিন্তু তার যখন সম্ভাবনা নেই, তখন তিনিই সে কাজ করবেন। এই কথা বলে তিনি পাঁচশ' টাকার একটি চেক রবীন্দ্রনাথের হাতে দিয়েছিলেন। (সংক্ষেপে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত কয়েকটি গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গুণের সম্মানস্বরূপ দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে উক্ত পুরস্কার দিয়েছিলেন।)

প্রঃ ২৬। 'পরে বড়ো বয়সে আর একদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়াছিলাম।'—পূর্বে কি ঘটনা ঘটেছিল ? বক্তা কিভাবে শোধ নিয়েছিলেন ?

উঃ। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে শ্রীকণ্ঠবাবুর কাছে রবীন্দ্রনাথের দুটি পারমার্থিক কবিতা শুনে দেবেন্দ্রনাথ হেসেছিলেন। এই ঘটনায় বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ক্ষুন্ন হয়েছিলেন। এর প্রতিশোধ তিনি নিয়েছিলেন বড়ো বয়সে।

(এর পর পূর্ব প্রশ্নের উত্তরটি যোগ কর)

প্রঃ ২৭। 'এ তো খুব ভালো কথা ; রেলগাড়িতে ভ্রমণকে কি ভ্রমণ বলে ?' কে কাকে কি প্রসঙ্গে এই কথা বলেছিলেন ?

উঃ। দেবেন্দ্রনাথ পুত্র রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে এই কথা বলেছিলেন। তিনি যে পুত্রের স্বাধীন চিন্তায় বা স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতেন না, সে কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন। যৌবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের একবার শখ হয়েছিল—গোরুর গাড়ি করে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে তিনি পেশোয়ার পর্যন্ত যাবেন। অন্যত্র এই প্রস্তাব অনুমোদন লাভ না করলেও দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করে ঐ কথাটি বলেছিলেন।

প্রঃ ২৮। সেন্টজেবিয়ার্স স্কুলে ছাত্র থাকাকালীন বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ কি কি বই পড়তেন ?

উঃ। রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে কুমারসম্ভব, ম্যাকবেথ, রামসর্বস্ব পণ্ডিতের কাছে শকুন্তলা ইত্যাদি পড়তেন। দীনবন্ধু মিত্রের জামাইবারিক,

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকা, অবোধবন্ধু পত্রিকা, বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন পত্রিকা এবং সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকারের প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ইত্যাদি গ্রন্থও তাঁর কাছে লোভনীয় পাঠ্যগ্রন্থ ছিল।

প্রঃ ২৯। (ক) রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যের নাম কি? (খ) প্রথম রচনা কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? (গ) কৈশোরে কি কি মাসিক পত্র পড়তেন?

উঃ। (ক) পৃথ্বীরাজ পরাজয়, (খ) জ্ঞানাঙ্কুর, (গ) বিবিধার্থ সংগ্রহ, অবোধবন্ধু, বঙ্গদর্শন।

প্রশ্ন ৩০। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও:

(ক) কৈলাস মুখুজ্যে, (খ) ঈশ্বর, (গ) লেনু, (ঘ) হ্যামলেট, (ঙ) মেঘদূত, (চ) গীতগোবিন্দ, (ছ) পৃথ্বীরাজ পরাজয়, (জ) বঙ্গদর্শন, (ঝ) বোলপুর, (ঞ) গুরুদরবার।

উঃ। (ক) **কৈলাস মুখুজ্যে**—কৈলাস মুখুজ্যে নামে ঠাকুরবাড়ীর এক খাজাঞ্চি রবীন্দ্রনাথের শৈশবজীবনের একটি অংশকে অধিকার করে আছেন। রসিক প্রকৃতির এই লোকটি তাঁদের আত্মীয়ের মত হয়ে গিয়েছিলেন। জনশ্রুতি ছিল যে, মৃত্যুর পরেও তাঁর রসিকবৃত্তি অটুট ছিল। একবার প্ল্যাঞ্চেটের মাধ্যমে তাঁকে পাওয়ার পর প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি যেখানে আছেন, সেখানকার ব্যবস্থা কেমন। তিনি নাকি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি মরিয়া যাহা জানিয়াছি, আপনারা বাঁচিয়াই তাহা ফাঁকি দিয়া জানিতে চান? সেটি হইবে না।' এঁর মুখ থেকে শোনা ছড়া শিশু রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল লাগত। ঐ ছড়ার প্রধান নায়ক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সেই ছড়ার দ্রুত উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা তিনি পরিণত বয়সেও ভুলতে পারেন নি।

(খ) **ঈশ্বর**—১০ এবং ১১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

(গ) **লেনু**—রবীন্দ্রনাথের পিতা প্রায়ই দেশভ্রমণে বেরোতেন এবং ফেরবার সময় এক একজন বিদেশী চাকর নিয়ে ফিরতেন। এদেরই একজন লেনু। অল্পবয়স্ক পাঞ্জাবি ছেলেটি রবীন্দ্রনাথের মনপ্রাণ অধিকার করেছিল। কারণ, একে সে বিদেশী, তার ওপর সে যুদ্ধপ্রিয় পাঞ্জাবি জাতের বংশধর। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সমবয়স্করা একে খুব সমাদর করতেন;—বিভিন্ন ভাবে তাকে খুশী করে যেন ধন্য হতেন। প্রকৃতপক্ষে গৃহে আবদ্ধ ছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথের কাছে দূর দেশের সবকিছুই আকর্ষণীয় ছিল।

(ঘ) **হ্যামলেট**—পৃথিবী বিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপীয়ারের একটি বিখ্যাত নাটক। হ্যামলেটই নাটকের নায়ক। এটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডি নাটক।

(ঙ) **মেঘদূত**—মহাকবি কালিদাসের লেখা একটি বিখ্যাত খণ্ড কাব্য। এই কাব্যটির বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে মেঘকে দূতরূপে নিয়োগ করা হয়েছে। দেবতার অভিশাপে নির্বাসিত এক যক্ষ মেঘের সাহায্যে তার প্রিয়ার উদ্দেশ্যে অলকাপুরীতে তার ব্যথিত বিরহী হৃদয়ের বার্তা প্রেরণ করছে—এইটিই কাব্যের বিষয়বস্তু।

(চ) **গীতগোবিন্দ**—কবি জয়দেব অত্যন্ত ছন্দোঝংকৃত সহজ ভাষায় এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। ইনি সাধক কবি ছিলেন। সাধকের দৃষ্টিতে ইনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন।

(ছ) **পৃথ্বীরাজ পরাজয়**—'জীবনস্মৃতি' নামে আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের 'হিমালয়-যাত্রা' নামক অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। কবি যখন বোলপুরে পিতার সঙ্গে প্রথম বেড়াতে গিয়েছিলেন ; সেই সময় তিনি বাগানের ধারে ছোট্ট একটি নারকেলগাছের তলায় কবিজনোচিত ভঙ্গীতে বসে কবিতা লিখতেন। এই সময় এক রৌদ্রদগ্ধ দিনে ঘাসহীন কাঁকরের ওপরে বসে তিনি 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' নামে বীররসের এক কাব্য লিখেছিলেন। পরিণত বয়সে সে কথা মনে করতে গিয়ে তিনি কৌতুকময় ভঙ্গীতে বলেছেন, 'প্রচুর বীররসও উক্ত কাব্যটিকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।'

(জ) **বঙ্গদর্শন**—সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত সাময়িকপত্র। বঙ্গদর্শনের পূর্বে অনেক সাময়িকপত্রের প্রকাশ হলেও বঙ্গদর্শনের ন্যায় খ্যাতিসম্পন্ন সাময়িকপত্র তৎকালে অভাবিত ছিল। এই সাময়িক পত্রের মাধ্যমেই বঙ্কিমের বিভিন্ন উপন্যাস এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল'।

(ঝ) **বোলপুর**—এখানেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী আদর্শ এক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জন করেছিল। এক সময় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষক এবং ছাত্রদল এখানে শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণের জন্য সমবেত হতেন। দেবেন্দ্রনাথই প্রথম 'বোলপুরের' জমি ক্রয় করে সেখানে কুঠিবাড়ী স্থাপন করেন। শৈশবে বোলপুরের দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, কংকরময় মৃত্তিকা, খোয়াই ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের মনকে আকর্ষণ করতো।

(ঞ) **গুরুদরবার**—শিখদের তীর্থস্থানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই গুরুদরবার। অমৃতসরে এক সরোবরের মধ্যে এই স্বর্ণমন্দিরটি অবস্থিত। এখানে নিয়ত ভজনা হয়। ছেলেবেলায় তাঁর বাবার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এখানে এসেছিলেন—মন্দিরে শিখদের সঙ্গে তিনি তাঁর বাবাকে একত্র ভজনা করতেও দেখেছিলেন।

॥ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ॥

প্রশ্ন ১। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থটির রচয়িতা কে ?

উত্তর। স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রঃ ২। কি জাতীয় গ্রন্থ এটি ?

উঃ। এটি একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ।

প্রঃ ৩। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে লেখকের আলোচ্য বিষয় কি ?

উঃ। এই গ্রন্থে লেখক স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্থাৎ এশিয়া ও ইউরোপের সভ্যতার তুলনামূলক বিচার করেছেন। বিশেষভাবে তিনি ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জীবন-ধারার সঙ্গে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন।

প্রঃ ৪। বিবেকানন্দের কলমে, ইংরেজদের চোখে ভারতবাসীর কেমন ছবি ফুটে উঠেছে, দু-চারটি বাক্যের মধ্যে বল।

উঃ। ইংরেজরা মনে করেন আমরা দীর্ঘদিন পরাধীন থেকে, বলবানের অত্যাচারে একেবারে মনেপ্রাণে হীন ও দুর্বল হয়ে পড়েছি। 'যেন তেন প্রকারেণ' ভারতবাসী দিন কাটিয়ে দিলেই খুশী। তাদের আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই। তারা স্বার্থপর, ঈর্ষাপরায়ণ এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। ইউরোপীয়রা মনে করে এ জাতীয় নীচতার মধ্যে ভাল কিছু থাকা সম্ভব নয়।

প্রঃ ৫। বিবেকানন্দের কলমে, ভারতবাসীর চোখে ইংরেজদের ছবি কেমন ফুটে উঠেছে অল্প কথায় বল।

উঃ। ভারতবাসীর চোখে ইংরেজরা কেবলই বাহ্যিক আড়ম্বরে এবং সুখভোগে মত্ত। তারা হিতাহিত বোধশূন্য, সুরাসক্ত, আচারহীন, শৌচহীন, দেহাত্মবাদী, ম্লেচ্ছ, এদের মধ্যে ভাল কিছু থাকতে পারে না।

প্রঃ ৬। ভারতবাসী এবং ইংরেজ জাতি—উভয়ের পারস্পরিক ধারণা বিবেকানন্দ কতদূর সমর্থন করেন ?

উঃ। বিবেকানন্দ মনে করেন, উভয় পক্ষের বুদ্ধিহীন বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরাই পরস্পর সম্বন্ধে এই রকম সর্বাঙ্গীণ বিরূপ মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে পারস্পরিক নৈতিমূলক ঐ বিচার স্থূল দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভরশীল।

প্রঃ ৭ 'প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে।' উক্তিটি কার ? বক্তা উক্তিটির মাধ্যমে কি বলতে চেয়েছেন ?

উঃ। স্বামী বিবেকানন্দ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধ গ্রন্থে এই উক্তি করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে জাতিমাত্রেরই নিজস্ব একটি ভাব অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য আছে। যে জাতির এই ভাব নেই, সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে না। ঐ মূল ভাবটিকে কেন্দ্র ক'রে জাতি তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যাবলীর মাধ্যমে জীবনপ্রবাহ বহমান রাখে। ভারতবাসীর ঐ ভাব আছে বলে কোন শক্তিই তাকে হত্যা করতে পারে নি, আবার ইংরেজদের নিজস্ব স্বতন্ত্র কিছু ভাবসম্পদ রয়েছে ব'লেই তারা এত প্রতাপান্বিত হ'তে পেরেছে।

(** 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থ থেকে যে কোন বাক্য বা বাক্যাংশ উদ্ধৃত ক'রে 'উক্তিটি কার' বলে প্রশ্ন করা যেতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরা এ বিষয়ে সচেতন থাকবে। এখানে বাহুল্যবোধে ঐ জাতীয় প্রশ্ন বার বার দেওয়া হল না।)

প্রঃ ৮। বিবেকানন্দের মতে সংসারে প্রতিটি মানুষের জন্যই স্বতন্ত্র নিয়ম হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে তাঁর মতামত ব্যাখ্যা কর।

উঃ। বিবেকানন্দ মনে করেন, জাতি ব্যক্তি ও প্রকৃতি অনুযায়ী নিয়মের স্বাতন্ত্র্য থাকা উচিত। এক একজন ব্যক্তিকে এক এক জাতীয় কাজ করতে হবে। হিন্দুধর্মে এই মতের সমর্থন থাকলেও খ্রীষ্ট, জৈন ও বৌদ্ধধর্মে একথা স্বীকার করে না। বুদ্ধদেব বলেছেন, 'অহিংসা পরম ধর্ম' কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ মনুর মতে আক্রমণকারী যদি ব্রাহ্মণও হয় তবুও আক্রমণ করেছেন বলে তাঁকে হত্যাতেও কোন পাপ নেই। বসুন্ধরা যেহেতু বীরভোগ্যা, সুতরাং বীর্যবান হতেই হবে।

প্রঃ ৯। 'এ দেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন।'

অথবা, ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন,—এ দেশে চিরকাল।' কি প্রসঙ্গে বক্তা এই উক্তি করেছেন? উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

উঃ। ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে উৎসাহী হয়েছে, তাদের সমর্থন করেছে একদল ভারতবাসী। বিবেকানন্দের মতে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ, ভারতের মাটিতে আর ভারতবাসীর হৃদয়ে শিব, কালী আর কৃষ্ণ এমনভাবে মিশে গেছেন, সেখান থেকে আর তাঁদের তুলে ফেলা যাবে না।

প্রঃ ১০। বিবেকানন্দের মতে ধর্ম ও মোক্ষের পার্থক্য কি?

উঃ। বিবেকানন্দের মতে ধর্ম ক্রিয়ামূলক ধর্ম মানুষকে ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়, মানুষকে দিনরাত সুখের সন্ধানে ব্যাপৃত রাখে, সুখের জন্য খাটায়। আর মোক্ষ বলতে তিনি বোঝেন, প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি এবং শরীরের বন্ধন থেকে মুক্তি।

প্রঃ ১১। 'বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ! যীশু করলেন গ্রীসরোমের সর্বনাশ !!!'—বিবেকানন্দ এখানে কি বলতে চেয়েছেন?

উঃ। স্বামী বিবেকানন্দ বৌদ্ধধর্ম এবং খ্রীষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, এই দুই মহান্ ধর্মনেতাই স্ব স্ব জাতিকে অলস এবং কর্মবিমুখ করে তুলেছেন। এঁরা মানুষকে মোক্ষের সন্ধান দিয়েছেন সত্যি কথা, কিন্তু এঁদের প্রচারিত মন্ত্র—অহিংসা আর প্রেমের মন্ত্র—ভারত ও ইউরোপের জাতিগুলিকে দুর্বল ক'রে তুলেছে।

প্রঃ ১২। সামাজিক কল্যাণ এবং মুক্তির উপায় কি বলে বিবেকানন্দ মনে করেন?

উঃ। বিবেকানন্দের মতে 'জাতিধর্ম', 'স্বধর্ম' সমস্ত দেশেই সামাজিক কল্যাণ ও মুক্তির উপায়। বৈদিক ধর্ম ও সমাজের ভিত্তি এই গ্রাম্য আচার-নিষ্ঠাকে বিবেকানন্দ জাতিধর্ম বলছেন না। তাঁর মতে জাতিধর্ম ঠিক থাকলে কোন জাতির অধঃপতন হতে পারে না। গুণগত জাতিবিভাগ থেকে একদিন জাতিবিভাগ সৃষ্টি হলেও, বংশগত ও জন্মগত জাতিই আসল জাতি বলে তিনি মনে করেন।

প্রঃ ১৩। ফরাসী, ইংরেজ ও হিন্দুজাতির মানদণ্ড কি বলে বিবেকানন্দ মনে করেন?

উঃ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ; ইংরেজরা চায় ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি আর হিন্দুদের চরিত্রে বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছেন পারমার্থিক স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তি।

প্রঃ ১৪। 'প্রত্যেক জাতির, একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে'—এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ কোন্ কোন্ জাতির উদাহরণ দিয়েছেন? ঐ সমস্ত জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি?

অথবা, ফরাসী, ইংরেজ ও হিন্দুজাতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ কি আলোকপাত করেছেন?

অথবা, 'কিন্তু যদি সেই আসল উদ্দেশ্যটিতে ঘা পড়ে, তখনি সে জাতির নাশ হয়ে যাবে'—কি প্রসঙ্গে এই উক্তি করা হয়েছে ? উক্তিটির তাৎপর্য বোঝাও।

উঃ। নির্দিষ্ট একটি জাতীয় উদ্দেশ্য ছাড়া কোন জাতি বাঁচতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মে এবং মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে, নানাপ্রকার সামাজিক রীতিনীতি গড়ে ওঠে। কিন্তু এ সমস্তই ঐ 'জাতীয় উদ্দেশ্য'কে সফল করার জন্য। ঐ 'জাতীয় উদ্দেশ্য'টিই আসল উদ্দেশ্য. ঐ উদ্দেশ্য আঘাতপ্রাপ্ত হ'লে জাতির অপমৃত্যু ঘটে।

বিবেকানন্দ তাঁর এই মতের সমর্থনে ফরাসী, ইংরেজ ও হিন্দুজাতির কথা বলেছেন। ফরাসী জাতির চারিত্রিক মেরুদণ্ড রাজনৈতিক স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার উপরে কেউ হাত দিলেই সমস্ত জাতি উন্মাদ হয়ে ওঠে। ইংরেজ-চরিত্রে ব্যবসায়বুদ্ধির প্রাধান্য—আদান-প্রদান 'যথাভাগ ন্যায়বিভাগ' তাদের চরিত্রের মূল কথা। যুক্তি দিয়ে না বুঝিয়ে, তাদের কাছ থেকে জোর ক'রে অর্থ আদায় করতে গেলে বিপ্লবের সম্ভাবনা। আর হিন্দুজাতির কাছে পারমার্থিক স্বাধীনতা তথা মুক্তিই প্রধান। হিন্দুজাতি ধর্মের উপর আঘাত কোন কারণেই সহ্য করে না। ঐ ধর্ম কেউ নষ্ট করতে পারে নি বলেই হিন্দুজাতি এখনও বেঁচে আছে।

প্রঃ ১৫। 'যদি জন্মেছ তো একটা দাগ রেখে যাও'—বিবেকানন্দের এই বাক্যটি বুঝিয়ে দাও।

উঃ। বাক্যটি বিবেকানন্দের একটি বিখ্যাত বাণী। এখানে জাতিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন প্রকৃত মানুষ হতে। তাঁর মতে অপরের ধ্যান-ধারণা, আদর্শ অন্ধের মত অনুকরণ না করে, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কোলাহল ত্যাগ করে সদুদ্দেশ্য, সদুপায়, সৎসাহস এবং সদ্বীর্য অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে মৃত্যুর পর পৃথিবী তোমাকে স্মরণ করবে।

প্রঃ ১৬। 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি'—উক্তিটি কার ? বক্তা কি প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করেছেন ?

উঃ। উক্তিটি শ্রীরামকৃষ্ণের (*বিবেকানন্দের নয়)। বিবেকানন্দ পারস্পরিক আদান-প্রদানে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন প্রত্যেক জাতির মধ্যেই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কিছু নিশ্চয়ই আছে। যে মুহূর্তে জাতি বা মানুষ মনে করবে, তার আর শিক্ষার কিছু বাকী নেই, তখনি তার বিপর্যয় নেমে আসবে। যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো, ততদিনই শিক্ষা গ্রহণ করবার মতো মন প্রস্তুত রাখতে হবে। তবে এই শিক্ষা আসবে অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে নয়, নিজের বৈশিষ্ট্যের বা ভঙ্গীর ছাঁচে ফেলে তাকে নিজের মত করে নিতে হবে।

প্রঃ ১৭। ইউরোপীয়দের পোশাক-পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ধারণা কি ?

উঃ। ভদ্র-অভদ্র বিচারের আপাত মাপকাঠি অনেকখানি পোশাক পরিচ্ছদের ওপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে ইউরোপীয়দের পোশাক কাজকর্ম করবার পক্ষে সুবিধাজনক। ওদের ফ্যাশন অনুযায়ী বার বার পোশাকের ঢঙ বদলায়। মহিলারা প্যারিসের পোশাক এবং পুরুষেরা লণ্ডনের পোশাক অনুকরণ করে। ইউরোপীয় পোশাকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তা সর্বাঙ্গে আচ্ছাদিত থাকে ; খালি গায়ে কিংবা দেহের কোন অংশ অল্প উন্মুক্ত রেখে বাইরে বেরোবার কথা এরা ভাবতে পারে না।

প্রঃ ১৮। ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে দু'-একটি কথা বল।

উঃ। বিবেকানন্দের ভাষায়, 'হিঁদু করছেন ভেতর সাফ। বিলাতি করছেন বাইরে সাফ।' হিন্দু শরীর পরিষ্কার রাখে, কাপড় যা-তা পরে। আমাদের অন্নব্যঞ্জন বাসনপত্র পরিচ্ছন্ন, কিন্তু যে রান্না করছে, তার পরণে তৈলাক্ত ময়লা কাপড়। অন্যদিকে ইউরোপীয়রা একেবারেই স্নান করে না। অথচ পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার। হিন্দুদের ধারণা, ঘর পরিচ্ছন্ন রাখলেই হল, তারা ময়লা ঘরের বাইরে ফেলে রাখে। পক্ষান্তরে বিলেতে ঘরে ঝাঁটই পড়ে না, কার্পেটের তলায় সব চাপা থাকে।

প্রঃ ১৯। পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের অভিমত কি?

উঃ। 'চাই কি?—পরিষ্কার শরীরে পরিষ্কার কাপড় পরা। মুখ ধোয়া, দাঁত মাজা সব চাই, কিন্তু গোপনে। ঘর পরিষ্কার চাই। রাস্তাঘাটও পরিষ্কার চাই। পরিষ্কার রাঁধুনী, পরিষ্কার হাতের রান্না চাই। আবার পরিষ্কার মনোরম স্থানে পরিষ্কার পাত্রে খাওয়া চাই।'

প্রঃ ২০। 'প্রাচীন কাল হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত এক মহা বিপদ—আমিষ আর নিরামিষ'।—বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন?

উঃ। বিবেকানন্দ হিন্দুশাস্ত্রের বিচারটিকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'হিঁদুদের ঐ যে ব্যবস্থা যে জন্ম-কর্ম-ভেদে আহারাদি সমস্তই পৃথক্, এইটিই সিদ্ধান্ত।' তাঁর মতে যিনি ধর্মজীবন যাপন করবেন তাঁর পক্ষে নিরামিষ ভোজনই পবিত্রতর। আর যাঁকে পরিশ্রম করে সংসারে দিবারাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে, তাঁর মাংস খাওয়াই উচিত। যতদিন 'বলবানের জয়' এই নীতি মানুষের সমাজে থাকবে, ততদিন হয় মাংস খেতে হবে নয়তো অন্য কোনও রকমে মাংসের বিকল্প উপযুক্ত আহার আবিষ্কার করতে হবে।

প্রঃ ২১। ইউরোপে নবজন্মের সূচনা (রেনেসাঁ) কি ভাবে হয়েছিল?

উঃ। 'রেনেসাঁ' শব্দটি ফরাসী—এর অর্থ নবজন্ম। গ্রীক ও রোমের সভ্যতার অবলুপ্তির পর ইসলাম ধর্ম ও সভ্যতা আরব জাতির মাধ্যমে পারস্যে ছড়িয়ে পড়ল। ইসলাম ধর্ম ও পারসিক সভ্যতার সংমিশ্রণে নতুন রূপগ্রহণ করল। আরবরা শক্তিমান হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ বাধিয়ে তুললো; ফলতঃ ইউরোপও যেন নতুন প্রাণপ্রবাহ নিয়ে জেগে উঠল। ইতালীর ফ্লোরেন্স নগরীতে এইভাবে গ্রীক আর রোমক সভ্যতার নবজন্ম হল। তারপর তা ছড়িয়ে পড়ল। এইভাবে ইউরোপের নবজন্ম হল।

প্রঃ ২২। পারি নগরী সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ধারণা কি?

উঃ। 'পাশ্চাত্য সভ্যতা, রীতিনীতি, আলোক আঁধার, ভালমন্দ সকলের শেষ পরিপুষ্ট ভাব এইখানে।' ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুপম, এখানকার মানুষও সৌন্দর্যপ্রিয়।

প্রঃ ২৩। ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লবের সময় কোন্ বাণীতে জাতি উদ্বোধিত হয়েছিল?

উঃ। সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের বাণীতে জাতি উদ্বোধিত হয়েছিল।

প্রঃ ২৪। 'ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকবো। আর্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান করব, আমাদের চেয়ে বড় করব।'—বক্তার এই মন্তব্যের ভিত্তি কি?

উঃ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার নানাদিক বিশ্লেষণ করে বিবেকানন্দ এই সিদ্ধান্তে পেঁছেছেন। তিনি দেখিয়েছেন এশিয়া ও আফ্রিকার অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অসভ্য জাতিদের শোষণ করে, ধ্বংস করে ইউরোপ বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু আর্য হিন্দুরা কখনই পররাজ্য লোলুপ বা অত্যাচারী ছিলেন না। রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে কেউ কেউ বলেছেন, রাম ছিলেন আর্য রাজা, সুসভ্য তিনি। তাহলে তিনি রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন কেন? বস্তুতঃপক্ষে রাবণ কোন অংশে রামচন্দ্রের চেয়ে তুচ্ছ ছিলেন না. লংকা অযোধ্যার চেয়ে বোধকরি অনেক উন্নতই ছিল। আসলে হিন্দুরা বর্ণ বিভাগের মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর মানুষকেই সমাজে স্থান দিতে পেরেছিলেন।

প্রঃ ২৫। 'ভবিষ্যৎ বাংলা দেশ এখনও পায়ের উপর দাঁড়ায় নি।'—বক্তা কোন্ দিক থেকে এমন মন্তব্য করেছেন?

উঃ। বিবেকানন্দের মতে, বাংলাদেশ এখনও আপন শক্তিতে এগিয়ে চলবার শক্তি অর্জন করতে পারে নি। ভবিষ্যতের বাংলার কোন স্পষ্ট চিত্র তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। আধুনিক বিলাতী সভ্যতার অনুকরণে আমরা এখনও চলবার চেষ্টা করছি, অথচ আমাদের প্রাচীন গ্রামীণ শিল্প যেমন, আলপনা, কিংবা রন্ধনচাতুর্য ইত্যাদি নষ্ট হতে বসেছে। পল্লীবাসীর ইঁট-কাঠের কাজের মধ্যেও যে শিল্পচাতুর্য লুকিয়ে আছে, তাকে খুঁজে আনতে হবে। আমরা কিন্তু কেবল বাক্‌চাতুর্যে মত্ত হয়ে আছি।

॥ রামায়ণী কথা ॥

প্রশ্ন ১। 'রামায়ণী কথা' গ্রন্থটির লেখক কে?

উত্তর: দীনেশচন্দ্র সেন।

প্রশ্ন ২। কি জাতীয় গ্রন্থ এটি?

উঃ। এটি একটি প্রবন্ধের সংকলনগ্রন্থ।

প্রশ্ন ৩: 'রামায়ণী কথা' গ্রন্থে লেখকের আলোচ্য কি?

উঃ। এই গ্রন্থে লেখক রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রকে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসহ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই আলোচনা ঠিক 'সমালোচনা জাতীয়' নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন।'

প্রঃ ৪। রামায়ণের মূল লেখক কে? এটা কি জাতীয় কাব্য? এই জাতীয় কাব্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে আর আছে কি? থাকলে রচয়িতাসহ তাদের নাম বল।

উঃ 'রামায়ণ'-এর মূল লেখকের নাম মহর্ষি বাল্মীকি। রামায়ণ একটি মহাকাব্য।

এই জাতীয় কাব্য প্রাচ্যে আর একটি আছে—মহাভারত; রচয়িতা—মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। পাশ্চাত্যে প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে দুইটি মহাকাব্যের পরিচয় আমরা পাই। একটির নাম ইলিয়ড, অপরটি ওডিসি। রচয়িতা যথাক্রমে হোমার ও ভার্জিল।

প্রঃ ৫। রবীন্দ্রনাথের মতে রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব কি?

উঃ। রবীন্দ্রনাথের মতে রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, রামায়ণ ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বড় করে দেখিয়েছে। পিতাপুত্র, ভ্রাতা, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন ও প্রীতির সম্পর্ক আছে, রামায়ণ তাকেই মহৎভাবে প্রকাশ করেছে। যুদ্ধ রামায়ণে আছে, বীরত্বের নানা ঘটনায় রামায়ণ আকীর্ণ, এ কথা সত্যি, কিন্তু গৃহ-ধর্মই রামায়ণের মূল কথা।

প্রঃ ৬। রামায়ণে একমাত্র আদর্শ চরিত্র বলে লেখক কাকে মনে করেন?

উঃ। ভরতকে মনে করেন।

প্রঃ ৭। 'এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের মিলনদৃশ্য বড় করুণ।'—ত্যাগী মহাপুরুষ দুজন কে কে? কোথায় এঁদের মিলন হয়েছিল?

উঃ। এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের একজন রামচন্দ্র, অপরজন ভরত। চিত্রকূট পর্বতের কাছে এঁদের মিলন হয়েছিল।

প্রঃ ৮। "ভরত ভ্রাতৃভক্তির পলান্ন···কিন্তু লক্ষ্মণ ভ্রাতৃভক্তির অন্নব্যঞ্জন"—উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

উঃ। এখানে ভরতকে অপেক্ষাকৃত দুষ্পাচ্য পলান্নের সঙ্গে এবং লক্ষ্মণকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় অন্নব্যঞ্জনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভরত এবং লক্ষ্মণ—উভয়েরই ভ্রাতৃপ্রেম অকৃত্রিম এবং গভীর। তবে ভরতের ভ্রাতার প্রতি ভালবাসা কিছুটা উচ্চ স্তরের, তা আমরা কল্পনা করতে পারি। পক্ষান্তরে লক্ষ্মণের এবং রামের পারস্পরিক যে সম্বন্ধ, তা যেন অতি সহজ সাধারণ সম্বন্ধ। তাই রামচন্দ্র

আছেন, ভরত নেই এমন চিত্র আমরা, কল্পনা করতে পারি কিন্তু লক্ষ্মণ নেই রামচন্দ্র আছেন, এমন চিত্র বুঝি আমাদের কল্পনাতীত।

প্রঃ ৯। হনুমানকে কোথায় 'আর্য হনুমান' বলে সম্বোধন করা হয়েছে? কে এই সম্বোধন করেছেন?

উঃ। ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' গ্রন্থে হনুমানকে আর্য হনুমান বলে সম্বোধন করা হয়েছে। লক্ষ্মণ এই সম্বোধন করেছেন।

প্রঃ ১০। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি কে কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন?

(ক) **"ইহার কি অপূর্ব রূপ, কি ধৈর্য, কি শক্তি, কি কান্তি, সর্বাঙ্গে কি সুলক্ষণ!"**

উঃ। হনুমান রাবণ সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

(খ) **'আজ এই হিন্দুস্থানে এমন কে আছেন,—যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তোমার মত প্রাণ দিতে পারেন?'**

উঃ। দীনেশচন্দ্র সেন জটায়ুকে উদ্দেশ্য করে এই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

(গ) **অমরত্ব কিংবা ত্রিলোকের ঐশ্বর্যও আমি তোমা ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা করি না।**

উঃ। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে এই কথা বলেছেন।

(ঘ) **'নিজের স্ত্রীকে পার্শ্বে রাখিতে ভয় পায়, এরূপ নারী-প্রকৃতি পুরুষের হস্তে কেন আমাকে পিতা সমর্পণ করিয়াছেন?'**

উঃ। সীতা রামচন্দ্রকে বলেছিলেন।

(ঙ) **'জল হইতে উদ্ধৃত মীনের ন্যায় আপনাকে ছাড়িয়া আমি এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারিব না।'**

উঃ। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে বলেছিলেন।

(চ) **'দেখ, গাভীগুলিও বনে বৎসের অনুগমন করে, আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাও।'**

উঃ। কৌশল্যা রামচন্দ্রকে বলেছিলেন।

(ছ) **'অযোধ্যা আর অযোধ্যা নাই, আমি এই সিংহহীন গুহায় প্রবেশ করিব না।'**

উঃ। বনবাস থেকে রামচন্দ্রকে আনতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ভরত যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করছিলেন, তখন তিনি এই কথা বলেছিলেন।

(জ) **'আপনি যাঁহাদের কুশল ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কুশলে আছেন।'**

উঃ। দূত ভরতকে বলেছিলেন।

(ঝ) **'আমি ক্লান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করি না,...কল্য সবল হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিও।'**

উঃ। রাবণের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রের উক্তি।

(ঞ) **'তুমি যেরূপ বনে আমাকে অনুগমন করিয়াছ, আমিও আজ সেইরূপ মৃত্যুতে তোমাকে অনুগমন করিব।'**

উঃ। লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রের উক্তি।

(ট) 'রাবণ আমাকে ইতিপূর্বেই নিহত করিয়াছে, আমাকে পুনর্বার নিধন করিবার চেষ্টা তোমার পক্ষে উচিত নহে।'

উঃ। জটায়ু রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে এই উক্তি করেছেন।

(ঠ) 'এই রাক্ষস সীতাকে খাইয়া নিশ্চলভাবে পড়িয়া আছে।'

উঃ। জটায়ুর উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রের উক্তি।

(ড) তোমার ন্যায় এই জগতে আর কোন্ ব্যক্তি আছেন, 'সুখে তোমার হর্ষ নাই, দুঃখে তুমি ব্যথিত হও না।'

উঃ। রামচন্দ্রর উদ্দেশ্যে ভরতের উক্তি।

(ঢ) 'কামাসক্ত পিতার আদেশ পালন অধর্ম।'

উঃ। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করে এই উক্তি করেছেন।

(ণ) আমি পিতা, সুমিত্রা, শত্রুঘ্ন, এমন কি স্বর্গও তোমাকে ছাড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা করি না'।

উঃ। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে এই উক্তি করেছেন।

(ত) 'অমরত্ব কিংবা ত্রিলোকের ঐশ্বর্যও আমি তোমা ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা করি না।'

উঃ। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে এই কথা বলেছেন।

(থ) 'তুমি প্রীতির সহিত, নিয়মের সহিত যে ধর্মপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই ধর্ম তোমায় রক্ষা করুন।'

উঃ। রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে কৌশল্যার এই উক্তি।

(দ) 'হে পুত্র, তোমার পথ সুখকর হউক, তোমার পরাক্রম সর্বত সিদ্ধ হউক, তুমি বনে গমন কর, আমি অনুমতি দিতেছি'।

উঃ। কৌশল্যা রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে এই কথা বলেছেন।

(ধ) তুমি যেরূপ আমাকে বনে অনুগমন করিয়াছিলে, আজ আমিও তেমনি তোমাকে যমালয়ে অনুগমন করিব'।

উঃ। লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রের উক্তি।

(ন) 'ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমা অপেক্ষাও রামের নিয়ত প্রিয়তর'।

উঃ। অশোকবনে হনুমানের কাছে সীতা এই কথা বলেছেন।

প্রঃ ১১। 'তুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও না, ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষেরা পরের প্রশংসা শুনিতে ভালবাসেন না'—কে কার কাছে কার সম্বন্ধে এই উক্তি করেছেন। এই উক্তি সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য কি?

উঃ। রামচন্দ্র সীতাকে ভরত সম্বন্ধে এই উক্তি করেছেন। এই উক্তি সম্বন্ধে আচার্য দীনেশচন্দ্রের মন্তব্য, 'এই সন্দেহের মার্জনা নাই।'

প্রঃ ১২। 'এই কৌশল্যাচিত্র হিন্দুস্থানের আদর্শজননীর চিত্র—আদর্শ স্ত্রীচরিত্র'—এই উক্তি কতদূর সত্য?

উঃ। এই উক্তি সম্পূর্ণতঃ সত্য। কারণ কৌশল্যার পুত্রস্নেহ এবং আত্মত্যাগ যে কোন জননীর পক্ষেই শিক্ষণীয়। আর স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হয়েও এবং পুত্রবিচ্ছেদের জন্য ঐ স্বামীই দায়ী এ কথা জেনেও আজীবনসঞ্চিত দুঃখ এবং

ব্যথাকে ভুলে গিয়ে স্বামীর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা বজায় রাখা কৌশল্যার ন্যায় আদর্শ স্ত্রীর পক্ষেই সম্ভব।

প্রঃ ১৩। 'এই দাম্পত্যচিত্রে কৌশল্যার অপূর্ব স্বামীভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে'—এখানে কোন্ দাম্পত্যচিত্রের কথা বলা হয়েছে? লেখক এই দাম্পত্যচিত্রকে 'অপূর্ব' বলেছেন কেন?

উঃ। কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে এবং পিতার সম্মতিতে রামকে যখন বনবাসে যেতে হল, তখন দশরথ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন কৌশল্যার কক্ষে। অথচ একলা পেয়ে তাঁকে নানা বাক্যবাণ এবং কটূক্তিতে বিঁধ করলেন কৌশল্যা। নিজের ত্রুটির প্রতি দশরথ অসচেতন ছিলেন না, কৌশল্যার মুখে এ জাতীয় কথা শুনে তিনি মূর্ছিতপ্রায় হয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। মুহূর্তমধ্যে কৌশল্যা সম্বিত ফিরে পেয়ে দশরথের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করলেন এবং বললেন পুত্রশোকেই তিনি ধৈর্যহারা হয়ে এইরূপ আচরণ করেছেন।

এই দাম্পত্যচিত্রটিকে অপূর্ব বলার কারণ কৌশল্যা চরম বিপদ এবং শোকের মুহূর্তেও যে জাতীয় সংযম দেখিয়েছেন, তা সত্যসতাই অভাবিত।

প্রঃ ১৪। বাল্মীকি হনুমানের কোন্ কোন্ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন?

উঃ। বাল্মীকির লেখনী অনুযায়ী হনুমানের ধৈর্যমিশ্র তেজ, নীতির সহিত সরলতা, সামর্থ্য ও বিনয়, যশ, পৌরুষ ও বুদ্ধি—এই সমস্ত গুণ ছিল।

প্রঃ ১৫। লেখকের মতে রামায়ণে পুরুষকারের একমাত্র জীবন্ত চিত্র কে?

উঃ। লেখকের মতে লক্ষ্মণই পুরুষকারের একমাত্র জীবন্ত চিত্র।

প্রঃ ১৬। 'তোমাকে ছাড়া ত্রিলোকের ঐশ্বর্যও কামনা করি না'—কে, কাকে, কখন এ কথা বলেছিলেন? উক্তিটি বক্তার চরিত্রের কোন্ দিক্‌টি প্রকাশ করে?

উঃ। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে এ কথা বলেছিলেন। দশরথের আজ্ঞা শিরোধার্য করে রামচন্দ্র যখন বনে যাচ্ছিলেন, তখন লক্ষ্মণ তাঁর সংগী হতে চাইলেন। এই অবস্থায় রাম তাঁকে নিবৃত্ত করতে চাইলে লক্ষ্মণ এই উক্তি করেন।

উক্তিটির মধ্য দিয়ে লক্ষ্মণের অকৃত্রিম ভ্রাতৃভক্তি প্রকাশিত হয়েছে।

প্রঃ ১৭। 'আপনি যে ধর্ম পালন করিতে ব্যাকুল, ঐ ধর্ম আমার নিকট নিতান্ত অধর্ম বলিয়া মনে হয়'—উক্তিটি কার? কার উদ্দেশে এই উক্তি? কিসের ইংগিত করা হয়েছে এখানে?

উঃ। উক্তিটি লক্ষ্মণের। তিনি রামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে এই উক্তি করেছিলেন। লক্ষ্মণের মতে ধর্ম ও সত্যের ভান করে পিতা দশরথ অত্যন্ত অন্যায়ভাবে রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠাচ্ছেন। অথচ রামচন্দ্র এই গর্হিত আদেশকে ন্যায়সংগত বলে পালন করতে চাইছেন। লক্ষ্মণের এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, রামের প্রাণ ও দেহের সংগে তাঁর সত্তা একীভূত হয়ে পড়লেও প্রয়োজনবোধে নিজের বক্তব্যকে প্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি।

প্রঃ ১৮। 'এ তো অযোধ্যা নহে অযোধ্যার অরণ্য'—এই মন্তব্যটি কার? কেন তিনি এই উক্তি করেছেন? তিনি কখন, কাকে লক্ষ্য করে এই উক্তি করেছেন?

উঃ। আলোচ্য মন্তব্যটি ভরতের। তিনি মাতুলালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর রথের সারথিকে লক্ষ্য করে এই কথাগুলি বলেছিলেন। ভরত জানতেন

না, তাঁর অনুপস্থিতিতে অযোধ্যায় বিপর্যয় ঘটে গেছে। ঐ বিপর্যয়েরই ফলশ্রুতি তিনি অযোধ্যার পথে পথে লক্ষ্য করলেন। দেখলেন রাস্তাঘাটে কতদিন জল পড়ে নি, লোকজন নেই, কোলাহল নেই, প্রমোদকাননও শূন্য, যানবাহনের অভাবও ভরতের চোখে পড়লো। রাজপুরীর এই শ্রীহীনতা দেখে অযোধ্যাকে ভরতের মনে হলো অযোধ্যার অরণ্য।

॥ আপন কথায় ॥

প্রঃ ১। 'আপন কথায়' গ্রন্থখানি কি জাতীয় রচনা ?

উঃ গ্রন্থখানি আত্মজীবনীমূলক।

প্রঃ ২। 'আপন কথায়' কি কোন একজন লেখকের রচনা ?

উঃ। না, এটি একটি সংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বিভিন্ন মনীষী-লেখকের রচনা সংকলিত হয়েছে।

প্রঃ ৩। 'আপন কথায়' গ্রন্থখানি কে সম্পাদনা করেছেন ?

উঃ। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু।

প্রঃ ৪। গ্রন্থটির নাম 'আপন কথায়' কেন দেওয়া হয়েছে বলে তোমার মনে হয় ?

উঃ। বাংলাদেশের বিভিন্ন মনীষীর নিজের কথা তাঁদেরই লেখার মাধ্যমে এখানে সংগৃহীত হয়েছে। সুতরাং উক্ত মনীষীদের আপন কথাতেই তাঁদের বক্তব্য ফুটে উঠেছে। এই দিক থেকেই গ্রন্থটির এই নাম দেওয়া হয়েছে।

প্রঃ ৫। প্রাচীন ভারতে আত্মচরিত রচনার রীতি ছিল না বলে সম্পাদক কেন মনে করেছেন ?

উঃ। সেকালে 'আত্মপ্রচার নয়—আত্মঘোষণার সংযম পালনই ছিল কবিকুলের নীতি।' সুতরাং কেউই আত্মচরিত লিখতে চান নি।

প্রঃ ৬। সম্পাদকের মতে বিশ্বের প্রাচীনতম আত্মকথা কি ?

উঃ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা। কারণ গীতার বহু শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের কথা বলেছেন।

প্রঃ ৭। ভারতে মুসলিম রাজত্বে রচিত কয়েকটি আত্মজীবনীর নাম কর।

উঃ। তুজুক-ই-বাবরি (সম্রাট বাবরের আত্মজীবনী), তুজুক-ই-জাহাংগীরি (জাহাংগীরের আত্মকথা), জাহানারা বেগমের আত্মজীবনী এবং ফিরুজ-শাহ তুঘলকের আত্মজীবনী।

প্রঃ ৮। মুসলিম রাজত্বে আমরা কোন্ মহিলার আত্মজীবনী লিখিত হতে দেখি ?

উঃ। সম্রাট শাহজাহানের কন্যা জাহানারা বেগমের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ মুসলিম রাজত্বে লিখিত হয়।

প্রঃ ৯। ভারতে আত্মস্মৃতিমূলক রচনার আগ্রহ কোন্ সময় থেকে লক্ষ্য করা যায় ?

উঃ। ইংরেজ আমল থেকে।

প্রঃ ১০। আত্মজীবনীমূলক রচনা থেকে আমরা কি লাভ করতে পারি ?

উঃ। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ থেকে আমরা বিভিন্ন রচয়িতাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারি ; তাঁদের বিভিন্ন কাজের পেছনে যে মানসিকতা কাজ করেছিল তার পরিচয় পাই। তাছাড়া তৎকালীন শাসন-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট পরিচয়ও ঐ সমস্ত আত্মজীবনীর মধ্য থেকে লাভ করা যায়।

প্রঃ ১১। আপন কথায় যে সমস্ত মনীষীর আত্মকথা সংকলিত হয়েছে, তাঁদের নাম উল্লেখ কর। এই সঙ্গে তাঁদের আত্মজীবনীমূলক মূল গ্রন্থ বা রচনাটির নাম কর।

উঃ (এক) রামমোহন রায় বন্ধু গর্ডন সাহেবকে লেখা একটি চিঠি
(দুই) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মজীবনী
(তিন) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আত্মচরিত
(চার) রাজনারায়ণ বসু—আত্মচরিত
(পাঁচ) শিবনাথ শাস্ত্রী আত্মচরিত
(ছয়) মশাররফ হোসেন বিষাদসিন্ধুর ভূমিকা
(সাত) বিপিনচন্দ্র পাল—সত্তর বছর
(আট) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছেলেবেলার স্মৃতি
(নয়) প্রফুল্লচন্দ্র রায়- বেতার বক্তৃতা (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ)
(দশ) স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিবেকানন্দ বাণী রচনা
(এগার) মানকুমারী বসু বঙ্গের মহিলা কবি (যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)
(বার) স্বামী অভেদানন্দ আমার জীবনকথা
(তের) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘরোয়া
(চোদ্দ) ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক সংকলন
(পনের) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ বিবরণী (অবিনাশ ঘোষাল)
(ষোল) সুভাষচন্দ্র বসু— পত্রাবলী
(সতের) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—আমার কালের কথা

প্রঃ ১২। পিতৃবংশের প্রথা অনুসারে রামমোহন কোন্ কোন্ ভাষা শিক্ষা করেছিলেন ?

উঃ। পারসী ও আরবী ভাষা।

প্রঃ ১৩। রামমোহন মাতামহ বংশের প্রথা অনুসারে কি কি ভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন ?

উঃ। রামমোহন সংস্কৃত ভাষা ও উক্ত ভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন।

প্রঃ ১৪। 'আমার একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত আমার মনান্তর উপস্থিত হইল'—উক্তিটি কার ? কেন তাঁর আত্মীয়দিগের সঙ্গে মনান্তর উপস্থিত হয়েছিল ?

উঃ। উক্তিটি রামমোহন রায়ের। ষোল বছর বয়সে হিন্দুদের পৌত্তলিকতার

বিরুদ্ধে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ বইয়ের কথা জানতে পেরে এবং হিন্দুদের পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে তাঁর মতামত পড়ে রামমোহনের নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটেছিল।

প্রঃ ১৫। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে রামমোহনের আক্রমণের বিষয় কি ছিল?

উঃ। রামমোহন তর্ক বিতর্ক বা রচনায় কখনও হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেন নি। হিন্দুধর্মের নামে যে বিকৃত ধর্ম প্রচলিত ছিল, তাই তাঁর আক্রমণের বিষয় ছিল।

প্রঃ ১৬। রামমোহন কবে ইংলণ্ড যাত্রা করেন?

উঃ। ১৮৩০ সালের এপ্রিল মাসে।

প্রঃ ১৭। 'আমার যা কিছু আছে আমি তাহা আর কাহাকেও দিব না, তোমাকে দিব'—উক্তিটি কে, কখন, কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন? শ্রোতা কি পেয়েছিলেন?

উঃ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহী অর্থাৎ ঠাকুরমা মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে এই উক্তি করেন। মৃত্যুর পর ঠাকুরমার বাক্স খুলে দেবেন্দ্রনাথ কতকগুলি টাকা এবং মোহর পেয়েছিলেন।

প্রঃ ১৮। 'মনের মধ্যে অভূতপূর্ব আনন্দ উপস্থিত হইল'—উক্তিটি কার? কি কারণে বক্তার মনে আনন্দ উপস্থিত হয়েছিল?

উঃ। উক্তিটি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তাঁর দিদিমার মৃত্যুর পূর্বদিন শ্মশানে এক খানা চাঁচের ওপর বসে দিদিমার জন্য যে নাম সংকীর্তন হচ্ছিল তা শুনছিলেন। তখন পূর্ণিমার রাত—চন্দ্রোদয় হয়েছে। এই সময় হঠাৎ দেবেন্দ্রনাথের মন উদাস হয়ে গেল, ঐশ্বর্যের ওপর বিরাগ জন্মাল। এই অনুভূতিটিকেই দেবেন্দ্রনাথ অভূত-পূর্ব আনন্দ রূপে বর্ণনা করেছেন।

প্রঃ ১৯। 'আমি গুরুমহাশয়ের প্রিয়শিষ্য ছিলাম'—গুরুমহাশয় কে? শিষ্যটিই বা কে?

উঃ। গুরুমহাশয়ের নাম কালিকান্ত চট্টোপাধ্যায় আর শিষ্যটি হচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

প্রঃ ২০। 'তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল'—এখানে কার কথা বলা হয়েছে? কে বলছেন?

উঃ। এখানে বিদ্যাসাগরের পিতামহদেব রামজয় তর্কভূষণের কথা বলা হয়েছে। বিদ্যাসাগর এই মন্তব্য করেছেন।

প্রঃ ২১। বিদ্যাসাগরের পিতামহের অসাধারণ সাহসের কি পরিচয় বিদ্যাসাগর লিপিবদ্ধ করেছেন?

উঃ। রামজয় তর্কভূষণ অসাধারণ সাহসী ছিলেন। একবার তিনি একটি লোহার লাঠির সাহায্যে একটি ভাল্লুককে হত্যা করেছিলেন।

প্রঃ ২২। 'এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে'—উক্তিটি কার? এই দয়াময়ী কে? বক্তা এঁকে দেবীর আসন দিয়েছেন কেন?

উঃ। উক্তিটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। বিদ্যাসাগর যাঁকে 'দয়াময়ী' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি জগদ্দুর্লভবাবুর বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণি।

রাইমণির দয়া, স্নেহ, সৌজন্য, অমায়িকতা, সংবিবেচনার কথা চিন্তা করে বিদ্যাসাগর তাঁকে দেবীর সম্মান দিয়েছেন।

প্রঃ ২৩। বিদ্যাসাগর ইংরেজী সংখ্যা কি ভাবে চিনেছিলেন ?

উঃ। প্রথম কলকাতায় আসবার সময় রাস্তার মাইল স্টোন দেখে বিদ্যাসাগর ইংরেজী সংখ্যা শিখেছিলেন।

(বিস্তারিত বিবরণের জন্য মূল গ্রন্থের পৃঃ ১২-১৭ দ্রষ্টব্য)

প্রঃ ২৪। শিবনাথ শাস্ত্রীর চোখে তাঁর মায়ের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য হয়ে ধরা পড়েছে ?

উঃ। আত্মমর্যাদাজ্ঞান, তেজস্বিতা, স্নেহমমতা এবং ধর্মনিষ্ঠা।

প্রঃ ২৫। 'প্রথম দিন এই ছাত্রাবাসে আহার করিতে বসিয়া আমার ভিতরে এমন একটা আঘাত লাগে যাহা আজও ভুলিতে পারি নাই।'—উক্তিটি কার ? এখানে কোন্ ছাত্রাবাসের কথা বলা হয়েছে ? বক্তা কি কারণে আঘাত পেয়েছিলেন ?

উঃ। উক্তিটি বিপিনচন্দ্র পালের।

এখানে মেডিকেল কলেজের দক্ষিণে নিমু খানসামার লেনে শ্রীহট্টের ছাত্রদের মেসের কথা বলা হয়েছে। বিপিনচন্দ্র পাল বাল্যকাল থেকেই দেখেছেন, তাঁদের পরিবারের কর্তা থেকে শুরু করে ভৃত্য পর্যন্ত প্রত্যেকের খাদ্যতালিকা একই প্রকার। কলকাতার ছাত্রাবাসে খেতে বসে তিনি দেখলেন এক এক জনের এক এক রকম খাদ্যের ব্যবস্থা—অর্থাৎ যিনি বেশী অর্থ ব্যয় করেছেন, তিনি অতিরিক্ত ডিম, ঘি বা দই পাচ্ছেন। এই বৈপরীত্য বিপিনচন্দ্রের মনে দাগ কেটে দিয়েছিল।

প্রঃ ২৬। রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা কে ? তাঁর রচিত কাব্যের নাম বল।

উঃ। রবীন্দ্রনাথের বড়দাদার নাম ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'স্বপ্নপ্রয়াণ'।

প্রঃ ২৭। 'বড়দার আর একটি অভ্যাস ছিল চোখে পড়বার মতো'—এখানে কোন্ অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে ?

উঃ। রবীন্দ্রনাথের বড়দার সাঁতার কাটা অভ্যাস ছিল। পুকুরে নেমে অন্ততঃ পঞ্চাশবার এপার-ওপার করতেন।

প্রঃ ২৮। ভারতবাসী এখনও ফেরো, সংঘবদ্ধ হয়ে শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায়ে মন দাও—তবে যদি বাঁচতে পারো—নইলে তোমাদের ভবিষ্যৎ নেই' —উক্তিটি কার ?

উঃ। উক্তিটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের।

প্রঃ ২৯। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মূল পার্থক্য কি ?

উঃ। বিবেকানন্দের মতে পাশ্চাত্য দেশে জাতীয়তাবোধ আছে, প্রাচ্য দেশে তা নেই। সভ্যতা ও শিক্ষা পাশ্চাত্যের প্রত্যেককেই স্পর্শ করেছে, কিন্তু প্রাচ্যে এর খুবই অভাব।

প্রঃ ৩০। ভারতবর্ষ জয় করা ইংরেজদের এত সহজ হয়েছিল কেন ?

উঃ। বিবেকানন্দের মতে, ইংরেজরা যেহেতু সংঘবদ্ধ জাতি ছিল, তাই তারা সহজেই ভারতবর্ষ জয় করেছিল।

প্রঃ ৩১। 'অনেক বিষয়ে এ এক আশ্চর্য দেশ ও এক অদ্ভুত জাতি'—উক্তিটি

কার ? এখানে কোন্ দেশের কথা বলা হয়েছে ? লেখকের চোখে ঐ দেশ ও জাতি আশ্চর্য ও অদ্ভুত কেন ?

উঃ। উক্তিটি স্বামী বিবেকানন্দের।

এখানে আমেরিকার কথা বলা হয়েছে। কয়েকটি কারণে লেখকের চোখে আমেরিকাকে আশ্চর্য বলে মনে হয়েছে। প্রথমতঃ, কলকারখানার উন্নতি, দ্বিতীয়তঃ, দেশের ঐশ্বর্য, তৃতীয়তঃ, শ্রমিকদের উচ্চ মজুরি, চতুর্থতঃ, স্ত্রীলোকদের শিক্ষা ও অধিকার।

প্রঃ ৩২। **আমেরিকানদের ত্রুটি কি কি ?**

উঃ। আমেরিকানরা খুব একটা ধর্মপ্রবণ নয়—অধিকাংশ মানুষই পান ভোজন ও টাকা রোজগার ছাড়া আর কিছুর জন্য মাথা ঘামায় না। আমেরিকায় অর্থগত জাতিভেদ বিশ্রী রকমের। নিগ্রোদের ওপর ওদের ব্যবহার পৈশাচিক।

প্রঃ ৩৩। **ভারতবর্ষের সমুদয় দুর্দশার মূল কারণ কি ?**

উঃ। জনসাধারণের দারিদ্র্যই ভারতের দুর্দশার মূল কারণ।

প্রঃ ৩৪। **'একটি চাকা গতিশীল করিতে প্রথমে অনেক কষ্ট ; একবার ঘুরিতে আরম্ভ করিলে উহা উত্তরোত্তর অধিকতর বেগে ঘুরিতে থাকে।'—উক্তিটি কার ? কি প্রসঙ্গে লেখক এই উক্তি করেছেন।**

উঃ। উক্তিটি স্বামী বিবেকানন্দের।

ভারতের অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলোক পৌঁছে দেওয়ার উপায় প্রসঙ্গে লেখক এই উক্তি করেছেন।

প্রঃ ৩৫। **'সেই লাইটবাইটই আমার প্রথম রচনা'—এখানে কার কথা বলা হয়েছে ? বক্তার প্রথম রচনার পরিচয় দাও ?**

উঃ। এখানে মানকুমারী বসু তাঁর নিজের কথা বলেছেন। চরিতাবলীর 'অদ্ভুত' নাম শুনে বালিকাবয়সে 'লাইটবাইটের উপাখ্যান' নামে একটি রচনা লেখেন। লেখিকার মনে হয় ঐ রচনাটি ছিল গদ্য।

প্রঃ ৩৬। **বালিকা বয়সে রচিত মানকুমারীর দু'একটি কবিতাংশের উদাহরণ দাও।**

উঃ। রাখ রাখ সবে ভাই বচন আমার ;
ঈশ্বরের পদে কর কর নমস্কার।

আর একটি উদাহরণ ঃ—

জল শুকাইয়া কূপ হয়ে গেছে মাটি
গাভীতে খেতেছে তাহে ঘাস চাটি চাটি ;
আসিয়া সখী তেলেনী মারে ঝাঁটালাঠি ;
মোর মনে হয় বাবা, তার নাক কাটি।

প্রঃ ৩৭। **'সেই সময় আমি তদানীন্তন সুবিখ্যাত বক্তাদিগের বক্তৃতা শুনিতে ভালবাসিতাম'— কে কাদের বক্তৃতা শুনিতে ভালবাসতেন ?**

উঃ। স্বামী অভেদানন্দ—সুরেন্দ্রনাথ, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি বক্তার বক্তৃতা শুনতে ভালবাসতেন।

প্রঃ ৩৮। 'এ, গ্রন্থ বালকদের পাঠোপযোগী নয়'—উক্তিটি কে কার উদ্দেশ্যে করেছেন? এখানে কোন্ গ্রন্থের কথা বলা হয়েছে? শ্রোতা গ্রন্থটি কি পাঠ করেছিলেন? কিভাবে তিনি গ্রন্থটি পেয়েছিলেন?

উঃ। স্বামী অভেদানন্দের পিতা তাঁর পুত্রের উদ্দেশ্যে আলোচ্য উক্তিটি করেছিলেন।

এখানে 'গীতা' গ্রন্থটির কথা বলা হয়েছে। পুত্রকে চৌদ্দ-পনের বছর বয়সে গীতাপাঠ করতে দেখে স্বামী অভেদানন্দের পিতা গ্রন্থটি লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু আলমারির পেছন থেকে গ্রন্থটি খুঁজে পেয়ে তিনি তখনই ঐ গ্রন্থ পাঠ করতে শুরু করেন।

অভেদানন্দ যখন উদ্বিগ্নচিত্তে 'গীতা' গ্রন্থটি খুঁজছিলেন, তখন কেঁ যেন তার কানে কানে বলে—আলমারির পেছনে ঐ গ্রন্থটি আছে। তিনি সেখানে খুঁজতে গিয়েই বইটি লাভ করেন।

প্রঃ ৩৯। 'যতদূর রিয়ালিস্টিক করা যায় তার চূড়ান্ত হয়েছিল'—কি প্রসঙ্গে কে এই উক্তি করেছেন? কি কি 'রিয়ালিস্টিক' জিনিস করা হয়েছিল?

উঃ। 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয় প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উক্তি করেছেন।

এই অভিনয়ে বিভিন্ন দিক থেকে 'রিয়ালিস্টিক' ভাবটা আনবার চেষ্টা করা হয়েছিল; যেমন, স্টেজে বৃষ্টি হয়েছিল, আয়নায় নানারকম আলো ফেলে বিদ্যুৎ দেখানো হয়েছিল, 'দম্বেল' গড়িয়ে বড় বড় শব্দ করে মেঘের ডাক শোনানো হয়েছিল।

প্রঃ ৪০। 'বাল্মীকি প্রতিভা' কার রচনা? এটি কি জাতীয় রচনা?

উঃ। 'বাল্মীকি প্রতিভা' রবীন্দ্রনাথের রচনা। এটি একটি গীতিনাট্য।

প্রঃ ৪১। 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় কে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন?

উঃ। রবীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন বাল্মীকি, অবনীন্দ্রনাথ ডাকাত, অক্ষয়বাবু দস্যু-সর্দার, বিবি অর্থাৎ ইন্দিরা দেবী লক্ষ্মী, প্রতিভা দিদি সরস্বতী এবং অভি হাতবাঁধা বালিকা।

প্রঃ ৪২। ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর ধারণা কি?

উঃ ঃ ইন্দিরা দেবীর মতে, ইংরেজি সাহিত্যের মতো বিচিত্র সুন্দর মহান্ সাহিত্য খুব কমই আছে। এই সাহিত্যের রস উপভোগ করতে পারা মহা সৌভাগ্য। তাছাড়া সাংসারিক দিক থেকে ইংরেজি ভাষা জানার অনেক সুবিধে আছে—সুবিধেটা এই যে, এই ভাষার সাহায্যে প্রায় সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গেই সখ্য স্থাপন করতে পারা যায়।

প্রঃ ৪৩। শরৎচন্দ্র তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক রচনায় কোন্ কোন্ লেখকের কোন্ কোন্ গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন?

উঃ। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির প্রতিশোধ এবং চোখের বালি, হরিদাসের গুপ্তকথা, ভবানী পাঠক এবং বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।

প্রঃ ৪৪। 'আর কোথাও না হোক, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি'—উক্তিটি কার? তিনি সাহিত্যিকরূপে কাকে গুরুপদে বরণ করেছেন?

উঃ। উক্তিটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সাহিত্য-গুরুর মর্যাদা দিয়েছেন।

প্রঃ ৪৫। 'আপনি আজ বাংগালা দেশে স্বদেশ সেবাযজ্ঞে প্রধান ঋত্বিক'। —এখানে কার কথা বলা হয়েছে? ঋত্বিক শব্দটির অর্থ কি? উক্তিটি কার?

উঃ। এখানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথা বলা হয়েছে। 'ঋত্বিক' শব্দের অর্থ পুরোহিত।

উক্তিটি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর।

প্রঃ ৪৬। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক রচনাটিতে কার কথা বেশি করে বলেছেন?

উঃ। 'সতে'র মা-র কথা বেশি করে বলেছেন।

॥ আচার্য-বাণী-চয়ন ॥

প্রশ্ন ১। 'আচার্য-বাণী-চয়ন' গ্রন্থটি কি জাতীয়?

উঃ। গ্রন্থটি প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ।

প্রঃ ২। 'আচার্য-বাণী-চয়নে' কার বাণী চয়ন করা হয়েছে?

উঃ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাণী এই গ্রন্থে চয়ন করা হয়েছে।

প্রঃ ৩। গ্রন্থটির সম্পাদক কে?

উঃ। শ্রীজাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী।

প্রঃ ৪। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম কবে?

উঃ। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ২রা আগস্ট।

প্রঃ ৫। প্রফুল্লচন্দ্রের মৃত্যু দিন কবে?

উঃ। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুন।

প্রঃ ৬। প্রফুল্লচন্দ্রের মতে, ব্যক্তি ও সমাজ প্রতিষ্ঠার মূল কি?

উঃ। গ্রন্থ-সম্পাদকের ভাষায়, 'স্বপ্ন নয়—কর্ম', অলসতা নয়—শ্রম, চাকুরি নয়—বাণিজ্য, এগুলি ব্যক্তি ও সমাজ প্রতিষ্ঠার মূল।

প্রঃ ৭। 'আমাদের বাংগালীর ছেলের জীবন যেন একটি ভার বওয়া'—মন্তব্যটি কার? এই মন্তব্যের পশ্চাতে তাঁর যুক্তি কি?

উঃ। মন্তব্যটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের।

কলম নিয়ে জীবিকা অর্জন অর্থাৎ কেরানীগিরি করাই বাঙ্গালী ছেলের জীবনের একমাত্র সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে প্রফুল্লচন্দ্র দুঃখ করেছেন। অথচ উন্মুক্ত আকাশ, আলোকের হাসি কিংবা বাতাসের সুখস্পর্শ—পৃথিবীর কোন আনন্দই সে উপভোগ করে না। লেখকের মনে হয়েছে, 'জীবন'-টা যে কিছুই নয়—নলিনী-দলগত জলমিব' বেদান্তের এই মত দু'হাজার বছর ধরে প্রচারিত হয়ে আমাদের জাতীয় চরিত্রটিকে এমনি করে তুলেছে।

প্রঃ ৮। "এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী দেখলে আতঙ্কে আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠে"—বক্তা কে? তাঁর প্রাণ আতংকে শিউরে ওঠে কেন?

উঃ। বক্তা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

তাঁর ভাষায় এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ উপাধিধারীই 'ছদ্মবেশী মূর্খ'। এরা কোন রকমে পরীক্ষাবৈতরণী পার হয়ে পড়াশুনার সংগে সম্পর্ক একেবারে চুকিয়ে দেয়। 'ফার্স্ট ক্লাস' পাওয়া ছেলেরাও পরীক্ষাপাশের পর বইয়ের কাছ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করে। এদের দেখেই প্রফুল্লচন্দ্র ভয় পেয়েছেন।

প্রঃ ৯। 'আমাদের দেশে বহুলোক ছিলেন এবং এখনও আছেন—প্রতিভায় উজ্জ্বল, তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ছিল না'—উক্তিটি কার? লেখক ঐ জাতীয় কোন্ কোন্ প্রতিভাধর ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন?

উঃ। উক্তিটি প্রফুল্লচন্দ্রের।

তিনি কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের নাম উল্লেখ করেছেন।

[*প্রশ্নে উদ্ধৃত প্রতিটি লাইনের 'বক্তা কে' ছাত্রছাত্রীরা তৈরী করে রাখবে। বাহুল্যবোধে ঐ প্রশ্ন আর করা হচ্ছে না।]

প্রঃ ১০। পড়ুয়া কয়েকজন বিদেশী মনীষীর নাম কর।

উঃ মেকলে, গিবন, জনসন, কার্লাইল ইত্যাদি।

প্রঃ ১১। আমরা বিদেশী ডিগ্রীর জন্য ব্যস্ত হই কেন?

উঃ। প্রফুল্লচন্দ্রের মতে, আমরা 'দাস মনোভাবের' ফলেই বিদেশী ডিগ্রীর জন্য লালায়িত হই।

প্রঃ ১২। প্রফুল্লচন্দ্র লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে বছরে কটি বই পড়তেন?

উঃ। প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতায় Imperial Library এবং University Library থেকে অন্ততঃ এক হাজার বই নিয়ে পড়তেন।

প্রঃ ১৩। আমাদের দেশে শিক্ষালাভের অন্যতম প্রকাণ্ড বাধা কি?

উঃ। আগে ইংরেজী ভাষা শিখে তারপর অন্য সব শিক্ষা করতে হয়।

প্রঃ ১৪। লেখাপড়া শেখার সার্থকতা কিসে বলে প্রফুল্লচন্দ্র মনে করেছেন?

উঃ। 'Well-informed' না হতে পারলে লেখাপড়া শেখার কোন 'সার্থকতা নেই' বলে প্রফুল্লচন্দ্র মনে করেছেন।

প্রঃ ১৫। 'প্রাচীন ভারতে রসায়ন চর্চায় তিনি অশেষ খ্যাতিলাভ করেন'—এখানে কার কথা বলা হয়েছে? তিনি কবে জন্মগ্রহণ করেন?

উঃ। এখানে নাগার্জুন নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর কথা বলা হয়েছে। তিনি যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার তিনশত বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রঃ ১৬। 'এই দু'খানি অমূল্য গ্রন্থ খ্রীষ্ট জন্মের বহু পূর্বে রচিত হয়েছিল'—গ্রন্থ দুখানি কি কি? কি জাতীয় গ্রন্থ এগুলি?

উঃ। গ্রন্থ দুখানির একটির নাম 'চরক' ও অন্যটির নাম 'সুশ্রুত'। গ্রন্থ দুটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের অমূল্য গ্রন্থ।

প্রঃ ১৭। প্রাচীন ভারতের রসায়ন বিজ্ঞানের উন্নতির উজ্জ্বল নিদর্শন কি?

উঃ। দিল্লীর কাছে পুরাতন লৌহস্তম্ভটি প্রাচীন ভারতের রসায়ন বিজ্ঞানের উন্নতির উজ্জ্বল নিদর্শন। দেড়হাজার বছর পূর্বে নির্মিত হলেও আজ পর্যন্ত এই লৌহস্তম্ভে বিশেষ কিছু মরচে ধরে নি।

প্রঃ ১৮। 'এত বড় একটা লোহার থাম বর্তমান জগতের কোন সর্বশ্রেষ্ঠ লোহার কারখানাতেও তৈয়ার করা সহজ নয়।'—এখানে কোন্ লোহার থামের কথা বলা হয়েছে? লোহার থামটি কেমন?

উঃ। এখানে দিল্লীর কাছে এক পুরাতন লৌহস্তম্ভের কথা বলা হয়েছে। লোহার-থামটি প্রায় দেড়হাজার বছর পূর্বে তৈরী হয়েছে, অথচ আশ্চর্য ব্যাপার তাতে মরচে ধরেনি। লৌহস্তম্ভটি প্রায় বুটফুট উঁচু অর্থাৎ একটি পাঁচতলা বাড়ীর সমান।

প্রঃ ১৯। পৃথিবী বিখ্যাত এমন কয়েকজন ব্যক্তির নাম কর, যাঁরা পরিশ্রম করে প্রথম জীবন কাটিয়েছেন।

উঃ। ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড, ইটালীর কর্মবীর মুসোলিনী, রাশিয়ার সর্বেসর্বা স্টালিন ইত্যাদি।

প্রঃ ২০। এইভাবে চলিলে আর পঞ্চাশ বছর পরে বাংলাদেশে জনকয়েক উকীল, ডাক্তার ও জনকয়েক আপিসের বাবু ছাড়া আর বাঙ্গালী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না'—কি ভাবে চললে এমন অবস্থা হবে বলে প্রফুল্লচন্দ্র মনে করেছেন?

উঃ। বাঙালীরা কায়িক পরিশ্রম অপমানজনক বলে মনে করে। তারা সামান্য চাকুরি করেই কৃতার্থ বোধ করে—'বাবু' নাম পেয়ে তারা খুশী হয়। লেখকের মতে এইভাবে চললে বাঙালী ধ্বংসের মুখোমুখী হয়ে পড়বে।

প্রঃ ২১। 'পুরাকালে আমাদের দেশে সমস্তই ছিল, ইউরোপ ও আমেরিকা এখনও সেখানে পৌঁছাতে পারে নাই'—এই জাতীয় মন্তব্য সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্রের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি?

উঃ। উপরিউক্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে বক্তার যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, প্রফুল্লচন্দ্র তাকে একেবারেই সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে এ জাতীয় গর্বের কোন মূল্য নেই। যাঁরা এই জাতীয় কথা বলেন, তাঁরা কেউই বলেন না যে, সেই প্রাচীন সাধনা থেকে বাঙ্গালীরা আজ বিরত হয়েছে বলে তাদের এই দুর্দশা। এ শুধু নিজের অক্ষমতা ও লজ্জা ঢাকবার একটা উপায় মাত্র।

প্রঃ ২২। অল্প সময়ের মধ্যে জাপান কি করে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছে?

উঃ। বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলেই জাপানের এই উন্নতি।

প্রঃ ২৩। 'পরমাণুগুলিকে যে আরও ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা যায়, এ কথা কোন্ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন?

উঃ। ক্রুক্স, টমসন, রাদারফোর্ড, বোর প্রভৃতি বিজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করেন।

প্র: ২৪। 'তাঁহারাই আবার বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারেরও প্রথম প্রবর্তক'—তাঁহারা বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

উ:। তাঁহারা বলতে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের কথা বোঝানো হয়েছে।

প্র: ২৫। বিদেশে কোন্ কোন্ বাঙালী বৈজ্ঞানিক আদর পেয়েছেন?

উ:। নীলরতন সরকার, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মেঘনাদ সাহা ইত্যাদি।

প্র: ২৬। 'ইহা কি আমাদের জাতীয় চরিত্রের শোচনীয় দুর্বলতা ও দাস মনোবৃত্তির চূড়ান্ত পরিচয় নহে?'—প্রফুল্লচন্দ্র এখানে কোন্ বস্তুর প্রতি ইংগিত করেছেন?

উ:। হুজুগপ্রিয় বলে বাঙালীর চিরকালীন দুর্নাম; প্রফুল্লচন্দ্রের মতে, এই হুজুগ এবং ইংরেজ-অধীনে বহুকাল বসবাস করার ফলে আমাদের মনের মধ্যে দাসমনোবৃত্তির উদ্ভব হয়েছে। তাই আমরা চিঁড়ে, মুড়ি বা খইয়ের স্থানে বিস্কুটকে সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে দিয়েছি।

উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, আমাদের বাড়ীতে আগত কোন অতিথিকে আমরা যদি মুড়ি এবং তার সংগে নারকেলকোরা, শসা ও গুড় দিয়ে জলখাবার সাজাই, তিনি হয় ভাববেন এরা গরীব, গ্রাম্য প্রথা এখনও ছাড়তে পারে নি, নয়তো ভাববেন তাঁকে যথোচিত সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করা হলো না। পক্ষান্তরে তাঁকে নতুন টিন খুলে যদি খানকয়েক বিস্কুট দেওয়া যায়, তিনি খুবই খুশী হবেন। মুড়ি দিতে আমাদের লজ্জায় মাথা কাটা যায়, অথচ মার্কিনের puffed rice (চাল থেকে তৈরী হাল্কা মুড়ির মত পদার্থ) দিতে পারলে গর্বে বুক ভরে ওঠে। এই জাতীয় মনোবৃত্তিকেই প্রফুল্লচন্দ্র দাসমনোভাব বলেছেন।

প্র: ২৭। বিস্কুটের তুলনায় চিঁড়ে, মুড়ি ইত্যাদি খাবারের প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের পক্ষপাত বেশি কেন?

উ:। বিস্কুট বিলিতি বলেই যে তিনি তাকে বর্জন করতে বলছেন তা নয়, প্রকৃতপক্ষে খাদ্য-উপযোগিতা এবং দাম—উভয় দিক থেকেই বিস্কুটের তুলনায় চিঁড়ে-মুড়ি-খই সুবিধাজনক। ঐ সব সামগ্রীতে ভিটামিন বি-১ বেশি আছে, ডেক্সট্রিনও বিদ্যমান।

প্র: ২৮। অন্নসমস্যা সমাধানের জন্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালীকে কোন্ পথে আহ্বান জানিয়েছেন?

উ:। প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালীকে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ নিতে বলেছেন—বলেছেন আমাদের ধৈর্য এবং সাধুতা সম্বল করে, চাকরির পথে না গিয়ে ব্যবসার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে।

প্র: ২৯। 'আজ যে রাস্তায় বসিয়া জুতা সেলাই করিতেছে, কাল সে প্রেসিডেন্ট হইবারও আশা রাখে'—উক্তিটি কার? এখানে কোন্ দেশের কথা বলা হয়েছে? প্রসংগটি আলোচনা কর।

উ:। উক্তিটি স্বামী বিবেকানন্দের।

এখানে আমেরিকার কথা বলা হয়েছে।

বিবেকানন্দ আমেরিকার জনসাধারণের সঙ্গে ভারতের অবনত শ্রেণীর দুর্দশার তুলনাপ্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন।

বিবেকানন্দের এই মন্তব্য উদ্ধৃত করে প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন, ভারতে সেই স্মরণাতীত কাল থেকেই 'মানুষে মানুষে জাতিবৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, শ্রেণীবৈষম্য এবং বিদ্বেষ-বুদ্ধিজাত ভেদ ও বিবাদের' ফলে 'এক দেশ ও এক জাতি' গঠন করবার সকল শক্তি আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

প্রঃ ৩০। প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কয়েকটি উদ্ধৃতিযোগ্য লাইন বল।

উঃ। (এক) আমি বলি—তোমার যা ভালো লাগে তাই করো, উৎসাহের সহিত একটা নূতন কিছু আরম্ভ করে দাও ; কারণ উকীল, ডাক্তার ও কেরানী—এই নিয়ে জাতি টেঁকে না।

(দুই) ইংরেজীতে একটা কথা আছে, মানুষের সঙ্গী দেখলেই তাকে চেনা যায়। আমি বলি মানুষ কি বই পড়ে তা দেখলেই তাকে চেনা যায়।

(তিন) আমাদের এখন শ্রমশীল হওয়া চাই, অদম্য উৎসাহ চাই, সাহস ও ধৈর্য চাই—মোটের উপর খাঁটি ও শক্ত মানুষ হওয়া চাই।

(চার) যাহা সত্য, মঙ্গল এবং করণীয় তাহা সেই মুহূর্তেই গ্রহণ করিতে হইবে। বাঙলার যুবকদিগকে আজ সকল রকম ন্যাকামি ও কপটতা পরিত্যাগ করিয়া এই সত্যের সম্মুখীন হইতে বলিতেছি।

(পাঁচ) মিথ্যার উপর কোনও মহদনুষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায় না। তোমরা সত্যকে স্বীকার কর এবং বরণ কর। জগৎসভায়, বিশ্বমানবের সম্মুখে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া অকুতোভয়ে, বুক ফুলাইয়া, সতেজে, দীপ্ত অনুরাগের সহিত সত্যের জয়গান কর।

॥ কবিতা সংকলন ॥

প্রশ্ন ১। স্বদেশপ্রেমমূলক দুটি কবিতার নাম কবির নামসহ বল।

উঃ। দুর্ভাগা দেশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাংলা মা—নজরুল ইসলাম

প্রঃ ২। অমিত্রাক্ষর ছন্দ কে প্রবর্তন করেছেন ? এই ছন্দে রচিত কোন কবিতার নাম বল।

উঃ। মধুসূদন দত্ত। সীতা ও সরমা।

প্রঃ ৩। 'কবিতা সংকলন' হতে কাহিনীমূলক কয়েকটি কবিতার নাম বল। ঐ সমস্ত কবিতার রচয়িতা কে ?

উঃ। (ক) সিদ্ধার্থ ও বিম্বিসার—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

(খ) চাঁদ সদাগর—কালিদাস রায়

(গ) ধাত্রী পান্না—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

প্রঃ ৪। এমন কয়েকটি কবিতার নাম কর যাতে প্রধানতঃ পল্লীজীবনের কথা ধ্বনিত হয়েছে—

উঃ। খেয়াডিঙি—যতীন্দ্রমোহন বাগচী।
পাড়াগেঁয়ে—কুমুদরঞ্জন মল্লিক।

প্রঃ ৫। কোন মহিলা কবির নাম বল। তাঁর যে কোন একটি কবিতার নাম উল্লেখ কর।

উঃ। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। কবিতার নাম 'মা ও ছেলে'।

প্রঃ ৬। কোন্ আধুনিক কবির লেখনীতে স্বদেশপ্রেম প্রস্ফুটিত হয়েছে?

উঃ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পারুল বোন'।

প্রঃ ৭। অবহেলিত মানুষের কথা বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের এমন একটি কবিতার নাম কর। এই জাতীয় অন্য কবির কোন কবিতার কথা বলতে পারো?

উঃ। ওরা কাজ করে। সুকান্তের রাণার।

প্রঃ ৮। সমগ্র মানব জাতির জয়গান করা হয়েছে এমন একটি কবিতা কবির নাম সহ উল্লেখ কর।

উঃ। জাতির পাঁতি—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রঃ ৯। কবির নাম সহ প্রকৃতি বর্ণনা মূলক দুটি কবিতার নাম বল।

উঃ। শ্রাবণে—অক্ষয়কুমার বড়াল।
বাংলা মা—নজরুল ইসলাম।

প্রঃ ১০। মহাকবি কালিদাসের কোন কাব্য অবলম্বনে কোন কবিতা কি পড়েছ? পড়ে থাকলে কবিতাটির নাম কি? কবি কে? কোন্ কাব্য অবলম্বনে কবিতাটি রচিত?

উঃ। হ্যাঁ, পড়েছি। কবিতাটির নাম 'যক্ষের আলয়'। লিখেছেন দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুর। কালিদাসের 'মেঘদূত' অবলম্বনে কবিতাটি রচিত।

প্রঃ ১১। নিম্নলিখিত কবিতাগুলির মূল বক্তব্য সংক্ষেপে বুঝিয়ে দাও।

(ক) হিমালয়॥

উঃ। হিমালয়ের মহান মূর্তি কবির চোখে কেমনভাবে ধরা পড়েছে তারই বাণীসুন্দর রূপায়ণ এই কবিতাটি। হিমালয়ের বিরাটত্ব ও মহত্ত্ব এই কবিতার বিষয়বস্তু।

(খ) ধাত্রীপান্না॥

উঃ। চিতোরের শিশু মহারাণা উদয়সিংহের ধাত্রীর নাম পান্না। চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বনবীর উদয়সিংহকে হত্যার চেষ্টা করলে ইনি নিজের সন্তানকে রাজকুমারের বেশে সজ্জিত করেন। বনবীর একেই রাণা ভেবে হত্যা করে। এইভাবে নিজের সন্তানের প্রাণের বিনিময়ে পান্না রাজবংশকে রক্ষা করেন।

(গ) মা ও ছেলে॥

উঃ। মা ও ছেলের স্নেহ সম্পর্কের সুমধুর চিত্র এই কবিতায় ফুটে উঠেছে।

(ঘ) পাছে লোকে কিছু বলে।

উঃ। লোকভয়ে কিংবা লোকলজ্জায় আমরা অনেক কিছুই করতে পারি না। প্রাণ হয়তো আমাদের আকুল হয়ে ওঠে, মন অনেক কিছু করতে চায়, কিন্তু তথাকথিত ঐ ভয় আমাদের স্তব্ধ করে দেয়। কবির অসহায় বেদনার কারণ, তাঁর শক্তি রয়েছে, তবু ভীতি তাঁকে মৃতপ্রায় করে তুলেছে।

(ঙ) মা ॥

উঃ। গর্ভধারিণী জননী আমাদের চিরআরাধ্যা দেবী; মার স্নেহস্পর্শ আমাদের কাছে সর্বদুঃখহর।

(চ) খেয়াডিঙি ॥

উঃ। কবিতাটিতে প্রধানতঃ বর্ষার পটভূমিতে খেয়াডিঙির মাঝির জীবনযাত্রা প্রকাশিত হয়েছে। কোন দিকে কান পাতবার অবকাশ নেই এই মাঝির—সে শুধু নিজের মনে এপার-ওপার করে। আকাশ-গাঙের খেয়ামাঝি 'সুয্যি' যেমন প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেয়া পারাপার করে, ঠিক তেমনি এই মাঝিও সারাদিন খেয়া বেয়ে চলে।

(ছ) জাতির পাঁতি ॥

উঃ। জগৎ জুড়ে একটি জাতিই বিদ্যমান—সে জাতির নাম মানুষ। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময়—মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তাই অর্থহীন।

(জ) পাড়াগেঁয়ে ॥

উঃ। কবি শহরে বাস করলেও আজও গ্রামকে ভুলতে পারেন নি। গ্রামের ভালমন্দ তুচ্ছাতিতুচ্ছ সব কিছু কবিকে আকর্ষণ করে।

(ঝ) মানুষ ॥

উঃ। প্রকৃত মানুষ যে কে তা' কবি এই কবিতায় সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। সমাজের তথাকথিত অবহেলিত শ্রেণী চাষীরা যে তাদের সারল্য নিয়ে আজও বেঁচে রয়েছে. কবি তা' আমাদের স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন।

(ঞ) চাঁদ সদাগর ॥

উঃ। মধ্যযুগে চাঁদসদাগরই একমাত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। যখন দেবতাদের 'অত্যাচারে' মানুষ অসহায়, তখন পুরুষকারের জ্বলন্ত প্রতীক এই চাঁদসদাগর মনুষ্যত্বের অমর মহিমা তুলে ধরেছে।

(ট) বাংলা মা ॥

উঃ। নজরুলের চোখে বাংলা মা-র কোমল-কঠোর রূপটি প্রকৃতির পটভূমিতে সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে।

(ঠ) রাণার ॥

উঃ। 'রাণার' গ্রামের ডাকহরকরা। তার কাজ খবর পেঁাছে দেওয়া—কিন্তু এই রাণারের খবর কেউ রাখে না; তার পিঠে টাকার বোঝা, কিন্তু সে টাকা সে ছুঁতে পারে না।—রাণার যে কর্তব্যের ভার নিয়েছে, সে কাজে সে অটল। রাণারের দায়িত্ববোধ, স্বার্থত্যাগ কবি এ কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজে

কোন কাজই যে ছোট নয়, সেই বোধটিও এখানে পাওয়া যাবে। রাণারের জীবনের প্রতি আন্তরিকতা ও তার কর্মের মহনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাই কবিতাটির মূল সুর।

প্রঃ ১২। 'সীতা ও সরমা' কবিতাটি কে রচনা করেছেন?

উঃ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

[সহায়ক পাঠের প্রতিটি কবিতার রচয়িতার নাম মুখস্থ রাখবে।]

প্রঃ ১৩। কবিতাটি মাইকেলের কোন্ কাব্যের অন্তর্গত?

উঃ। মেঘনাদবধ।

প্রঃ ১৪। এখানে কোন্ ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে?

উঃ। অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

প্রঃ ১৫। "কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটিরে নীরবে,"—পংক্তিটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত? ঐ কবিতাটি কার লেখা? এখানে 'রাঘব-বাঞ্ছা' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? তিনি কাঁদছেন কেন? 'আঁধার-কুটির' কোথায়?

[প্রশ্নকর্তা যে কোন কবিতার যে কোন পংক্তি উদ্ধৃত করে, কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে, কবিতাটি কার লেখা, জিজ্ঞাসা করতে পারেন।]

উঃ। পংক্তিটি 'সীতা ও সরমা' নামক কবিতার অন্তর্গত।

কবিতাটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা।

এখানে সীতাকে রাঘব-বাঞ্ছা বলা হয়েছে। রঘুবংশের সন্তান বলে রামচন্দ্রকে রাঘব এবং রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাকে 'রাঘবের বাঞ্ছা' বলা হয়েছে।

সীতা কাঁদছেন তার কারণ তিনি রাবণ কর্তৃক হৃত হয়ে লংকাপুরীতে বন্দী হয়ে আছেন। তিনি একাকিনী এবং শোকাকুলা।

লংকায় যে গৃহে বন্দী আছেন সীতা, সেই গৃহটি তাঁর কাছে আঁধার কুটির। ঐ কুটিরে আলোকের প্রাচুর্য আছে, কিন্তু সীতার বিরহী শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের কাছে সবই আঁধার বলে মনে হচ্ছে।

প্রঃ ১৬। "ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরী তীরে"—কে কাকে কি প্রসঙ্গে এই কথা বলেছেন? 'সুলোচনা' কে? 'মোরা' কারা? গোদাবরী তীরে তাঁরা কি ভাবে ছিলেন, পাঁচ-ছটি বাক্যের মধ্যে বল।

উঃ। রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতা, বিভীষণের স্ত্রী সরমার উদ্দেশ্যে এই কথা বলেছেন। অশোকবনে যখন সীতা বন্দিনী, সেই সময় সরমা সীতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাবণ কি করে রাম-লক্ষ্মণকে এড়িয়ে সীতাকে হরণ করলো।

'সুলোচনা' শব্দটির অর্থ যে মহিলার চোখ সুন্দর। এখানে সরমাকে উদ্দেশ্য করে এই সম্বোধন করা হয়েছে।

'মোরা' বলতে এখানে রামচন্দ্র এবং সীতাকে বোঝানো হয়েছে।

রামচন্দ্রের বনবাসের সঙ্গী হয়েছিলেন সীতা। তাঁরা যখন পঞ্চবটী বনে গোদাবরী নদীর তীরে বাস করেছেন, সেই সময় রাজকুলবধূ সীতার কাছে সম্পদহীন সেই কুটিরও অত্যন্ত আদরণীয় হয়ে উঠেছিল। দেবর লক্ষ্মণ ফলমূল সংগ্রহ করে আনতেন, রামচন্দ্র মাঝে মাঝে শিকারে যেতেন। কুটিরের চারপাশে ছিল নানা ফুলের সমারোহ আর নিত্য মৌমাছির গুঞ্জন। কোকিল প্রভৃতি নানা পাখী এবং

হরিণ-ময়ূর ইত্যাদি নয়নমুগ্ধকর পশুপক্ষীর নৃত্য-গীতে কুটির-প্রাঙ্গণ সর্বদাই আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠতো। কখনো বা নদীতীরে, কখনো বা পাহাড়ে উঠে রামের সঙ্গে ভ্রমণ করতেন সীতাদেবী। ঋষি-বধূরা বেড়াতে আসতেন। মাঝে মাঝে বনফুলে সজ্জিত হতেন সীতা, রামচন্দ্র তখন তাঁকে বনদেবী বলে সম্ভাষণ করতেন।

প্রঃ ১৭। 'সীতা ও সরমা' কবিতা থেকে দুটি উদ্ধৃতিযোগ্য পংক্তি শোনাও।

উঃ। (ক) সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা তারা-রত্ন যথা!

(খ) আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ!

প্রঃ ১৮। 'শ্রাবণে' কবিতাটির রচয়িতা কে?

উঃ। অক্ষয়কুমার বড়াল।

প্রঃ ১৯। 'কদাচিৎ মেঘের কোলে, মুমূর্ষুর হাসি-সম
চমকিছে বিজলীর হাসি'

—কার লেখা? কোন্ কবিতার লাইন? কবি কি বলতে চেয়েছেন?

উঃ। অক্ষয়কুমার বড়াল। শ্রাবণে। শ্রাবণ মাসের আকাশ নিবিড় কালো মেঘে ঢাকা। ঐ মেঘের কোলে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—ফলে অন্ধকার আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ক্ষণেকের জন্য। এই দেখে কবির মনে হয়েছে মৃত্যু-পথযাত্রী যেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হেসে উঠছে—কিন্তু ঐ হাসি খুবই সাময়িক, তাই বিষন্ন।

প্রঃ ২০। 'শ্রাবণে' কবিতাটির শেষাংশে কবি নিজের কথা কিছু বলেছেন—সংক্ষেপে বলো তো তিনি কি বলেছেন?

উঃ। শ্রাবণের ঘন দুর্যোগ কবিকে অলসপ্রায় করে তুলেছে। কোন কাজে মন নেই তাঁর, তিনি উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। মাঝে মাঝে উঠছেন বা বসছেন, কখনো বা শুচ্ছেন, হয়তো গানও গাচ্ছেন। কিন্তু কেনই বা এ সব করছেন তার কিছুই যেন তিনি বুঝতে পারছেন না। বস্তুতপক্ষে পৃথিবীটাকে তাঁর কাছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরের এক স্বপ্ন-জগৎ বলে মনে হচ্ছে।

প্রঃ ২১। নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি কার রচনা? কোন্ কবিতার অন্তর্গত? কাকে উদ্দেশ্য করে এই পংক্তিসমূহ উল্লিখিত হয়েছে? উক্তিগুলির মূল অর্থ বুঝিয়ে দাও।

(ক) অপমানে হতে হবে, তাহাদের সবার সমান।
(খ) ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
(গ) বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
(ঘ) শাস্ত্রের তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
(ঙ) যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
(চ) মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।

(ছ) নেমেছে ধুলোর তলে হীন পতিতের ভগবান।
(জ) দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে—
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।
(ঝ) মৃত্যুমাঝে হতে হবে চিতাভস্মে সবার সমান।

উঃ। প্রতিটি পংক্তিই রবীন্দ্রনাথের লেখা। 'দুর্ভাগা দেশ' কবিতার অন্তর্গত। স্বদেশ জননী, নিজের জন্মভূমিকে উদ্দেশ্য করে উক্তিগুলি করা হয়েছে।

(ক) আমরা এতদিন যাদের অপমান করেছি, সেই অপমান একদিন আমাদের ওপরেও এসে পড়তে পারে। অস্পৃশ্যতা এবং বর্ণবৈষম্যের নাম করে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীদের আমরা দূরে সরিয়ে অপমান করেছি। এর ফল একদিন ফলবেই।

(খ) প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। এই ধ্রুব সত্যটি আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। অস্পৃশ্য বলে তথাকথিত নীচু জাতকে দূরে সরিয়ে রেখে আমরা প্রকৃতপক্ষে ভগবানকেই ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রেখেছি।

(গ) ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজিত। তিনি প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছেন। অতএব এক শ্রেণীর মানুষের ওপর অপমান তিনি নিশ্চয়ই চিরকাল সহ্য করবেন না। তিনি ক্রুদ্ধ হবেনই। তখন দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে। ভারতবাসী যদি নিজেরা এই বর্ণবৈষম্য দূর না করে তখন দুর্ভিক্ষের অভিশাপ নেমে আসবে জাতির ওপর, সেদিনের হাহাকার ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলিয়ে দেবে।

(ঘ) তথাকথিত হীন, নীচ, অস্পৃশ্য বলে যাদের আমরা দূরে সরিয়ে রেখেছি, তাদের মধ্যেই কিন্তু যথার্থ শক্তি লুকিয়ে আছে। এরাই সভ্যতার পিলসুজ। এদের জন্যই আমাদের এত উন্নতি। অথচ এদের ভদ্রসমাজে স্থান না দিয়ে আমরা দূরে রেখে দিয়েছি।

(ঙ) পৃথিবীর চিরকালীন সত্য এই যে, প্রতিটি কার্যেরই একটি ফলাফল আছে। বিজ্ঞানেও বলে প্রতি কাজেরই একটা প্রতিক্রিয়া আছে। মানব সমাজের পক্ষেও এই সত্য প্রযোজ্য। বর্ণবিভেদ এবং অস্পৃশ্যতার দোহাই দিয়ে যাদের আমরা অপমান করছি, পায়ের তলায় নামিয়ে রেখেছি, এমন দিন আসবে, যখন সেই অবহেলিত শ্রেণীও বিক্ষুব্ধ হয়ে আমাদের নীচে আকর্ষণ করবে। এ ঘটবেই। কারণ দেশের বৃহত্তর অংশ এরাই। এরাই দেশের প্রাণ।

(চ) প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন, এ সত্য যেন আমরা বুঝেও বুঝতে চাই না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতজননী পরাধীনতার গ্লানি ভোগ করেছেন, তবুও মানুষে মানুষে বিভেদ আমাদের ঘোচেনি—আমরা একতাবদ্ধ হতে পারিনি।

(ছ) দেশের বৃহত্তম অংশ—এই যে খেটে খাওয়া মানুষ, এদের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর আছেন। 'রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে, ধুলো তাঁহার লেগেছে দুই হাতে।

(জ) কবি দেশবাসীকে সাবধান করে দিচ্ছেন। বলেছেন জাতির মৃত্যু আজ অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুদূত বুঝি অপেক্ষারত। বর্ণবৈষম্য আর অস্পৃশ্যতার জঘন্য কুসংস্কার থেকে মুক্ত না হলে বিধাতার ক্রুর অভিশাপ আমরা এড়াতে পারব না।

(ঝ) উদার মুক্ত মন নিয়ে বিরাট, বিস্তৃত চিন্তাধারায় যদি আমরা এখনও স্নাত হতে না পারি, যদি কুসংস্কারেই আবদ্ধ থেকে, ভেদাভেদকে জিইয়ে রাখি তবে মৃত্যু এসে আমাদের সবাইকে এক করে দেবে।

প্রঃ ২২। 'ওরা কাজ করে' কবিতাটির মূল বক্তব্য কি ?

উঃ। পৃথিবীতে সময় বয়ে চলেছে। অতীত থেকে কত না দেশ, কত না জাতি তাদের বীর পদভরে নানা দেশ প্রকম্পিত করেছে। কিন্তু সব জয়ই বুঝি আজ নিরর্থক হয়ে গেছে। কালের প্রবাহ সে সব কিছু ধুয়ে মুছে শুধু ইতিহাসের পাতায় একটু স্থান করে দিয়েছে। কিন্তু বেঁচে আছে কি ? সেই 'ওরা' বেঁচে আছে। পৃথিবীর বৃহত্তম অংশ সেই যারা নগরে প্রান্তরে কাজ করে, দাঁড় টানে, হাল ধরে, মাঠে মাঠে বীজ বোনে, ধান কাটে —তারা দিবারাত্র সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে এখনও কাজ করে চলেছে। ওদের মৃত্যু নেই।

প্রঃ ২৩। 'ওরা কাজ করে' কবিতা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতিযোগ্য পংক্তি বলো।

উঃ। (ক) রাজছত্র ভেঙে পড়ে ; রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে ;
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে ;
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।

(খ) শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে
ওরা কাজ করে।

প্রঃ ২৪। নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি মুখস্থ রাখবে। এগুলি কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ, কি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এবং মূল অর্থও তৈরী রাখবে—

এক। কি এক মহান মূর্তি কি এক মহান স্ফূর্তি
মহান উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার।

দুই। স্মরিয়া সে সব কথা মরমে জনমে ব্যথা
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা।

তিন। বাঘিনী রাক্ষসী বড় নিষ্ঠুর জগতে
তারা কিন্তু শত গুণে ভাল আমা হতে।

চার। নারী হয়ে বীর ধর্ম করিব প্রকাশ।

পাঁচ। স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্রে দীক্ষা যার আছে,
কঠোর বীরের ধর্ম পালে সেই জন।

ছয়। আমারও অপত্যবধ হবে ধর্ম হেতু।

সাত। চাঁদে চাঁদে হাসাহাসি চাঁদে চাঁদে মেশামেশি
স্বর্গ মর্ত্যে প্রভেদ কি আছে ?

আট। জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি।

নয়। বর্ণে বর্ণে নাই রে বিশেষ নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।

দশ। বিধাতা দেছেন প্রাণ, থাকি সদা ম্রিয়মাণ
শক্তি মরে ভীতির কবলে।

এগার। বোকামি পড়ে না ন্যাকামিতে ঢাকা যাদের মুখে
ধুলো কাদা আভরণ।

বার। বেতসের মতো সভ্য শিক্ষা শেখেনি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি।

তের। তুমি দেবতারো বড়ো এ যুগের অর্ঘ্য ধরো।

চৌদ্দ। মানুষই দেবতা গড়ে তাহারই কৃপার 'পরে
করে দেব-মহিমা নির্ভর।

পনের। জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে।

ষোল। দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখনি নেই দেরি নেই আর।

উঃ। ১—হিমালয়। ২—যক্ষের আলয়। ৩—৬ ধাত্রীপান্না। ৭—মা ও ছেলে। ৮—৯ জাতির পাঁতি। ১০—পাছে লোকে কিছু বলে। ১১—১২ মানুষ। ১৩—১৪ চাঁদ সদাগর। ১৫—১৬ রাণার।

।। কথা ও কাহিনী ।।

প্রশ্ন ১। 'কথা ও কাহিনী' কার রচনা ?

উত্তর। 'কথা ও কাহিনী' রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রঃ ২। কথা ও কাহিনী কি জাতীয় গ্রন্থ ?

উঃ। এটি কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতা এখানে সংকলিত হয়েছে।

প্রঃ ৩। 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলির উপাদান কবি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন ?

উঃ। নেপালী বৌদ্ধসাহিত্য, টডের রাজস্থান গ্রন্থ, ইংরেজি শিখ-ইতিহাস গ্রন্থ এবং ভক্তমাল গ্রন্থ হতে কবি কবিতাগুলির উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

প্রঃ ৪। নিম্নলিখিত কবিতাগুলির মূল বক্তব্য সংক্ষিপ্ত ভাবে কয়েকটি বাক্যে প্রকাশ কর।

।। শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা ।।

উঃ। ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধকে শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা দিতে পারে সে, যে নিজের একান্ত আপনার জিনিসটি অকাতরে ত্যাগ করতে পারে। বুদ্ধের শিষ্য অনাথপিণ্ডদ শ্রাবস্তীপুরের কোথা থেকেও সেই বস্তুটি পেলেন না। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মহানগরীর বাইরে যখন কাননে প্রবেশ করছেন, তখন দীনহীন এক নারী পরিধেয় তার একমাত্র বস্ত্রখানি অরণ্যের আড়ালে গিয়ে ভিক্ষা দিল। এই নারী ভিক্ষা দেবার জন্য লজ্জা পর্যন্ত বিসর্জন দিল—এর ভিক্ষাই শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা।

প্রঃ ৫। প্রতিনিধি ।।

উঃ ভারতীয় রাজধর্মের আদর্শ এই কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে। শিবাজী নিজেকে রাজ্যহীন করলে গুরু রামদাস তাঁকে নিজের প্রতিনিধিরূপে পুনরায় রাজ্যে স্থাপন করলেন। শিবাজী এখন সন্ন্যাসী রামদাসের প্রতিনিধি মাত্র—তাঁকে নির্লিপ্ত নিরহংকারভাবে রাজ্যপালন করতে হবে—ভোগবাসনাবর্জিত জীবনে সর্বদা নিজেকে নিঃস্ব ভিখিরী বলে মনে করতে হবে। রাজপদ যে সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য—এই মহান আদর্শ রামদাস স্বামী তাঁর শিষ্য শিবাজীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

প্রঃ ৬। ব্রাহ্মণ ।।

উঃ। প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব গোত্র বা বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সত্যভাষণেই দ্বিজত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব প্রকাশ পায়।

প্রঃ ৭। মস্তক বিক্রয় ।।

উঃ। দুটি বিভিন্নধর্মী চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতে কবি কবিতাটিতে অপূর্ব সৌন্দর্য প্রকাশ করেছেন। মহত্ত্বের চরম আত্মদানে পশুবলের দম্ভ চূর্ণ হয়েছে, শত্রুর পাষাণ হৃদয় ভেঙে প্রেম ও মৈত্রীর ধারা প্রবাহিত হয়েছে।

প্রঃ ৮। পূজারিণী ।।

উঃ। শ্রীমতী যথার্থ পূজারিণী। তিনি মূর্তিমতী ভক্তি। তাঁর দৈহিক সত্তার স্থূলে অনুভূতি নেই বলে মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। প্রকৃত মুক্তি হচ্ছে রাজভয়, লোকভয়, মৃত্যুভয়—সর্বপ্রকার ভয় থেকে মুক্তি। আর মুক্তি চাই কামনা থেকে। কামনা আমাদের দেহকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। শ্রীমতী এই দেহকে জয় করে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করে নির্বাণ লাভ করলেন।

প্রঃ ৯। অভিসার ।।

উঃ। যৌবনগর্বে গর্বিতা রাজনর্তকী বাসবদত্তা সন্ন্যাসী উপগুপ্তকে আহ্বান করে ব্যর্থ হয়েছিল। সন্ন্যাসী বলেছিলেন, সময় হলে তিনি নিজেই যাবেন তার গৃহে। এই নর্তকী যখন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে বিকৃত মুখশ্রী আর দেহ নিয়ে নগরের বাইরে যন্ত্রণায় কাতর, সেই মুহূর্তে সন্ন্যাসী এসে সযত্নে তাকে কোলে তুলে সেবা করলেন।

প্রঃ ১০। পরিশোধ ।।

উঃ। শ্যামা উত্তীয়ের প্রাণের বিনিময়ে বজ্রসেনকে মুক্ত করেছিল। এর পেছনে ছিল বজ্রসেনের প্রতি শ্যামার অকৃত্রিম ভালবাসা। কিন্তু পাপমূল্যে কেনা এই মুক্তি বজ্রসেনকে শ্যামার প্রতি বিরূপ করলো—সে ভালবাসার জনকে ত্যাগ করল। কিন্তু মন থেকে মুছতে পারলো না সে শ্যামার স্মৃতি। ভালবাসা আর কর্তব্যবোধের প্রচণ্ড দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো কর্তব্যই।

প্রঃ ১১। সামান্য ক্ষতি ।।

উঃ। বিপুল ঐশ্বর্যময়ী গর্বোদ্ধতা রাণীর কাছে প্রজার জীর্ণ কুটির পুড়ে যাওয়া কিছুই নয়—'এক প্রহরের প্রমোদ' মাত্র। কিন্তু এ ক্ষতি যে সামান্য ক্ষতি নয়, তা বুঝতে হলে রাণীকে দীনহীন হতে হবে। রাজা রাণীকে ভিখিরী করে, রাণীত্ব অপহরণ করে ঐ কুটির কটি পুনঃপ্রত্যর্পণ করতে এক বছর সময় দিলেন।

প্রঃ ১২। মূল্যপ্রাপ্তি ।।

উঃ ঈশ্বরের কাছে আমাদের হৃদয়ের সঞ্চিত রত্নটুকু নিয়ে গিয়ে তাঁকে দিতে পারলে আমাদের আনন্দ। সেই শুভ মুহূর্তে হৃদয়ের সমস্ত কামানাই স্তব্ধ হয়ে যায়, প্রার্থিত হয় শুধুমাত্র ঈশ্বরের একবিন্দু করুণা।

প্রঃ ১৩। স্পর্শমণি ॥

উঃ প্রকৃত ঐশ্বর্য স্পর্শমণির স্পর্শে লাভ করা যায় না। ঐশ্বর্যের প্রতি নির্লিপ্ততা আর ত্যাগই মানুষকে প্রকৃত ধনী করতে পারে।

প্রঃ ১৪। বন্দী বীর।

উঃ। প্রকৃত দেশভক্তের কাছে সর্বপ্রকার নির্যাতন তুচ্ছ। পিতা তখন অক্লেশে পুত্রের প্রাণহরণ করতে পারেন, পুত্র হাসিমুখে এগিয়ে দিতে পারে নিজের দেহ।

প্রঃ ১৫। মানী ॥

উঃ। প্রকৃত বীর অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। ভয়ের কাছে তিনি কিছুতেই নতিস্বীকার করেন না। এর জন্য মৃত্যুভয়ও তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়।

প্রঃ ১৬। শেষ শিক্ষা ॥

উঃ। অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতেই হবে। কোন রকম প্রলোভনেই প্রতিশোধ চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া চলবে না। গুরু গোবিন্দ নিজের প্রাণ দিয়ে এই শিক্ষাই দিয়ে গেলেন নিজের শিষ্য পাঠান পুত্র মামুদকে।

প্রঃ ১৭। **'কোথা হা হন্ত, চিরবসন্ত! আমি বসন্তে মরি'।**

—পংক্তিটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত? উক্তিটি কার? উক্তিটিতে 'বসন্ত' শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। দুটি শব্দের অর্থই কি এক?

উঃ। 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার অন্তর্গত। উক্তিটি পুরাতন ভৃত্যের কর্তার। এখানে প্রথম 'বসন্ত' কথাটির অর্থ বসন্ত ঋতু আর দ্বিতীয় 'বসন্ত'টির অর্থ বসন্ত নামক রোগ।

প্রঃ ১৮। **'চল, তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে'—কোন্ কবিতার অন্তর্গত? উক্তিটি কার? বক্তা কাকে উদ্দেশ্য করে কেন এই উক্তি করেছিল?**

উঃ। 'দেবতার গ্রাস'।

উক্তিটি রাখালের মা মোক্ষদার।

বক্তা তার পুত্র রাখালকে উদ্দেশ্য করে এই উক্তি করেছিল। গঙ্গাসাগরে যাওয়ার জন্য সে যখন কিছুতেই নৌকা ছেড়ে নামছিল না, তখন রাগের মুহূর্তে মোক্ষদা এই উক্তি করেছিল।

প্রঃ ১৯। **বেটারে শূলে বিঁধে কারার মাঝে
করিয়া রাখো রুদ্ধ'—**

—উক্তিটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত? কে বলেছেন? এই উক্তি থেকে বক্তার চরিত্রের কি পরিচয় পাও?

উঃ। 'জুতা আবিষ্কার'।

হবু রাজার গবু মন্ত্রী।

একজোড়া জুতো পায়ে দিলেই ধুলোর হাত থেকে পা-কে রক্ষা করা যায়। এই সহজ উপায়ে সমস্যার সমাধান করতে দেখে মন্ত্রী খুশী হলেন না। এ যেন রাজ-মর্যাদার পক্ষে হানিকর। একশ্রেণীর মানুষ আছে, যাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দেখিয়ে দিলেও তারা চটে যায়, ভাবে তাকে তুচ্ছ করা হচ্ছে, তার চেষ্টাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। গবু মন্ত্রী এই দলেরই।

প্রঃ ২০। 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' কবিতাটি কে লিখেছেন? কবিতাটি কোন্ কাব্য-গ্রন্থের অন্তর্গত?

উঃ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'কথা ও কাহিনী'র অন্তর্গত।

[প্রতিটি কবিতা থেকেই এ জাতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হতে পারে।]

প্রঃ ২১। 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' কবিতায় কোন্ ভিক্ষাকে শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা বলা হয়েছে? কোন্ দিক থেকে এই ভিক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করলো?

উঃ। বুদ্ধদেবের শিষ্য অনাথপিণ্ডদ যখন শ্রাবস্তীপুরীর দ্বারে দ্বারে ঘুরে বুদ্ধদেবের জন্য ভিক্ষা চাইছিলেন, তখন প্রায় নিঃস্ব দরিদ্র এক রমণী তার একমাত্র পরিধেয় জীর্ণ বস্ত্রখানি দান করেছিল। এই পরিধেয় দানকেই শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা বলা হয়েছে।

পুরবাসীরা অনেকেই নানাবস্তু ভিক্ষা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু অনাথপিণ্ডদ তা' গ্রহণ করেন নি। কারণ নিজের ভোগের পর যা কিছু উদ্বৃত্ত ছিল, তাই তারা দান করতে চেয়েছিল। কিন্তু ঐ রমণী তার একমাত্র সম্বল পরিধেয় বস্ত্রটি অকেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করেছিল। এই কারণেই এই দান শ্রেষ্ঠ দান রূপে মর্যাদা লাভ করলো।

প্রঃ ২২। **ধন্য মাতঃ, করি আশীর্বাদ,**
মহাভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
পলকে।

— উক্তিটি কার? কার উদ্দেশে 'মাতঃ' সম্বোধন করা হয়েছে? মহাভিক্ষুকের সাধ পূর্ণ হলো কি করে?

উঃ। উক্তিটি অনাথপিণ্ডদ নামে বুদ্ধদেবের এক শিষ্যের।

তিনি এক 'দীন নারী'কে 'মাতঃ' বলে সম্বোধন করেছেন, যে নারীর একমাত্র সম্পদ ছিল একটি পরিধেয় বস্ত্র।

মহাভিক্ষুকের সাধ পূর্ণ হলো তখনই যখন তিনি এক নিঃস্ব নারীর কাছ থেকে বুদ্ধদেবের জন্য নিবেদিত একটি বস্ত্র পেলেন। ঐ নারীর ঐ বস্ত্রটিই ছিল একমাত্র পরিধেয়। ঐ নারী লজ্জা নামক অনুভূতিটিকেও বিসর্জন দিতে পেরেছেন, এই জাতীয় সর্বস্ব নিবেদনের জন্য মহাভিক্ষুক খুশী হয়েছিলেন।

প্রঃ ২৩। 'প্রতিনিধি' নাম দিয়েছেন কেন রবীন্দ্রনাথ ?

উঃ। প্রতিনিধিতে একটি কাহিনী আছে। এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে ভারতীয় আদর্শে রাজধর্মের মূলতত্ত্ব কী, তা প্রকাশ পেয়েছে। রাজা সর্বদা নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ভাববেন। রাজ্য প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের, তাঁর নয়। প্রজাশাসন এবং সমাজের কল্যাণের জন্য ঈশ্বর রাজাকে আপন প্রতিনিধিরূপে সংসারে পাঠিয়েছেন। অতএব উদাসীনভাবে, নির্লিপ্ত মন নিয়ে, স্বার্থশূন্যভাবে রাজাকে তাঁর কর্তব্য করে যেতে হবে।

প্রঃ ২৪। প্রতিনিধি কবিতায় কে কার প্রতিনিধিত্ব করেছেন ?

উঃ। আপাতদৃষ্টিতে গুরুদেব রামদাসের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ছত্রপতি শিবাজী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশের রাজা যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এ কথাই এ কবিতায় বলা হয়েছে।

প্রঃ ২৫। প্রকৃত 'পূজারিণী' কে ?

উঃ। শ্রীমতী।

প্রঃ ২৬। অজাতশত্রু কে ? তিনি রাজা হয়ে কি ঘোষণা করেছিলেন ?

উঃ। অজাতশত্রু মগধ-রাজ বিম্বিসারের পুত্র। তিনি রাজা হয়ে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর রাজ্যে বাস করতে হলে মাত্র তিনজনের পূজা করা চলতে পারে। এই তিনজন হচ্ছে : বেদ, ব্রাহ্মণ এবং রাজা।

প্রঃ ২৭। 'রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁড়াল আসি।'—কোন্ কবিতার অন্তর্গত ? রাজমহিষী কে ? কে এসে দাঁড়াল ? সে কেন এসেছিল ?

উঃ। পূজারিণী। রাজমহিষী অজাতশত্রুর মাতা। শ্রীমতী। বুদ্ধদেবের পূজা নিয়ে যাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে সে এসেছিল।

প্রঃ ২৮। শ্রীমতীরে হেরি বাঁকি গেল রেখা কাঁপি গেল তার হাত—
—শ্রীমতী কে ? তাকে দেখে কার হাত কেঁপে গেল ? কেনই বা কাঁপলো ? তিনি শ্রীমতীকে কি বললেন ?

প্রঃ ২৯। চমকি উঠিল শূন্য কিংকিণী চাহিয়া দেখিল দ্বারে—
—কে চমকে উঠল ? কেন সে চমকাল ? ঐ সময় সে কি করছিল ? দ্বারে কাকে সে দেখেছিল, তাকে কি বলল ?

উঃ। প্রঃ ২৮ ও ২৯-এর উত্তরের জন্য কবিতাটি দেখ।

প্রঃ ৩০। স্তূপ পদমূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা—
'শেষ আরতির শিখা' বাক্যাংশটির দ্বারা কবি কি বলতে চাইছেন ?

উঃ। বাক্যাংশটি দুটি অর্থে এখানে প্রযুক্ত হয়েছে। একটি সাধারণ অর্থ। শ্রীমতী বুদ্ধদেবের শেষ ভক্ত। তার নিবেদিত প্রদীপই বুদ্ধদেবের সেই স্তূপের

উদ্দেশে নিবেদিত শেষ প্রদীপ। শেষ সেই প্রদীপের শিখা। অন্যটি অপেক্ষাকৃত গভীর অর্থবহ। শ্রীমতীর জীবনটিই বুঝি আরতির শিখা। বুদ্ধদেবের প্রতি তার ভক্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে এক পরম মৃত্যুর শুভলগ্নে অমর জীবন লাভ করল।

॥ অন্যান্য কবিতা থেকে স্মরণীয় উদ্ধৃতি ॥

১। রূঢ় দীপের আলোক লাগিল ক্ষমা সুন্দর চক্ষে—

২। শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি—

৩। 'এ ধরণীতল কঠিন কঠোর—
এ নহে তোমার শয্যা'

৪। 'আজি রজনীতে হয়েছে সময়' (অভিসার)

৫। ওই ঘরে তোরা লাগাবি অনল
তপ্ত করিব কর পদতল (সামান্য ক্ষতি)

৬। 'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে (নগর লক্ষ্মী)

৭। 'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মানো না মণি
তাহার খানিক, মাগি আমি নতশিরে' (স্পর্শমণি)

৮। জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন (বন্দী বীর)

৯। শেষ শিক্ষা দিয়ে গেনু (শেষশিক্ষা)

১০। কোথা হা হন্ত চিরবসন্ত! আমি বসন্তে মরি। (পুরাতন ভৃত্য)

১১। 'চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে'।

১২। চলিনু সাগরে। আবার ফিরিব মাসি।

১৩। শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা,
শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা!

১৪। ফিরায়ে আনিব তোরে (দেবতার গ্রাস)

১৫। বেটারে শূল বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখো রুদ্ধ (জুতা আবিষ্কার)

॥ মায়ামুকুর ॥

কাজী নজরুল ইসলাম

প্রশ্ন ১। 'মায়ামুকুর' কাব্যগ্রন্থ কার রচনা?

উত্তর। কাজী নজরুল ইসলামের।

প্রঃ ২। 'মায়ামুকুর' কি জাতীয় গ্রন্থ?

উঃ এটি নজরুল-কাব্যের একটি সংকলন গ্রন্থ।

প্রঃ ৩। মায়ামুকুর থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতার নাম কর।

উঃ। মায়ামুকুর, চল্ চল্ চল্, জাতের বজ্জাতি, সাম্য, প্রলয়োল্লাস, কিশোর-স্বপন, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার ইত্যাদি।

প্রঃ ৪। স্বদেশপ্রেমমূলক কয়েকটি কবিতার নাম বল।

উঃ। চল্ চল্ চল্, সাম্য, প্রলয়োল্লাস, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার এবং পূজারিণী।

প্রঃ ৫। নজরুলের এমন কয়েকটি কবিতার নাম কর, যেখানে বঙ্গমাতার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও মমতা প্রকাশিত হয়েছে।

উঃ। পূজারিণী এবং বাংলা-মা।

প্রঃ ৬। ছাত্রদের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়েছে এমন কয়েকটি কবিতার নাম উল্লেখ কর।

উঃ। কিশোর-স্বপন, সংকল্প, চল্ চল্ চল্ ইত্যাদি।

প্রঃ ৭। 'মায়ামুকুরের' কোন্ কবিতাটিতে বাংলার শিশুদের প্রতি নজরুলের অসীম বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে?

উঃ 'মায়ামুকুর' কবিতাটিতে।

প্রঃ ৮। হিন্দু মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব নজরুলের কোন্ কবিতার বিষয়বস্তু?

উঃ 'মোরা দুই সহোদর ভাই' কবিতার।

প্রঃ ৯। প্রচণ্ড বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়েছে, নজরুলের এমন কয়েকটি কবিতার নাম কর।

উঃ প্রলয়োল্লাস, যুগান্তরের গান, অভিশাপ ইত্যাদি।

প্রঃ ১০। কোমল সুরের অনুরণন নজরুলের কোন্ কোন্ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে?

উঃ শেষ প্রার্থনা, পূজারিণী, বাসনা, নমস্কার, এ মোর অহংকার, বাংলা-মা, আশা, ইত্যাদি কবিতায় ।

প্রঃ ১১ । এমন দুটি কবিতার নাম কর যা বাংলাদেশের দুই বিখ্যাত কবির মহাপ্রয়াণ উপলক্ষ্যে লেখা হয়েছে ।

উঃ রবিহারা ও সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ ।

প্রঃ ১২ । স্বদেশপ্রেম-মূলক নজরুলের কোন্ কবিতায় বাংলার প্রকৃতিচিত্র সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে ?

উঃ 'বাংলা-মা' কবিতায় ।

প্রঃ ১৩ । 'মায়ামুকুর' কাব্যগ্রন্থের নামকরণের তাৎপর্য কি ?

উঃ মায়ামুকুর শব্দটি যথার্থ অনুধাবনের জন্য 'মায়ামুকুর' নামক কবিতাটি স্মরণীয় । কবি বলছেন, আমাদের মনের দর্পণে আমাদের যথার্থ স্বরূপ ফুটে ওঠে । কিন্তু নিজে স্বরূপ দেখবার মতো শক্তি চাই, বিশ্বাস চাই । কবির ভাষায়,

'তোমাদের মন-মায়া দর্পণে
দেখ যদি নিজ কায়া,
দেখিবে তোমার ঐ দেহে আছে
সারা বিশ্বের ছায়া ।

প্রঃ ১৪ । 'মায়ামুকুর' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত নজরুলের দুটি গানের উল্লেখ কর ।

উঃ 'চল্ চল্ চল্' এবং 'প্রলয়োল্লাস' ।

প্রঃ ১৫ । নিম্নলিখিত কবিতাগুলির মূল বক্তব্য সংক্ষেপে কয়েকটি বাক্যে বল ।

॥ মায়ামুকুর

উঃ প্রতিটি শিশুর মধ্যেই মহামানব আছেন, প্রতিটি শিশুই অমৃতের সন্তান, তবে সুপ্ত ঐ মহামানবকে জাগিয়ে তুলতে হবে । নিজেকে সঠিকভাবে চিনতে পারলে দেখা যাবে, ভগবানের অসীম শক্তি প্রতিটি শিশুর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে । কবির বক্তব্য, শিশুরা যেন নিজেদের দীন বা ক্ষুদ্র না ভাবে—প্রয়োজন হলে তারা এই 'বিপুল বিশ্বভূমি' জয় করে নিতে পারে—এ বিশ্বাস তাদের থাকা চাই ।

প্রঃ ১৬ । চল্ চল্ চল্ ॥

উঃ এই কবিতায় কবি তরুণদলকে চলার মন্ত্রে দীক্ষিত করছেন । সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে তরুণদলকে অগ্রসর হতে হবে, তবেই জাতির জীবনে নতুন প্রভাত নেমে আসবে ।

প্রঃ ১৭। বিশ্বাস ও আশা ॥

উঃ। কবিতাটিতে জীবনের প্রতি কবির প্রবল বিশ্বাস ও আশা ধ্বনিত হয়েছে। ব্যথা-বেদনা, দারিদ্র্য ইত্যাদি জীবনে আছেই, কিন্তু তা থেকে উত্তরণ চাই। অদৃষ্টের দোহাই না দিয়ে, 'বৃহৎ কল্পনা' আর 'মহৎ স্বপ্ন' দেখে যেতে হবে, আর ঐ আন্তরিক বিশ্বাসই পৃথিবীতে নিয়ে আসবে 'বৃহৎ কল্যাণ'।

প্রঃ ১৮। জাতের বজ্জাতি ॥

উঃ। মানুষে মানুষে জাতিবৈষম্য, শ্রেণীবৈষম্য, বর্ণবৈষম্য এবং বিদ্বেষবুদ্ধি-জাত ভেদ ও বিবাদের ফলে একজাতি গঠন করবার সমস্ত শক্তি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মানুষ জাতের নামে 'বজ্জাতি' করে 'জুয়া' খেলছে। কবির চোখে এরা সব 'জালিয়াত'। এদের জন্যেই দেশের সর্বাঙ্গীণ অবক্ষয়। কবি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, জাত নয়, কর্মই আমাদের বিচারক।

প্রঃ ১৯। মোরা দুই সহোদর ভাই ॥

উঃ। কবির দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলমান দুই সহোদর ভাই, যেন একই বৃন্তে দুটি ফুল। অথচ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিবাদ এই দুই জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেশকে দুর্বল করে তুলেছে।

প্রঃ ২০। সাম্য ॥

উঃ। এই কবিতায় কবি এমন এক সাম্যের গান গেয়েছেন, যেখানে রাজা-প্রজা, ধনী দরিদ্র, সাদা-কালো কোন কিছুরই ভেদাভেদ নেই। এখানে হাতে হাত রেখে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সবাই মিলেছে।

প্রঃ ২১। প্রবর্তকের ঘুর-চাকায় ॥

উঃ। প্রবর্তকের ঘূর্ণ্যমান চক্রে প্রাচীন আর অতীত তাদের সব কিছু জীর্ণতা নিয়ে চলে যাচ্ছে, শূন্য স্থান অধিকার করতে আসছে নতুন জয়পতাকা উড়িয়ে।

প্রঃ ২২। প্রলয়োল্লাস ॥

উঃ। কবিতাটি নজরুলের চড়া সুরের একটি কবিতা। প্রলয়ের ভয়াবহতা এবং উল্লাসের প্রাচুর্য এই কবিতার মূল সুর। প্রচণ্ড বিক্রম নিয়ে অসুন্দর আর জরাজীর্ণ সব কিছুকে উড়িয়ে নিয়ে আসছে নতুন। তার রূপ হয়তো ভয়ংকর, কিন্তু এই চিরসুন্দর ভাঙতে যেমন জানে, তেমন গড়তেও জানে। যে নতুনের আবির্ভাব ঘটছে, সে ধ্বংসের মধ্য থেকেই সৃষ্টির নতুন সুরে পৃথিবী ভরিয়ে তুলবে।

প্রঃ ২৩। সত্যেন্দ্র প্রয়াণ ॥

উঃ। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত ছন্দের যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মহা-প্রয়াণ উপলক্ষ্যে কবিতাটি রচিত। বাংলাদেশের প্রকৃতি এবং মানুষ তাকে হারিয়ে বেদনায় মূক হয়ে গেছে। কিন্তু কবি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ চির-

অমর—অর্থাৎ তাঁর কবিতা মৃত্যুর হাত এড়িয়ে চিরকাল জীবিত থাকবে, কারণ সত্যেন্দ্রনাথ সরস্বতীর আশীর্বাদধন্য।

প্রঃ ২৪। **ভাঙার গান**॥

উঃ। কবিতাটিতে কাজী নজরুলের প্রচণ্ড বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়েছে। এই বিদ্রোহ পরাধীনতার বিরুদ্ধে। কবি পরাধীন ভারতবর্ষের প্রত্যেককে প্রচণ্ড বিক্রমের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ফেলবার ডাক দিয়েছেন।

প্রঃ ২৫। **কিশোর-স্বপ্ন**।

উঃ। নজরুলের এই কবিতার কিশোর আর বিপদহীন নিশ্চিত আরামের দেশে থাকতে চাইছে না। সে যৌবনের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, ভারতমাতাকে আবার জগৎ-সভার শ্রেষ্ঠ আসন প্রত্যর্পণ করতে চায়। স্বাধীনতার এই মহৎ যজ্ঞে যদি মৃত্যু নেমে আসে, তাতে ক্ষতি নেই, তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ কোটি ছেলেকে দেখে 'মা' তাঁর শোক ভুলে যাবেন।

প্রঃ ২৬। **সংকল্প**।

উঃ। 'আঁচল ঢাকা গণ্ডী-আঁকা' দেশে বাস করে তরুণের মন প্রাণপ্রাচুর্য হারিয়ে ফেলছে। তাই তার সংকল্প বিশ্বজগৎকে অনুপুঙ্খভাবে ঘুরে দেখবে সে, দেখবে কিসের নেশায় মানুষ এত দুঃসাহসী।

প্রঃ ২৭। **কোথা পূর্ণযোগী**।

উঃ। ভারতের এই সর্বাঙ্গীণ অবক্ষয়ের যুগে কবি আকুল প্রত্যাশায় এমন এক পূর্ণযোগীর আবির্ভাব কামনা করছেন, যিনি আবার আমাদের সেই জাগ্রত ভারতে নিয়ে যাবেন। কিন্তু কোথায় তিনি? ধর্মের নামে অধর্ম চলছে বলেই আজ বিধাতার অভিশাপে জাতির জীবনে এত দারিদ্র্য-ব্যাধি-দুর্গতি।

প্রঃ ২৮। **রবিহারা**।।

উঃ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষ্যে কবিতাটি রচিত। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাঙালী জাতি আজ অসহায় হয়ে পড়েছে—তাদের কান্নার সঙ্গে সঙ্গে শ্রাবণের কান্নাও বুঝি এক হয়ে অঝোরে ঝরে পড়ছে। বাঙলা দেশের পক্ষে এত বড় প্রতিভার আবির্ভাব যেন সত্যিই অবিশ্বাস্য। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের জন্য পৃথিবীতে আমাদের এত মর্যাদা, তাঁরই প্রসাদে আমরা 'ক্লৈব্য দীনতা উপবাস ক্ষুধা জরা' ভুলে গিয়েছি।

প্রঃ। **বাংলা মা**।।

উঃ। কবি বাংলা মাকে একই সঙ্গে কোমল ও কঠোররূপে আবিষ্কার করছেন। বাংলা মার এই রূপ বাংলাদেশের গিরি দরী (গুহা) বনে মাঠে প্রান্তরে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

প্রঃ ৩০। **কাণ্ডারী হুঁশিয়ার**।।

উঃ। কাণ্ডারী তথা দেশনেতাকে কবি সাবধান করে দিচ্ছেন এই কবিতায়। এই সাবধানতা প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। দেশনেতাকে প্রবল দারিদ্র্য নিয়ে সব কিছুকে অস্বীকার করে এগিয়ে যেতে হবে—তবেই ভারতের ভাগ্যাকাশে পুনরায় উদিত হবে নতুন সূর্য।

প্রঃ ৩১। শিকল পরার গান ॥

উঃ। কবি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বলছেন, তারা আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। ওরা আমাদের ভয় দেখিয়ে শাসন করছে, কিন্তু সে দিন আসছে, যেদিন আমরা ঐ ভয়েরই টুঁটি টিপে ধরে তাকে বিনাশ করবো। এই শৃঙ্খল আমাদের কাছে হয়ে উঠবে মুক্তি।

প্রঃ ৩২। বাসনা ॥

উঃ। নজরুলের নরম সুরের একটি কবিতা। কবি মাটির বুকে সামান্য ফুল হয়ে জন্মাতে চান। তাঁর আশা তাহলে হয়তো ভগবানের গলার মালা হয়ে দুলতে পারবেন। কিংবা তা যদি নাই বা হয়, তবে ভগবানের পূজাবেদীর তলায় শুকিয়ে মৃত্যু বরণ করবেন—এই মৃত্যুও বুঝি তাঁর কাছে অতুলনীয়।

প্রঃ ৩৩। পূজারিণী ॥

উঃ। বঙ্গমাতার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য কবিতাটিতে। কবি সমগ্র বিশ্বে বঙ্গমাতার মাধুর্য ও লাবণ্য ছড়িয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। সমগ্র পৃথিবী যেন পূজারিণী বেশ ধারণ করে মাকে প্রণতি জানাচ্ছে!

প্রঃ ৩৪। শেষ প্রার্থনা ॥

উঃ। মৃত্যুর মুহূর্তে কবির প্রার্থনা এই জন্মের মত আগামী জন্মেও যেন তিনি তাঁর 'জীবন স্বামীকে' ভালবাসতে পারেন। এ জীবনে দ্বন্দ্ব-বিরোধ তাঁকে কাঁদিয়েছে। নিজের সুখকে বড় করে দেখতে গিয়ে সারা জীবন ধরে দুঃখ পেয়েছেন তিনি। তাই চোখের জলে ভেসে কবির প্রার্থনা, 'মোর মরণজয়ের বরণমালা পরাই তোমার কেশে।'

**প্রঃ ৩৫। 'তোমাদের চাহে আজি নিখিল জনসমাজ
আলো জ্ঞান-দীপ এই তিমিরের মাঝ'—**

—পংক্তি দুটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত? এখানে কবি কাদের কথা বলেছেন?

উঃ। পংক্তি দুটি 'ছাত্রসংগীত' কবিতার অন্তর্গত। এখানে কবি ছাত্রদের কথা বলেছেন।

প্রঃ ৩৬। 'ছাত্রসংগীত' কবিতাটির মূল বক্তব্য কি?

উঃ। কবি ছাত্রদের উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করছেন—তিনি তাদের ঝর্ণার মত প্রাণচঞ্চল ভঙ্গিতে, সূর্যের মত উন্নত শিরে ভেদ বিভেদের গণ্ডি ভেঙে, সংকীর্ণতা ভুলে অগ্রসর হতে বলছেন।

**প্রঃ ৩৭। 'তোমাতে জাগেন যে মহামানব
তাহারে জাগায়ে তোল।'**

—কোন্ কবিতার অন্তর্গত পংক্তিটি? এখানে কার কথা বলা হয়েছে? কবি পংক্তিটির মধ্য দিয়ে কি বলতে চেয়েছেন?

উঃ। 'মায়ামুকুর' কবিতার অন্তর্গত এখানে ছোট ছোট শিশুর কথা বলা হয়েছে।

কবি এখানে বলতে চান, প্রতিটি শিশুর মধ্যে ভগবানের অসীম শক্তি বিরাজ করছে, কিন্তু এই শক্তিকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে, সুপ্ত মহত্ত্বকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

প্রঃ ৩৮। নীচের পংক্তিগুলি কোন্ কবিতার অংশবিশেষ? কি প্রসঙ্গে এগুলি লিখিত হয়েছে? পংক্তিগুলির মূল অর্থ বুঝিয়ে দাও।

এক) ধর্ম বর্ণ জাতির ঊর্ধ্বে জাগোরে নবীন প্রাণ। (পৃঃ ১)

দুই) পরাজয় তার জয়ের স্বর্গ-সিঁড়ি,
আশার আলোক দেখে তত, যত আসে দুর্দিন ঘিরি'। (পৃঃ ১১)

তিন) এরা জড়, এরা ব্যাধিগ্রস্ত, মিশো না এদের সাথে
মৃত্যুর উচ্ছিষ্ট আবর্জনা এরা দুনিয়াতে। (পৃঃ ১১)

চার) বলতে পারিস্ বিশ্ব-পিতা ভগবানের কোন্ সে জাত?
তোরা ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মার মুখে দিস্ ধূপের ধোঁয়া (পৃঃ ১৪)

পাঁচ) সাড়া দেন তিনি এখানে তাঁহারে যে-নামে যে-কেহ ডাকে,
যেমন ডাকিয়া সাড়া পায় শিশু যে-নামে ডাকে সে মাকে। (পৃঃ ২২)

ছয়) ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?—প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন।
আসছে নবীন—জীবন হারা অসুন্দরে করতে ছেদন। (পৃঃ ২৯)

সাত) ওরে ও পাগলা ভোলা
দেরে দে প্রলয় দোলা
গারদগুলা
জোরসে ধ'রে হেঁচকা টানে। (পৃঃ ৪৫)

আট) মৃত্যুর হাতে মরে ত সবাই
সেই শুধু বেঁচে থাকে,
মানুষের লাগি যে চির-বিরাগী
মানুষ মেরেছে যাকে। (পৃঃ ৪৬)

নয়) ম্যালেরিয়ায় ভুগব না মা, মরব না তোর কোলে,
ডাকতে তোরে দেব না মা চাকরের মা বলে। (পৃঃ ৫২)

দশ) যে জাত-ধর্ম ঠুন্‌কো এত
আজ নয় কাল ভাঙবে সে ত!
যাক্ না সে জাত জাহান্নমে, রইবে মানুষ, নাই পরোয়া।

উঃ। এক) **ছাত্র সঙ্গীত** কবিতার অন্তর্গত।

প্রসঙ্গ ঃ সমস্ত রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ছাত্রদলকে অগ্রসর হতে হবে।

মূল অর্থ ঃ ছাত্রদলকে সমস্ত রকম সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে হবে। তাদের অগ্রগতিতে ধর্মের বিভিন্নতা, বর্ণের ভেদাভেদ, জাতির অনৈক্য কিছুই বাধা সৃষ্টি করবে না—এমনি মানসিকতা সম্পন্ন নবীন প্রাণকেই কবি আহ্বান করেছেন।

দুই) পংক্তিগুলি নজরুলের **'বিশ্বাস ও আশা'** কবিতার অন্তর্গত।

প্রসঙ্গ ঃ বিশ্বাস ও আশাই যে আমাদের জয়ের মূল মন্ত্র, সেই প্রসঙ্গে এই পংক্তিগুলি লিখিত হয়েছে।

মূল অর্থ ঃ জীবন যুদ্ধে যদি পরাজয় নেমে আসে, দুর্দিনে যদি জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে পড়ে, তবু ভেঙে পড়া চলবে না। পক্ষান্তরে ঐ পরাজয়ই তাকে জয়ের স্বর্গতোরণের দিকে নিয়ে যাবে।

তিন) **'বিশ্বাস ও আশা' কবিতার অন্তর্গত।**

প্রসঙ্গ ঃ যে সমস্ত মানুষের মন থেকে বিশ্বাস ও আশা নির্মূল হয়ে গেছে, তাদের কথা বলা হয়েছে।

মূল অর্থ ঃ এই শ্রেণীর মানুষ অসুস্থ, এদের মধ্যে প্রাণের অভাব রয়েছে, এদের সঙ্গে কোন প্রকার যোগাযোগ রাখা উচিত নয়। এরা এতই ঘৃণ্য যে মৃত্যু পর্যন্ত এদের স্পর্শ করে না। আমরা যেমন খাবার পর উচ্ছিষ্ট বস্তু আবর্জনার মতো ফেলে দিই, কবির মতে, মৃত্যু এই শ্রেণীর মানুষকে উচ্ছিষ্ট আবর্জনার ন্যায় ত্যাগ করেছে।

চার) **'জাতের বজ্জাতি' কবিতার অন্তর্গত।**

প্রসঙ্গ ঃ এক শ্রেণীর স্বার্থসর্বস্ব মানুষ জাতের দোহাই দিয়ে ঈশ্বরকে তাদের নিজস্ব করে রেখেছে।

মূল অর্থ ঃ কবির বক্তব্য, ভগবানের কাছে উচ্চনীচ জাতিভেদ নেই। ভগবান বিশ্বের পিতা, তাঁর থেকেই প্রতিটি মানুষের উৎপত্তি। তিনি কখনো কি তাঁর কোন ছেলেকে ঘৃণা করতে পারেন? অথচ এক শ্রেণীর 'ধর্ম-জোচ্চোর' জাতি ও বর্ণ-ভেদের ধুয়া তুলে ওদের সমাজে অবহেলিত করে রেখেছে। এরা কিন্তু নির্লজ্জের মতো ঈশ্বরকে ধুপধুনো দিয়ে পুজো করছে। কবি এই শ্রেণীর মানুষকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন।

পাঁচ) **'সাম্য' কবিতার অন্তর্গত।**

প্রসঙ্গ ঃ যে জগৎ সর্বপ্রকার ভেদাভেদ থেকে মুক্ত, কবি তার জয়গান করছেন।

মূল অর্থ ঃ কবি সাম্যবাদের মন্ত্র ঘোষণা করছেন। তিনি এমন এক সমাজ ব্যবস্থার জয়গান করছেন, যেখানে ধর্ম বা শাস্ত্রের কোন বিধিনিষেধ নেই। শিশু যেমন প্রাণের খুশিতে তার মাকে যে নামেই ডাকুক, ঠিকই মায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করে, ঠিক তেমনি এখানে ভক্ত তাঁকে যে নাম ধরেই ডাকুক, ঈশ্বরও সেই নামের আকর্ষণে তাঁর স্নেহধারায় তাকে অভিষিক্ত করেন।

ছয়) **'প্রলয়োল্লাস' কবিতার অন্তর্গত।**

প্রসঙ্গ ঃ প্রলয় বা ধ্বংসের মধ্যেই নতুন সৃষ্টির বীজ রয়েছে।

মূল অর্থ ঃ কবি আমাদের অভয় দিচ্ছেন প্রলয় দেখে, ধ্বংসের তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করে ভীত হওয়ার কিছু নেই। যে সমস্ত ঘৃণ্যতা আর কলুষতায় পৃথিবী অসুন্দর হয়ে উঠেছে, আজ নতুন এসে তাদের ছিন্নভিন্ন করে দেবে। ঐ নতুনের মধ্যেই রয়েছে সৃষ্টির মহান বীজ।

সাত) **'ভাঙার গান' কবিতার অন্তর্গত।**

প্রসঙ্গ ঃ পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করবার জন্য কবির প্রবল বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়েছে।

মূল অর্থ ঃ কবি আমাদের আহ্বান করছেন, আমরা যেন প্রচণ্ড শক্তি ও বিক্রম নিয়ে সমস্ত রকম বন্দীদশা ভেঙে ফেলে মূল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাই। নটরাজের প্রলয় নৃত্যের তালে তালে সুর মিশিয়ে আমরা যেন কারাগারের গরাদগুলোকে ভেঙে উপড়ে ফেলি।

আট) **'হবে জয়'** কবিতার অন্তর্গত।

প্রসঙ্গ ঃ যত রকম বাধা-বিপত্তি আসুক, ভেঙে না পড়ে, অসুন্দরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

মূল অর্থ ঃ মৃত্যু জীবনে অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর পর সাধারণ মানুষের নাম পৃথিবী থেকে ধুয়ে মুছে যায়। কিন্তু মৃত্যু কোথায় পরাজিত? যে ভয়হীন প্রাণ মানুষের কল্যাণের জন্য জীবনের সব কিছু তুচ্ছ করে মৃত্যুবরণ করে গিয়েছে, তাকে মৃত্যু হরণ করতে পারে না। কারণ মানুষ তাকে হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরকাল স্থান দিয়েছে।

নয়) **'কিশোর স্বপ্ন'** কবিতার অন্তর্গত।

প্রসঙ্গ ঃ কিশোর বন্ধ ঘরের আবহাওয়া থেকে মুক্তি চাইছে।

মূল অর্থ ঃ নজরুলের কিশোর গণ্ডিবদ্ধ জীবনে হাঁফিয়ে উঠেছে ঃ ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে তার প্রাণ যেন থেকেও নেই। আজ সে নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বের দেশে দেশে বেরিয়ে পড়তে চায়। তার মায়ের—পরাধীন শৃঙ্খলাবদ্ধ মায়ের ব্যথা বেদনা আজ তাকে স্পর্শ করেছে, তাকে প্রদীপ্ত করেছে। কিশোরের গভীর ও দৃঢ় সংকল্প সে ভৃত্যত্বের অপমান থেকে মাকে উদ্ধার করবে।

দশ) **'জাতের বজ্জাতি'** কবিতার অন্তর্গত।

প্রসঙ্গ ঃ প্রকৃত ধর্ম যে ছোঁয়াছুঁয়ির অনেক উর্ধ্বে কবি এখানে তাই দেখাতে চেয়েছেন।

মূল অর্থ ঃ কবির মতে, স্পর্শ করলে সত্যি যদি কোন মানুষের জাত যায়, তাহলে সে 'জাত' কেমন? ধর্মের বর্ণ কি এতই ঠুনকো বা ভঙ্গুর যে ছোঁওয়া-ছুঁয়ির একটা ছোট্ট ঢিল তাকে চুরমার করে দেবে? প্রকৃতপক্ষে এমন ধর্ম বেশিদিন তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না—কিছুদিনের মধ্যেই ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় তার অস্তিত্ব। কবির প্রবল ঘোষণা এমন জাত থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল; কারণ মানুষ আছেই, থাকবেও চিরকাল। ঐ চিরকালীন মানুষকে সামান্য স্পর্শের দোহাই দিয়ে কেউ নষ্ট করতে পারবে না।

॥ গাথা মঞ্জরী ॥

প্রশ্ন ১। 'গাথা মঞ্জরী' কাব্য গ্রন্থটির রচয়িতা কে ?

উত্তর। কবিশেখর কালিদাস রায়।

প্রঃ ২। 'গাথা মঞ্জরী' কি জাতীয় গ্রন্থ ?

উঃ এটি কাব্যগ্রন্থ। কবির বিভিন্ন কবিতা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

প্রঃ ৩। বিভিন্ন গাথার উপাদানগুলি কবি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন ?

উঃ। ভাগবত, মহাভারত, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, তামিল ইত্যাদি সাহিত্য এবং আরবীয় ইত্যাদি উপাখ্যান থেকে উপাদান সংগ্রহ করে এই গাথাগুলি রচিত।

প্রঃ ৪। 'গাথা মঞ্জরীর' কবিতাগুলির মূল বক্তব্য কি ?

উঃ। কবির ভাষায় 'এই গাথাগুলিতে মানবচরিত্রের মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্যের এক-একটি আদর্শকে রূপদান করিবার চেষ্টা করিয়াছি।'

[** প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'গাথা মঞ্জরী'র প্রতিটি কবিতাই কাহিনীমূলক এবং প্রতিটি কবিতার মধ্য দিয়েই কবি কিছু নীতি-উপদেশ দান করেছেন।]

প্রঃ ৫। নিম্নলিখিত কবিতাগুলির মূল বক্তব্য সংক্ষেপে কয়েকটি বাক্যে বল।

লালাবাবুর দীক্ষা ॥

উঃ। হৃদয়ে যতক্ষণ কণামাত্রও গর্ব, অভিমান কিংবা দম্ভ থাকে, ততক্ষণ প্রকৃত দীক্ষা অর্জন করা যায় না। লালাবাবু যতক্ষণ পর্যন্ত গর্বের শেষটুকু না বিসর্জন দিয়েছেন, ততক্ষণ তাঁর গুরুদেব তাঁকে দীক্ষা দেন নি।

প্রঃ ৬। আমার প্রাপ্য ॥

উঃ। ভাড়া-করা বস্তুতে আমাদের ক্ষমতা প্রকাশ পায় না। যা আমাদের নিজস্ব, অন্তর থেকে উৎসারিত, তাকেই সম্মান করা উচিত। যার কবিত্বশক্তি আছে, বিধাতার করুণালাভে সে ধন্য হয়েছে। সেই কবির বেশবাস তালিমারা কিংবা ছিন্ন বলে যদি তাকে অপমান করা হয় তবে সে লজ্জা অপমানকর্তারই।

প্রঃ ৭। তীর্থফল

উঃ। প্রতিটি জীবের মধ্যেই শিব বা ঈশ্বর আছেন। তাই জীবসেবাই শিবের সেবা।

প্রঃ ৮। হাতেম তাই।

উঃ। পরিশ্রম জীবনের সব চেয়ে বড় সম্পদ। যতক্ষণ দেহে শক্তি আছে পরিশ্রম করতে হবে। তা না করে অন্যের দরজায় হাত পাতা তো ভিক্ষাবৃত্তি।

প্রঃ ৯। জাফর ও বান্দা ॥

উঃ। ক্ষুধিত জীবকে যে নিজের মুখের ক্ষুধার খাদ্য পর্যন্ত ধরে দিতে পারে সেই তো প্রকৃত দাতা।

প্রঃ ১০। কৃষ্ণার প্রতিহিংসা ॥

উঃ। হিংসার নিবৃত্তি প্রতিহিংসা নয়। প্রতিহিংসা ঘৃতাহুতির মতো, তাতে হিংসা বুঝি আরো বেড়ে ওঠে। দ্রৌপদী শেষ পর্যন্ত বুঝলেন ঃ

প্রতিহিংসা ঘৃতাহুতি—সে ত শুধু ক্ষতের অনলে,
সে অনল নিভে শুধু বিগলিত হৃদয়োৎস জলে।

প্রঃ ১১। ক্রীতদাস ॥

উঃ। অপরের ব্যথা-বেদনা বুঝতে গেলে, সেই ব্যথা-বেদনার অংশীদার হতে হয়, না হলে প্রকৃত যন্ত্রণা উপলব্ধি করা যায় না। পণ্ডিত লোকমান বোগদাদের পথে ভ্রমণ করতে করতে ভাগ্যচক্রে ক্রীতদাস রূপে ধরা পড়েন। ঐ জীবনযাপন করে তবেই ক্রীতদাসত্বের প্রকৃত জ্বালা যন্ত্রণা উপলব্ধি করেন।

প্রঃ ১২। লোভ জয় ॥

উঃ। যে দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমরা অপরকে উপদেশ দিই, সেই দোষ যদি নিজের থাকে, তবে প্রার্থিত ফললাভ হয় না। 'আপনি আচরি' ধর্ম', অপরে শিখাও।'

প্রঃ ১৩। মুড়াগাছ ॥

উঃ। পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তুরই প্রয়োজন আছে। বস্তু তা সে যত সামান্যই হোক, তাকে ঘৃণা বা অবহেলা করা উচিত নয়।

প্রঃ ১৪। উজীর ও বাদশাহ ॥

উঃ। অকস্মাৎ সম্পদ কিংবা সম্মান লাভ করে যে অতীতের দীনতার কথা ভুলে যায় সে নরাধম। জীবনে যে অবস্থাই আসুক গর্ব থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হবে।

প্রঃ ১৫। বাবরের মহত্ত্ব ॥

উঃ। ভারতের সম্রাট বাবর নিজের প্রাণ বিপন্ন করে একটি মেথরের ছেলেকে হাতীর পায়ের তলা থেকে বাঁচিয়েছিলেন। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে প্রতিহিংসাপরায়ণ এক রাজপুতের হৃদয়ের পরিবর্তন হল।

প্রঃ ১৬। অর্জুন মিশ্র ॥

উঃ। প্রকৃত ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে বহু বর্ষের তপস্যায় হয় না, হতে পারে মনে যদি থাকে সহজ সরল প্রেম ভক্তি। ভগবান তপস্যা কিংবা জ্ঞানের জন্য গর্ব চান না। তিনি আশা করেন তাঁর ভক্তের মন হবে শিশুর মত অকপট।

প্রঃ ১৭। বিরতু ॥

উঃ। প্রকৃত বৈষ্ণব যিনি, তিনি সর্বপ্রকার গর্বের ঊর্ধ্বে। বৈষ্ণবকে তরুর চেয়ে সহিষ্ণু, তৃণের চেয়ে দীন হতে হবে। তার কাছে জয়গৌরব বা যশ কিছুই নয়। কিন্তু এই বৈষ্ণবকে দীনতার অভিমানও ত্যাগ করতে হবে, ক্ষমাও যে বৈষ্ণবের ভূষণ।

প্রঃ ১৮। অম্বপালী ॥

উঃ। জাতি, কুল বা ব্যবসা কিছুই দিব্যধনের অধিকার লাভের অন্তরায় নয়।

প্রঃ ১৯। কুরুক্ষেত্র ॥

উঃ। জীবন যাপনের জন্য কোন কাজই হীন নয়; জীবিকার উচ্চনীচ ভেদও নেই। তবে আলস্য সর্বদাই পাপ। সঞ্চিত ধনের প্রাচুর্য থাকলেও অলস হতে নেই। আর কর্তা যে কাজ তার অনুচর দিয়ে করাতে চাইছেন, সেই কাজকে তার ঘৃণা করা চলবে না। কর্তা কাজ না করলে, অধীনেরাও সেই কাজ যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে করবে না।

প্রঃ ২০। 'এত বড় মান মর্যাদা আমি জীবনে পাইনি কভু'—উক্তিটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত? উক্তিটি কার? তিনি কি মর্যাদা পেয়েছিলেন?

উঃ। উক্তিটি 'কবির সম্মান' কবিতার অন্তর্গত।

উক্তিটি শিবাজীর সভাকবি ভূষণের। কবি ভূষণ বুন্দেলখণ্ডের নৃপতি ছত্রশালের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সম্মান লাভ করেছিলেন। রাজা তাঁকে যথোচিত আতিথ্য দিলেন। তারপর বিদায় মুহূর্তে কবির চতুর্দোলায় বাহকদের সঙ্গে নিজে কাঁধ মিলিয়ে কবিকে রাজপুরীর বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন। এ জাতীয় সম্মান কোন কবি বোধ হয় পূর্বে আর পান নি।

প্রঃ ২১। শুধু হাত দিয়ে সেবা নয় সেবা, নাহি সেবে যদি প্রাণ,
শ্রদ্ধার সহ না দিলে ব্যর্থ রাজভোগ্যেরও দান।

আলোচ্য পংক্তি দুটি কোন কবিতার অন্তর্গত? উক্তিটি কে কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন? কি প্রসঙ্গে এই উক্তি করা হয়েছে?

উঃ। পংক্তি দুটি 'বাল্মীকি মুচি' কবিতার অন্তর্গত।
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে এই উক্তি করেছেন।

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে যখন কিছুতেই শঙ্খঘণ্টা বাজছিল না তখন অসহায় যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ জানালেন, কোন যথার্থ বৈষ্ণব ঐ যজ্ঞে আসেন নি বলে, তাঁর যজ্ঞ নিষ্ফল। তখন কৃষ্ণেরই কথায় গ্রামের প্রান্ত হতে বাল্মীকি নামক মুচিকে এনে রাজসমাদর দেওয়া হল। কিন্তু তবুও শাঁখঘণ্টা শোনা গেল না। তখন বিরক্ত যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ জানালেন, দ্রৌপদী অতিথি আসনে মুচিকে দেখে মনে মনে অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিলেন এই পাপেই যজ্ঞ বিফল হতে বসেছে—শঙ্খঘণ্টা বাজছে না। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন, প্রাণ দিয়ে সেবা না করলে, শ্রদ্ধা সহকারে দান না করলে সবই ব্যর্থ হয়ে যায়।

প্রঃ ২২। পরের বেদনা সেই বুঝে শুধু যে জন ভুক্তভোগী
রোগ যন্ত্রণা সে কভু বুঝে না হয় নি যে কভু রোগী।

—উক্তিটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত? কে বলেছেন? পংক্তি দুটির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিয়ে দাও।

উঃ। 'ক্রীতদাস' কবিতার অন্তর্গত।

বোগদাদের পথে ভ্রমণরত লোকমান পণ্ডিত ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার পর এই কথা বলেছেন।

কোন জিনিসকে প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে হলে, ভুক্তভোগী হতে হবে। অর্থাৎ শুধু মাত্র কথা শুনে বা দেখে কোন কিছুই বোঝা যায় না। রোগী ব্যতীত

অপরে যেমন যথাযথভাবে তার রোগযন্ত্রণা বোঝে না ঠিক তেমনি পরের ব্যথা বেদনা, দুঃখ যন্ত্রণা বুঝতে গেলে ঠিক সেই জাতীয় ব্যথা নিজেকে পেতে হবে।

প্রঃ ২৩। **'উপায় তো আছে জানা**
রান্না ঘরের কোণা হতে মোরে দাও তো কুড়ালখানা।

—পংক্তিটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত? কে কাকে উদ্দেশ্য করে কবিতার এই উক্তিটি করেছেন? কি প্রসঙ্গে এই উক্তি? বক্তা কেন 'কুড়াল' চাইলেন?

উঃ পংক্তিটি 'সাধু একনাথ' কবিতার অন্তর্গত।

সাধু একনাথ তাঁহার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে এই উক্তি করেছেন।

প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ঘর থেকে কেউ বেরোতে পারছে না। ঘরে শুকনো জ্বালানি কাঠও নেই, তাই ঘরে ঘরে অরন্ধন। সাধু একনাথও চানা চিবিয়ে রাত্রে শুয়ে আছেন। এমন সময় ঘরে অতিথি এল। অতিথিকে সেবা করার সুযোগ পেয়ে সাধু একনাথ খুবই খুশী—তিনি তাদের নিজের পরণের বস্ত্র দিলেন—নিজে পরলেন গামছা। জিজ্ঞেস করে জানলেন তারা তিনদিন উপবাসী। এদিকে গৃহিণী লজ্জিত হয়ে জানালেন জ্বালানি কাঠ নেই, রান্না হবে কি করে? তখন স্ত্রীর কাছ থেকে কুড়ুল চেয়ে সাধু একনাথ নিজের শয়ন ঘরের খাটটি কাটতে লাগলেন। ঐ খাটের কাঠ কুড়ুল দিয়ে চিরে সেই কাঠে অতিথিদের জন্য রান্না শুরু হলো।

প্রঃ ২৪। **'নাহি ভয়, নাহি ভয়**
জীবহিতে প্রাণ যেবা করে দান জীবনে তাহারি জয়।'

—উক্তিটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত? উক্তিটি কার? কি উদ্দেশ্যে বক্তা এই উক্তি করেছেন?

উঃ। 'অম্বরীষের যজ্ঞ' কবিতার অন্তর্গত।

শুনঃশেফের পিতা ঋষি ঋচীক এই উক্তি করেছেন।

ঋষি পিতা হিসেবে আজ নিজেকে ধন্য মনে করছেন। কারণ তাঁর পুত্র লক্ষ লক্ষ জীবের প্রাণরক্ষার্থে স্বেচ্ছায় নিজের জীবন বিসর্জন দিতে রাজী হয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে এ জাতীয় মৃত্যুতে ভয় নেই। জীবের কল্যাণের জন্য যে প্রাণ দিতে পারে চিরকাল তার নাম পৃথিবীতে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকে।

প্রঃ ২৫। 'শুন, যথার্থ রাজধর্মের বিধি'—কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে? বক্তা রাজধর্মের কি বিধি শোনালেন?

উঃ। 'দানের পাপ' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

কুরুরাজ সহস্রানীকের মতে রাজা প্রজাদের প্রতিনিধি। তিনি ন্যায়রক্ষক, প্রজাদের ধন গচ্ছিত রেখেছেন মাত্র; সেই ধনে তাঁর অধিকার নেই, সেই ধন তিনি দান করতে পারেন না। আপনার শ্রমে অর্জিত ধনই রাজা দান করতে পারেন।

॥ পাঠ-সংকলন ॥

গদ্যাংশ

** পাঠ-সংকলন গ্রন্থের দশটি রচনা (গদ্যাংশ) মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্য-ক্রমের অন্তর্গত। প্রতিটি রচনার লেখকের নাম এবং রচনাটি লেখকের কোন মূল গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে তা' ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করে রাখতে হবে। রচনাটির মূল বক্তব্য এবং বিশেষত্ব কোথায় তাও জেনে রাখা দরকার।

প্রঃ ১। পাঠ-সংকলন থেকে তোমার পাঠ্য রচনাগুলির নাম, তাদের রচয়িতার নাম এবং কোন্ মূল গ্রন্থ থেকে রচনাগুলি উদ্ধৃত হয়েছে, বল।

উত্তর।

রচনার নাম	**লেখকের নাম**	**মূল গ্রন্থের নাম**
হিমালয় ভ্রমণ	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	আত্মজীবনী
সমুদ্রপথে	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	বেনের মেয়ে
সাগরসঙ্গমে নবকুমার	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কপালকুণ্ডলা
ভানুসিংহের পত্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভানুসিংহের পত্রাবলী
আশ্রমের রূপ ও বিকাশ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	আশ্রমের রূপ ও বিকাশ
বাপ্পাদিত্য	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রাজকাহিনী
মেজদা	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীকান্ত (১ম)
লুই পাস্তুর	চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য	বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী
ভারতবর্ষ	এস. ওয়াজেদ আলী	মাশুকের দরবার
অচেনার আনন্দ	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	পথের পাঁচালী

প্রঃ ২। 'পর্বতো বহ্নিমান'।—কে, কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলেছিলেন? কথাটির অর্থ কি?

উঃ। 'হিমালয় ভ্রমণ' নিবন্ধের লেখক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দাবানল প্রসঙ্গে এই কথা বলেছিলেন।

মূল বাক্যটি হল 'ধূমাৎ পর্বতো বহ্নিমান' অর্থাৎ পর্বত যে অগ্নিপূর্ণ ধূম হতে তা বোঝা যায়।

প্রঃ ৩। 'সভনা জীয়াকা তুম্ দাতা, সো মৈ' বিসর না জাই'—পংক্তিটির অর্থ কি? ইহা কোন্ গ্রন্থ হতে গৃহীত হয়েছে?

উঃ। লেখক স্বয়ং এই পংক্তিটির অর্থ করে দিয়েছেন—'সকল জীবের তুমি দাতা, তাহা যেন আমি বিস্মৃত না হই।'

শিখদের ধর্মগ্রন্থ জপ্‌জী সাহিব ৫, ৬, ৭ হতে পংক্তিটি গৃহীত হয়েছে।

প্রঃ ৪। 'হিমালয় ভ্রমণ' রচনায় লেখক একজন কবির একটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করেছেন।'—কবিটি কে? তাঁর উদ্ধৃত কবিতাংশটির অর্থ কি?

উঃ। কবির নাম হাফেজ ; ইনি পারস্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম।

লেখক স্বয়ং হাফেজের কবিতার বঙ্গানুবাদ করেছেন—'তোমার করুণা আমার মন প্রাণ হইতে কখনোই যাইবে না। তোমার করুণা আমার মন প্রাণে এমনি বিদ্ধ হইয়া আছে যে, যদি আমার মস্তক যায়, তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না।'

প্রঃ ৫। 'পথে এক পাল অজা অবি চলিয়া যাইতেছিল'—বাক্য কোন্ রচনার অন্তর্গত ? নিম্নরেখ শব্দটির অর্থ কি ? ওদের দ্বারা লেখক কি উপকার পেয়েছিলেন ?

উঃ। পংক্তিটি পাঠ-সংকলনের 'হিমালয় ভ্রমণ' নামক রচনার অন্তর্গত।

অজা অবি শব্দটির অর্থ ছাগল ও ভেড়া।

উক্ত অজার কাছ থেকে মহর্ষি এক পোয়া দুধ পেয়েছিলেন।

প্রঃ ৬। 'আমি আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে দারুণ ঘাটে উপস্থিত হইয়া... তুষার বর্ষণ দর্শন করিলাম'।—উদ্ধৃত অংশটি তোমার মনে কোনো কবির কোনো কাব্যের কথা স্মরণ করায় কি ? মূল অংশটি কি ?

উঃ। উদ্ধৃত অংশটি আমার মনে মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়।

কাব্যটি শুরু হয়েছে এইভাবে—'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট স্বানুং···'

প্রঃ ৭। ''কেহ বলিল, 'জয় সাতগাঁয়ের কালী'—কাহারা কখন এরূপ ধ্বনি দিয়েছিল ? সাতগাঁ কোথায় অবস্থিত ?

উঃ বিহারী দত্তের নৌ-বহরের মাঝি মাল্লারা এরূপ ধ্বনি দিয়েছিল।

বিহারী দত্তের ঊনপঞ্চাশখানা ডিঙা মেরামতাদি হয়ে গেলে তিনি আবার বাঙলার দিকে ডিঙা ভাসাইলেন। তখন মাঝি মল্লারা আনন্দে এরূপ ধ্বনি দিয়েছিল।

সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম হুগলী জেলায় অবস্থিত। প্রাচীন কালে সাতগাঁ ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল।

প্রঃ ৮। 'যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল।' —কোন্ কালে এরূপ প্রথা ছিল ? এ প্রথা থাকবার কারণ কি ?

উঃ। 'কপালকুণ্ডলা' নামক উপন্যাসের প্রথমেই লেখক বলেছেন, তিনি প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার কাহিনী বর্ণনা করতে যাচ্ছেন। ঐ উপন্যাস ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—সুতরাং সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভকালীন সময়ের কথা এখানে বলা হয়েছে।

ঐ সময়ে বঙ্গোপসাগরের নানাস্থানে পর্তুগীজ জলদস্যুরা বিভিন্ন বাণিজ্যতরী এবং নৌকাযাত্রীদের ওপর নানারকম অত্যাচার করত। তাদের ভয়ে মালবাহী কিংবা যাত্রীবাহী সমস্ত নৌকাই দলবদ্ধ হয়ে যাতায়াত করত।

প্রঃ ৯। 'এমত সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচ পীরের নাম কীর্তিত

করিয়া মহাকোলাহল করিয়া উঠিল।'—এখানে কোন্ সময়ের ইংগিত করা হয়েছে? দরিয়ার পাঁচ-পীরের নামোল্লেখ কর।

উঃ। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে যখন গঙ্গাসাগর-প্রত্যাগত নৌকার যাত্রিগণ ক্রন্দন করছিল, এমন সময়ে দূরে ডাঙার চিহ্ন দেখে নৌকার মুসলমান মাঝিরা উল্লাসে সমুদ্রের পাঁচ-পীরের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠেছিল। ওই সময়ের কথা এখানে বলা হয়েছে।

দরিয়ার অর্থাৎ সমুদ্রের পাঁচপীরের নাম—গিয়াসুদ্দীন, সামসুদ্দীন, সিকেন্দর, গাজী ও কালু।

প্রঃ ১০। 'ন যযৌ ন তস্থৌ'—কোন্ কবির কোন্ কাব্য হতে বাক্যাংশটি গৃহীত হয়েছে? বাক্যাংশটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

উঃ। 'ন যযৌ ন তস্থৌ' কথাটি কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্' নাটকের তৃতীয় সর্গের একটি পংক্তির অংশবিশেষ।

বাক্যাংশটির অর্থ 'নিশ্চল অবস্থাবিশেষ'। নিন্দুক একটি ব্রাহ্মণ যখন শিবনিন্দায় মুখর, তখন বিরক্তিবোধ করে উমা চলে যাওয়ার জন্য পা তুলেছিলেন—কিন্তু সেই পা আর ফেলা হয় নি, কারণ ঐ নিন্দুক ব্রাহ্মণটি ছিলেন স্বয়ং শিব। উমার হৃদয় জানবার জন্যই ছিল তাঁর এই ছদ্মবেশ ধারণ এবং তাঁর হৃদয়ের ভালবাসা জানবার পর তিনি যখন স্বমূর্তি ধারণ করলেন তখন উমার নিশ্চল অবস্থা, তিনি এগোতেও পারছেন না, পেছোতেও পারছেন না।

প্রঃ ১১। 'বৃহস্পতিবারের বারবেলা' বাক্যাংশটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করবার কারণ কি? অন্য কোন দিনের বারবেলা কি অশুভ?

উঃ। বৃহস্পতিবারের বারবেলায় যাত্রা অশুভ বলে আমাদের বহুকালীন সংস্কার আছে। কিন্তু লেখক, যাত্রার প্রথমেই বাধাপ্রাপ্ত হয়েও উক্ত সংস্কারকে গ্রাহ্য না করে শিলং যাত্রার উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়েছিলেন।

হিন্দুশাস্ত্রে শনিবারের বারবেলাও অশুভ বলে চিহ্নিত।

প্রঃ ১২। আমাদের পাঁচজনকে পুরলে পঞ্চত্ব সুনিশ্চিত'—এই পাঁচজন কে কে? নিম্নরেখ শব্দটির সাহায্যে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন?

উঃ। ডাকবাংলায় যে পাঁচজন গিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, রবীন্দ্র-পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর,—তাঁর স্ত্রী প্রতিমা দেবী এবং দিনেন্দ্রনাথ ও তাঁর পত্নী কমলা দেবী।

'পঞ্চত্ব' বলতে মৃত্যুকে বোঝানো হয়েছে। এই 'পঞ্চ' বস্তুতঃ পক্ষে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম।

[ছাত্র-ছাত্রীরা আরও মনে রাখবে: 'ভানুসিংহের পত্র' রচনাটি "ভানুসিংহের পত্রাবলী" নামক গ্রন্থ হতে সংকলিত হয়েছে। ভানুসিংহ হলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, আর যার উদ্দেশ্যে এই পত্র সেই রাণু অধিকারী এখন লেডি রাণু মুখার্জী—স্যার বীরেন মুখার্জীর স্ত্রী।]

প্রঃ ১৩। 'তখন আশ্রমের পরিধি ছিল ছোটো।'—এখানে কোন্ আশ্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? আশ্রমের পরিধি কি ভাবে বড়ো হয়?

উঃ। এই আশ্রমটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বোলপুরের নিকটে ২০ বিঘা জমির উপর শান্তিনিকেতন নামে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি গ'ড়ে তোলার সাথে সাথে আশ্রমটির পরিধি বেড়ে যায়।

প্রঃ ১৪। 'আমি তাঁকে আহ্বান করিনি আমার কাজে।'—বক্তা কে? তিনি কাকে আহ্বান করেন নি? তাঁর কোন্ কাজের কথা বলা হয়েছে?

উঃ। বক্তা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তিনি সতীশচন্দ্র রায়কে আহ্বান করেন নি।

এখানে আশ্রম বিদ্যালয় গঠনের কাজের কথা বলা হয়েছে।

প্রঃ ১৫। 'তিনি ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছাত্র।'—তিনি কে? ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কে ছিলেন?

উঃ। তিনি হলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এম. এ. পাশ ক'রে কোচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ হন। তিনি বহুকাল মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ছিলেন। তারপর তিনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হন। তাঁর আদর্শ চরিত্রের জন্য দেশবাসী তাঁকে 'আচার্য' ব'লে অভিহিত করে।

প্রঃ ১৬। **'শিক্ষকতা ছিল তাঁর স্বভাবসংগত।'।—শিক্ষকতা কার স্বভাবসংগত ছিল? বক্তা কে? 'স্বভাবসংগত' শব্দটির অর্থ কি?**

উঃ শিক্ষকতা মোহিতচন্দ্র সেনের স্বভাবসংগত ছিল।

বক্তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বভাবের সাথে সংগতিপূর্ণ অর্থাৎ নিজের প্রকৃতির পক্ষে অনুকূল।

প্রঃ ১৭। **'মহারাণীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল।'—মহারাণী কে? কেন তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল?**

উঃ। মহারানী হলেন মহারাজ নাগাদিত্যের মহিষী এবং বাপ্পাদিত্যের মা।

মহারানী যখন রাজপুরীতে একাকী বাপ্পাকে রক্ষা করার কথা ভাবছিলেন, তখন তাঁর সামনে এক ভীল সর্দার এসে উপস্থিত হলো। তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে জানালো যে, তার মেয়ের অপমানের প্রতিশোধ হিসেবে সে নাগাদিত্যকে হত্যা করেছে, এখন তাঁর ছেলেসহ মহারানীকে দাসীর মত বেঁধে নিয়ে যাবে। এই কথা শুনে মহারানীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

প্রঃ ১৮। **'সেই বীরনগরের ব্রাহ্মণী কমলাবতীর বাড়ির দরজায় ঘা দিলেন।'—কমলাবতী কে? এখানে কে কমলাবতীর দরজায় ঘা দিলেন? কেন ঘা দিলেন?**

কমলাবতী ছিলেন মহারাজ গোহের মাতা পুষ্পবতীর বাল্যসঙ্গিনী।

কমলাবতী স্বামীহারা পুষ্পবতীর পুত্র গোহকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করে তুলেছিলেন।

গোহের মৃত্যুরও বহুকাল পরে মহারাজ নাগাদিত্যের রাজমহিষী আবার কমলাবতীর গৃহের দরজায় ঘা দিয়েছিলেন।

পুষ্পবতীর মত স্বামীহারা অসহায় মহারানী তাঁর পুত্র বাপ্পার দায়িত্ব কমলাবতীর নাতির নাতি বৃদ্ধ রাজপুরোহিতের হাতে সমর্পণ করবার জন্য কমলাবতীর দরজায় ঘা দিয়েছিলেন।

প্রঃ ১৯। 'জন্মাবধি লেখাপড়া না শিখে এই ফল।'—কে কাকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছিলেন? কেন বলেছিলেন?

উঃ। মহারাজ বাপ্পাদিত্য তাঁর রানীকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছিলেন।

তিনি যদি লেখাপড়া জানতেন তবে কবচের মধ্যে রাজপুরোহিতের দেওয়া পরিচয় পত্র পড়তে পারতেন এবং ঐ রাজপুরোহিত, সোলাঙ্কি রাজনন্দিনী প্রভৃতি প্রিয়জনদের হারিয়ে ফেলতেন না।

প্রঃ ২০। '......পরদিন ইস্কুলে ক্লাসের মধ্যে যে সকল সম্মান সৌভাগ্য লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতাম......' কাদের কথা এখানে বলা হয়েছে? তারা কি প্রকার সম্মান সৌভাগ্য লাভ করত?

উঃ। এখানে শ্রীকান্ত, তার ছোড়দা ও যতীনদার কথা বলা হয়েছে।

আলোচ্য অংশে 'সম্মান,' 'সৌভাগ্য' ইত্যাদি শব্দগুলি লেখক বিদ্রূপের সুরে বিপরীত অর্থে ব্যবহার করেছেন। বস্তুতঃ পক্ষে মেজদার কঠোর তত্ত্বাবধানের মধ্যে ফাঁকি ছিল, নিয়মতন্ত্রের ছদ্মবেশ ছিল, ফলতঃ পড়াশুনা কিছুই হত না। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই পরের দিন স্কুলে তাদের ভাগ্যে স্কুলে প্রচলিত সর্বপ্রকার শাস্তি এবং লাঞ্ছনা জুটত।

প্রঃ ২১। 'তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল'—'দক্ষযজ্ঞ' শব্দটির অর্থ কি? এখানে কোন্ ঘটনাকে দক্ষযজ্ঞ বলা হয়েছে?

উঃ। 'দক্ষযজ্ঞ' শব্দটির অর্থ বিশৃঙ্খলা বা লণ্ডভণ্ড অবস্থা।

শ্রীকান্তদের পাঠকক্ষে অকস্মাৎ একটি 'হুম্' শব্দ শুনে শিক্ষার্থীদের সমবেত আর্তচীৎকার, মেজদার অবিশ্বাস্য ভীরুতা এবং স্নায়ু শিথিল হয়ে তার শেজ উল্টিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ঘটনাকেই লেখক দক্ষযজ্ঞ বলে বর্ণনা করেছেন।

প্রঃ ২২। 'এ যেন তিন বাপ-ব্যাটার কে কতখানি হাঁ করিতে পারে, তারই লড়াই চলিতেছে'—এই 'তিন বাপ-ব্যাটা' কারা? উক্তিটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

উঃ। এখানে 'তিন বাপ-ব্যাটা' বলতে শ্রীকান্তের পিসেমশাই এবং তাঁর দুই পুত্রকে বোঝানো হয়েছে।

উক্ত তিনজনই ছদ্মব্যাঘ্রের 'হুম' শব্দের গর্জনে ভীত ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

লেখক কৌতুকময় ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন যে ওরা এত ভয় পেয়েছে যে চীৎকার করছে! এই চিৎকারের বহিঃপ্রকাশ তাদের হাঁ করায়। পিতা-পুত্র উভয়েই ভয় পেয়ে এত বড় হাঁ করেছে যে মনে হয় তারা হাঁ করার প্রতিযোগিতা শুরু করেছে।

প্রঃ ২৩। 'তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়ী-শুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল।'—চোরটি কে? তাকে দেখে প্রত্যেকের মুখ শুকিয়ে গেল কেন?

উঃ। চোরটি প্রকৃতপক্ষে চোর নয়—তিনি বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচার্য।

ছদ্মবেশী শ্রীনাথ বহুরূপীর ব্যাঘ্ররূপ ধারণ এবং তার 'হুম্' শব্দে যখন চতুর্দিকে 'দক্ষযজ্ঞ' বেধে গিয়েছিল, সেই সময় একজন ভীত-ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করছিল। দেউড়ির সিপাহীরা তাকে চোর সন্দেহে প্রচণ্ড প্রহার করতে করতে আধমরা করে আলোর সামনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। ঐ আলোতে চোরের মুখ দেখে প্রত্যেকের মুখ শুকিয়ে গেল। বস্তুতঃপক্ষে হৈ-চৈ গণ্ডগোলের মধ্যে বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচার্যকেই চোর সন্দেহে প্রহার করা হয়েছে।

প্রঃ ২৪। 'লাও' তো বটে, কিন্তু আনে কে!—মন্তব্যটি কার? কি আনতে বলা হয়েছে? নিম্নরেখ শব্দটির অর্থ কি?

উঃ। মন্তব্যটি 'মেজদা' গল্পের (শ্রীকান্ত উপন্যাসের একটি অংশ) কথক শ্রীকান্তের।

শ্রীকান্তের পাশের বাড়ির গগনবাবুর একটি মুঙ্গেরি গাদা বন্দুক ছিল, পিসেমশায় বাঘ মারবার জন্য চীৎকার করে তাই আনতে বলছেন।

'লাও' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে হিন্দী শব্দ 'লে আও'। 'লে আও' একত্রে উচ্চারিত হয়ে 'লাও রূপ ধারণ করেছে। এর অর্থ 'নিয়ে এস'।

প্রঃ ২৫। 'উহার ল্যাজ কাটিয়া দাও'।—উক্তিটি কার? তিনি কি কারণে কার ল্যাজ কাটতে বলেছেন?

উঃ। উক্তিটি শ্রীকান্তের পিসেমশাইয়ের।

পিসেমশাই শ্রীনাথের ব্যাঘ্ররূপী ছদ্মবেশটির লেজ কাটতে বলছেন। প্রকৃতপক্ষে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি এমন আদেশ করেছেন। শ্রীনাথের মতো একজন বহুরূপী এতজন মানুষকে নাস্তানাবুদ করেছে, ইন্দ্রনাথের মতো ছোট্ট একটি বালক তাঁদের উদ্ধারকর্তার রূপ ধারণ করেছে, তদুপরি তাঁদের পৌরুষের উপর পিসিমার ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য। এই সমস্ত কারণ যুক্ত হয়ে পিসেমশাইকে ভীষণ ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। এরই ফলশ্রুতি উপরিউক্ত আদেশটি।

প্রঃ ২৬। 'ছেলেটি যে ডাক্তারের কাছে গেল সৌভাগ্যক্রমে তিনি লুই পাস্তুর ও তাঁর আবিষ্কারের কথা শুনেছিলেন'।—ছেলেটি কে? সে ডাক্তারের নিকট কেন গিয়েছিল? লুই পাস্তুর কি আবিষ্কার করেছিলেন?

উঃ। ছেলেটির নাম জোসেফ মিস্টার।

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাকে পাগলা কুকুরে কামড়েছিল। পাগলা কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয় এবং তাতে মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য সে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল।

কিন্তু জলাতঙ্ক রোগের কোন ঔষধ ঐ ডাক্তারের জানা ছিল না, তবে সৌভাগ্যক্রমে তিনি লুই পাস্তুরের আবিষ্কারের কথা শুনেছিলেন। লুই পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগ নিবারণের এক সিরাম তৈরী করেছিলেন।

প্রঃ ২৭। 'সংবাদটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল'—উক্তিটি কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত ? কোন্ সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল ? কি ভাবে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল ?

উঃ। উক্তিটি চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত 'লুই পাস্তুর' নামক প্রবন্ধের অন্তর্গত।

লুই পাস্তুর যে জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক সিরাম আবিষ্কার করেছেন, এই সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

জোসেফ মিস্টার নামে একটি স্কুল-প্রত্যাগত বালক কুকুরের কামড়ে আহত অবস্থায় ডাক্তারের কাছে গেলে, তিনি তাকে লুই পাস্তুরের কাছে পাঠান। পাস্তুর মিস্টারকে জলাতঙ্ক রোগ নিবারক সিরামটি প্রয়োগ করলেন, দিনের পর দিন ইন্‌জেকশন দিলেন, শেষ পর্যন্ত ছেলেটির আর জলাতঙ্ক রোগ হল না। এই ভাবে সংবাদটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

প্রঃ ২৮। 'একমাত্র জীব থেকেই জীবের উৎপত্তি হয়, লোকের এ ধারণা ভুল'—এই তথ্য কে ঘোষণা করলেন ? এই তথ্য কি নির্ভুল ?

অথবা, 'পাউসেটের সিদ্ধান্ত ভুল'—পাউসেট কে ?—তাঁর সিদ্ধান্তটি কি ? ঐ সিদ্ধান্তে কি ভুল ছিল ?

উঃ পাউসেট একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক ছিলেন।

ইনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, একমাত্র জীব হতেই জীবের উৎপত্তি। এ ধারণা ভুল।

পাউসেটের এই সিদ্ধান্ত যে ভুল লুই পাস্তুর তা একটি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিলেন।

প্রঃ ২৯। 'ফরাসী দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক কে, এ সম্বন্ধে...একবার ভোট নেওয়া হয়েছিল'—এই ভোটের ফলাফলে কে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন ?

উঃ। ফরাসীদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ লোক নির্বাচনের ব্যাপারে একবার ভোট গ্রহণ করা হয়। বহুসংখ্যক লোক এই নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। এই ভোটের ফলাফলে দেখা যায়, লুই পাস্তুর প্রথম, নেপোলিয়ন দ্বিতীয় এবং ভিক্টর হুগো তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

প্রঃ ৩০। 'মনে হল আমি দিব্যচক্ষু পেয়েছি'—'আমি' কে ? 'দিব্যচক্ষু' শব্দটির অর্থ কি ? দিব্যচক্ষু পেলে কি হয় ?

উঃ। এখানে 'আমি' 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধের লেখক এস. ওয়াজেদ. আলি।

দিব্যচক্ষু শব্দটি অর্থ দেবতার অলৌকিক চক্ষু—যা সাধারণের দৃষ্টির অগোচর দিব্যচক্ষু তাও দেখতে পায়।

দিব্যচক্ষুর সাহায্যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান দৃষ্টিগোচর হয়। বস্তুতঃ পক্ষে এ অন্তরের উপলব্ধি—অনেকে একে জ্ঞানচক্ষু বা প্রজ্ঞাচক্ষুও বলেন।

প্রঃ ৩১। 'আমি দিব্যচক্ষু পেয়েছি'—কি ভাবে বক্তা দিব্যচক্ষু লাভ করলেন? দিব্যচক্ষুর সাহায্যে তিনি কি দেখলেন?

উঃ। দিব্যচক্ষুর কাছে কোন কিছুই অগোচর থাকে না; এ দেবতাদের অলৌকিক শক্তি। লেখক দিব্যচক্ষুর সাহায্যে—এই ক্ষেত্রে অন্তরের উপলব্ধির সাহায্যে প্রকৃত ভারতবর্ষের শাশ্বত রূপটি অনুধাবন করলেন। ভারতীয় জীবনধারা যে সর্বকালেই সনাতনপন্থী এবং অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত একই গতিতে প্রবহমান, তাই তিনি দিব্যচক্ষুর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করলেন।

প্রঃ ৩২। স্মিত আস্যে বৃদ্ধ বললে...'আমার ঠাকুরদাদা এটি কিনেছিলেন।' 'আস্য' শব্দটির অর্থ কি? বৃদ্ধের ঠাকুরদাদা কোথা থেকে কি কিনেছিলেন? উক্ত পুস্তকটির মূল লেখকের নাম কি?

উঃ। 'আস্য' শব্দটির অর্থ 'মুখ'।

বৃদ্ধের ঠাকুরদাদা বটতলা থেকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ কিনেছিলেন।

উক্ত পুস্তকটির মূল লেখকের নাম বাল্মীকি।

প্রঃ ৩৩। 'সেই অপূর্ব ক্রিয়াকাণ্ডের কথা শুনে ছেলেদের মুখ আনন্দে আগ্রহে আর উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠত'।—কোন্ রচনার অন্তর্গত এই উক্তিটি? কোন্ ছেলেদের কথা এখানে বলা হয়েছে? কি অপূর্ব ক্রিয়াকাণ্ড তারা শুনত?

উঃ। আলোচ্য উক্তিটি 'ভারতবর্ষ' রচনার অন্তর্গত।

মুদির দোকানের যে বৃদ্ধটি রামায়ণ পাঠ করত, তার পুত্র এবং নাতি-নাতনিদের কথা এখানে বলা হয়েছে।

ঐ বৃদ্ধ রামায়ণের 'সেতুবন্ধন' অংশটি পাঠ করতেন। রামচন্দ্র কী করে বানর সেনার সাহায্যে সমুদ্রের উপর সেতু বেঁধে লংকায় পৌঁছেছিলেন, তাই সেতুবন্ধনের মূল বিষয় ছিল। এই বিষয়টিকেই অপূর্ব ক্রিয়াকাণ্ড বলা হয়েছে।

প্রঃ ৩৪। 'ও রকম কোরো না, ঐ জন্যে তোমায় কোথাও আনতে চাই না।'—এখানে কার কথা বলা হয়েছে? কে উক্তিটির বক্তা? এই তিরস্কারের ফলে কি হয়েছিল?

উঃ। এখানে অপুর কথা বলা হয়েছে।

উক্তিটির বক্তা অপুর পিতা হরিহর।

পিতার মৃদু তিরস্কারের ফলে অপুর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

প্রঃ ৩৫। 'আমি দেখে যাব, আমি কখ্খনো দেখিনি—হাঁ—বাবা?'—বক্তা কে? সে কি দেখতে চেয়েছিল? দেখবার জন্য তার এত ঔৎসুক্য কেন?

উঃ। অপু আলোচ্য উক্তিটির বক্তা।

পিতার সঙ্গে রাস্তায় বের হয়ে রেলের রাস্তা দেখে সে রেলগাড়ি দেখতে চেয়েছিল।

রেলের রাস্তা এবং রেল দেখা অপুর জীবনের বহুদিনের কামনা। রেলের রাস্তা তার নিকট বিরাট বিস্ময় বহন করে আনত। এই লাইনের ওপর দিয়ে যে রেলগাড়ি যায়, স্বভাবতঃ তা দেখবার জন্য সে ঔৎসুক্য বোধ করল।

পাঠ-সংকলন

পদ্যাংশ

প্রশ্ন ১। পাঠ-সংকলন গ্রন্থের মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত দশটি কবিতার নাম, কবির নাম এবং কোন মূল থেকে ঐ সমস্ত রচনা উদ্ধৃত হয়েছে বল।

উত্তর। রচনার নাম	কবির নাম	মূল গ্রন্থের নাম
শ্রীরামের অত্রিমুনির আশ্রম গমন	কৃত্তিবাস	অরণ্যকাণ্ড (রামায়ণ)
দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র	কাশীরাম দাস	সভাপর্ব (মহাভারত)
ইন্দ্রজিতের যজ্ঞগৃহে লক্ষ্মণ	মধুসূদন দত্ত	মেঘনাদবধ
মধ্যাহ্নে	অক্ষয়কুমার বড়াল	শঙ্খ
পুরাতন ভৃত্য	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কথা ও কাহিনী
ধূলামন্দির	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	নৈবেদ্য
হাট	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	মরীচিকা
ত্রিরত্ন	কালিদাস রায়	আহরণ
কাণ্ডারী হুঁশিয়ার	নজরুল ইসলাম	সর্বহারা
কালবৈশাখী	মোহিতলাল মজুমদার	হেমন্ত গোধূলি

প্রঃ ২। সম্মুখে দেখেন 'অত্রিমুনির আশ্রম'—অত্রিমুনি কে? সেই আশ্রমে কারা গিয়েছিলেন?

উঃ। অত্রিমুনি সপ্তর্ষিগণের অন্যতম। কথিত আছে যে স্বয়ং ব্রহ্মার চক্ষু থেকে তাঁর উৎপত্তি। ঋক্ এবং অথর্ববেদে তাঁর উল্লেখ আছে।

শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে করে অত্রিমুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন।

প্রঃ ৩। 'সকল সম্পদ মম দূর্বাদল শ্যাম'—সম্পদ কথাটির সাধারণ অর্থ কি? এখানে বিশেষ অর্থে সম্পদ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

উঃ। সম্পদ শব্দটির সাধারণ অর্থ ঐশ্বর্য বা বিত্ত-বৈভব।

বর্তমান বাক্যাংশে 'সম্পদ' কথাটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। সাধারণ রমণীর নিকট পার্থিব ঐশ্বর্যই সম্পদ। কিন্তু সীতার ন্যায় রমণীর কাছে তাঁহার স্বামীই সম্পদ—সে স্বামীর যে অবস্থাই হোক না কেন।

প্রঃ ৪। 'ছায়া ছায়া কত ব্যথা'—এই ব্যথা কার মনে জেগেছিল? এই ব্যথাকে 'ছায়া-ছায়া' বলে বর্ণনা করা হয়েছে কেন?

উঃ। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল যখন গ্রীষ্মের নির্জন দুপুরে নদীতীরে বিশ্রাম করছিলেন তখন তাঁর মনে এই ব্যথা জেগেছিল।

মধ্যাহ্ন কালে কবির মনে অব্যক্ত এক বেদনার সঞ্চার হয়েছে। এই বেদনা যে কিসের, কবি তা বুঝতে পারছেন না। কেবল এর অস্পষ্ট অনুভূতি তাঁর মনকে সুদূরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই অস্পষ্ট বেদনাই কবির ভাষায় ছায়া ছায়া।

প্রঃ ৫। 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার কবির নাম কি? এই কবির অন্য কোন্ কোন্ কবিতা তুমি পাঠ করেছ? এই কবির একখানা পৃথিবীবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম কর। ঐ গ্রন্থটি পৃথিবীবিখ্যাত হওয়ার কারণ কি?

উঃ। কবির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আষাঢ়, দুইবিঘা জমি, ওরা কাজ করে, দুর্ভাগা দেশ।

'গীতাঞ্জলি' কাব্যটি রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

এই কাব্যের জন্য কবি নোবেল পুরস্কার পান। সেইজন্য এই কাব্য কবির বিশ্বব্যাপী খ্যাতির কারণ হ'য়ে আছে।

প্রঃ ৬। পুরাতন ভৃত্য কে? তাহার পুরা নাম কি?

উঃ। পুরাতন ভৃত্য কেষ্ট বা কেষ্টা।

তার পুরা নাম কৃষ্ণকান্ত। ('কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক সাজিয়া আনে')

প্রঃ ৭। 'যত পায় বেত, না পায় বেতন'—বেত পাওয়া মানে কি? বেতের সঙ্গে বেতনের কি সম্পর্ক? এখানে কার সম্বন্ধে কে এরূপ উক্তি করেছেন?

উঃ। বেত একপ্রকার লতা। বেতলতা খুব শক্ত; সহজে ভাঙ্গে না। বেত দিয়ে আঘাত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং বেত পাওয়া অর্থ শারীরিক শাস্তি লাভ করা।

বেতের সঙ্গে বেতনের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এখানে আছে। কেষ্ট যে পরিমাণ শাস্তি ভোগ করত বেতন পেত সে পরিমাণে অনেক কম। তবুও সে কাজ করত।

এখানে পুরাতন ভৃত্য কেষ্ট সম্বন্ধে তার প্রভু এই উক্তি করেছেন।

প্রঃ ৮। 'কোথা হাহন্ত, চিরবসন্ত, আমি বসন্তে মরি'—কা'র উক্তি? চিরবসন্ত কি? 'বসন্তে মরি' কথার তাৎপর্য কি?

উঃ। কেষ্টর প্রভুর উক্তি।

চিরবসন্ত মানে চিরকাল ব্যাপিয়া বসন্ত ঋতু। অর্থাৎ যে দেশে বা স্থানে বছরের সব মাসেই বসন্ত বিরাজ করে তাকে চিরবসন্তের স্থান বলা হয়। লোকের বিশ্বাস, রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে চিরবসন্ত বিরাজ করে।

চিরবসন্তের দেশে বসন্তের আরাম ভোগ করতে গিয়ে কেষ্টর প্রভু বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন অবস্থায় এই অক্ষেপোক্তি করেছেন।

প্রঃ ৯। 'আয়রে ধূলার পরে'—ধূলার পরে কি আছে? সেখানে কাকে আসতে বলা হচ্ছে? [illegible] এলে কি পাওয়া যাবে?

উঃ। ধূলার পরে [illegible]দেবতা আছেন। সেখানে বিশ্বজগতের অনন্ত কর্মধারা প্রবাহিত। চাষী, মজুর সকলে সেখানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটছে।

যে ঈশ্বর-সাধক রাতদিন অন্ধকার দেবালয়ে চক্ষু বুজে ধ্যাননিমগ্ন আছেন তাঁকে ধুলামাটির কর্মক্ষেত্রে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

কর্মচঞ্চল পৃথিবীর ধুলায় ভক্ত নেমে এলে মানুষের ভগবান অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিত দেবতাকে সে দেখতে পাবে। কারণ রৌদ্রজলে, ধুলোকাদায় শ্রমজীবীদের মধ্যেই তিনি বিরাজ করছেন।

প্রঃ ১০। 'ওরে মুক্তি কোথায় পাবি'—কারা মুক্তি চাইছে? 'মুক্তি' কথাটির অর্থ কি? মুক্তি পাওয়া সহজ নয় কেন?

উঃ। যারা এই জগতে সারাজীবন রোগশোক, জরা-ব্যাধি কবলিত তারাই মুক্তি চায়।

অনেক মানুষ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তারা পুনর্বার পৃথিবীতে জন্মলাভ করতে চায় না বলে মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করে। জাগতিক দুঃখ যন্ত্রণা হতে নিষ্কৃতি লাভ করে মানুষ যখন পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয় তখনই মুক্তিলাভ ঘটে বলা যায়।

ঈশ্বরের কাছে মুক্তি চাইলেই পাওয়া যায় না। বিশ্বের বহুবিধ কর্মকাণ্ডের নায়ক তো তিনিই। বিপুল বন্ধন তিনি নিজে রচনা করেছেন, আবার তিনি নিজেও সেই বন্ধনে আবদ্ধ আছেন। তাই মনে হয় জীবন-বিমুখ মুক্তি তাঁরও কাম্য নয়।

প্রঃ ১১। 'বসেছে একাকী রথীন্দ্র'—রথীন্দ্র কথাটির মূল অর্থ কি? কার সম্বন্ধে এই শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে? তার একাকী বসবার কারণ কি?

উঃ। রথীন্দ্র কথাটির অর্থ শ্রেষ্ঠ রথী বা ইন্দ্রতুল্য রথী। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তেমনই রথ চালনায় এবং যুদ্ধবিদ্যায় যিনি পারদর্শী—তাঁকে রথীন্দ্র বলা হয়।

মধু কবির প্রিয়নায়ক ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদের বীরত্ব অতুলনীয়। তিনি দেবদৈত্য-নরত্রাস, মহাবলী। যুদ্ধে তাঁর তুলনা হয় না। তাঁকে বোঝাবার জন্য রথীন্দ্র শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অতি সংগোপনে আপন ইষ্টদেবের পূজায় মহাধ্যানে ইন্দ্রজিৎ নিমগ্ন। তাই তিনি সেখানে একাকী বসে আছেন।

প্রঃ ১২। 'মারি অরি, পারি যে কৌশলে'—উদ্ধৃত বাক্যাংশটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত? কথাটি কে বলেছিলেন? যাকে বলা হচ্ছে তিনি কিরূপ অবস্থায় ছিলেন?

উঃ। উদ্ধৃত বাক্যাংশটি মহাকবি মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদবধ' কাব্য-গ্রন্থের ষষ্ঠ সর্গের অন্তর্গত 'ইন্দ্রজিতের যজ্ঞগৃহে লক্ষ্মণ' শীর্ষক অংশের অন্তর্গত।

লক্ষ্মণ যখন যজ্ঞাগারে এসে ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে বললেন তখন

ইন্দ্রজিৎ তাঁকে কিছুসময় অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁর কথা মানতে প্রস্তুত নন জানিয়ে এই উক্তিটি করেছিলেন।

ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতার পূজার্চনায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁর পরিধানে ছিল পূজার সাজ—চতুর্দিকে ছিল পূজার নানা উপকরণ। তিনি তখন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় ছিলেন।

প্রঃ ১৩। 'ত্রিরত্ন' কবিতাটি কোন্ কবির রচনা? এই কবির আর কোন্ কোন্ কবিতা তুমি পড়েছ?

উঃ। 'ত্রিরত্ন' কবিশেখর কালিদাস রায়ের রচনা।

'ছাত্রধারা' 'বিদ্যালয়ের পথে' 'মহুয়াগাছ' পড়েছি।

প্রঃ ১৪। ত্রিরত্ন কে, কে? তাঁদের মধ্যে কা'কে তোমার বেশী ভাল লাগে? কেন?

উঃ। 'ত্রিরত্ন' কবিতায় সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামীকে ত্রিরত্ন বলা হয়েছে?

আমার সনাতন গোস্বামীকে খুব ভাল লাগে।

তিনি সকলকে স্নেহ করতেন এবং ক্ষমা করতে পারতেন ব'লে আমার তাঁকে ভাল লাগে।

প্রঃ ১৫। 'চারিচক্ষুর ধারায় তিতিল বৃন্দাবনের রজ,'—চারিচক্ষু বলতে কা'র কা'র চোখের কথা বলা হয়েছে? 'তিতিল' শব্দের মানে কি? বৃন্দাবন কোথায় এবং কিজন্য বিখ্যাত?

উঃ। এখানে রূপ ও জীব গোস্বমীর চোখের কথা বলা হয়েছে।

তিতিল শব্দের অর্থ ভিজিল।

বৃন্দাবন উত্তরপ্রদেশের একটি শহর। শহরটি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের লীলাভূমি ব'লে হিন্দুদের বিশেষ ক'রে বৈষ্ণবগণের পবিত্র তীর্থস্থান।

প্রঃ ১৬। 'যাত্রীরা হুঁশিয়ার'—এই যাত্রীরা কারা? কে তাদের হুঁশিয়ার করেছেন? কোন্ কবিতা হতে এই বাক্যাংশটি গৃহীত হয়েছে?

উঃ। দেশের সাধারণ মানুষ যারা দেশের পরাধীনতা দূর করবার কাজে কৃতসংকল্প, তারাই এই যাত্রী।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম এদের জাতীয় আন্দোলনের মহা বাধা-বিপদের মধ্য দিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে চলতে নির্দেশ দিচ্ছেন।

বাক্যাংশটি দেশপ্রেমিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গীতিকবিতা 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' হ'তে গৃহীত।

প্রঃ ১৭। 'ঐ পলাশির প্রান্তর'—পলাশি কোথায়? সেই প্রান্তরে কি হয়েছিল?

উঃ। নদীয়া জেলার অন্তর্গত, ভাগীরথীর তীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র জনপদের নাম পলাশি।

পলাশির আম্রকুঞ্জে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন ইংরেজ পক্ষীয় সৈন্যদের সঙ্গে নবাব সিরাজের সৈন্যদের যুদ্ধ বেধেছিল। সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাবের পতন হয়—সঙ্গে সঙ্গে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়।

প্রঃ ১৮। 'নিত্য নাটের খেলা'—নাটের খেলা কি? তাকে নিত্য বলা হয়েছে কেন? এই খেলা কোথায় কি ভাবে হয়?

উঃ। 'নাটের খেলা' অর্থাৎ নাটকাভিনয়। খেলার মতই আনন্দদায়ক এবং মনোরঞ্জক এই নাটক। নট বা অভিনেতাগণ তাঁদের দক্ষতা দ্বারা এই খেলা দেখান।

নাট্যমঞ্চের অভিনয়ের মতই পৃথিবীরূপ মঞ্চে নিত্যনূতন খেলা জমে ওঠে। প্রাত্যহিক জগতে অর্থাৎ ভবের হাটে নিত্যযাত্রী মানুষের দল প্রবেশ করে, আবার খেলা সাঙ্গ হলে বিদায় নেয়। এই খেলা নিত্য চলছে।

ভবের হাটে এই নিত্যনাটের খেলা চলছে। এই পৃথিবীর চিরন্তন চিত্র। মঞ্চের অভিনেতাদের মতই প্রবেশ ও প্রস্থান চলছে এখানে। মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে, পৃথিবীতে জীবন কাটিয়ে বেলাশেষে বিদায় নিয়ে চলে যায়।

প্রঃ ১৯। 'কাল-বৈশাখী' কবিতাটি কোন্ কবির রচনা? কালবৈশাখী বলতে কি বুঝ?

উঃ। 'কাল-বৈশাখী' কবিতাটি কবি মোহিতলাল মজুমদারের রচনা।

চৈত্র-বৈশাখ মাসের বিকালবেলায় প্রচণ্ড ঝড়সহ বৃষ্টিকে কালবৈশাখী বলে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এবং শীতের প্রারম্ভে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রবাহ বইতে শুরু করে। এই দুই বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহের সংঘর্ষে বঙ্গোপসাগরে ঝড়বৃষ্টি ও ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয়। একে পশ্চিমবঙ্গে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে কাল-বৈশাখী বলা হয়।

॥ পাঠ-সংকলন থেকে ভিন্ন জাতীয় কয়েকটি উদাহরণ ॥

প্রঃ ১। নিম্নোধৃত পংক্তিগুলি তোমার পাঠ্যান্তর্গত কোন্ কোন্ গদ্যাংশে বা পদ্যাংশে পেয়েছো তা রচয়িতার নাম সহ উল্লেখ কর:

(ক) শুচি হল তার দিগ্বিজয়ীর পরশে অশুচি রজ।

—**ত্রিরত্ন (কালিদাস রায়)**

(খ) করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।

—পুরাতন ভৃত্য (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(গ) আমাদের গ্রহবৈগুণ্যে বাঁকেনি, চোরেনি, নড়ে যায় নি : আমাদের জিও-গ্রাফিতে তার যেখানে স্থান ঠিক সেই জায়গাটিতে সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

—ভানুসিংহের পত্র (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(ঘ) তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিকে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিসাবে তুমিও একজন দেশ আবিষ্কারক।

—অচেনার আনন্দ (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

(ঙ) বুকের পাখায় আলোক লুকায় ছাড়িয়া পুবের মাঠ।

—হাট (যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

(চ) দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী, নিত্য নাটের খেলা।

—হাট (যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

(ছ) কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক সাজিয়া আনে।

—পুরাতন ভৃত্য (রবীন্দ্রনাথ)

(জ) নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহ 'পরে।—

—পুরাতন ভৃত্য (রবীন্দ্রনাথ)

(ঝ) মুদে আসে আঁখি পাতা যেন কী আরামে।

—মধ্যাহ্নে (অক্ষয়কুমার বড়াল)

(ঞ) খসে খসে পড়ে পাতা মনে পড়ে কত গাথা

—মধ্যাহ্নে (অক্ষয়কুমার বড়াল)

(ট) এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া।

—মেজদা (শরৎচন্দ্র)

(ঠ) লাও তো বটে, কিন্তু আনে কে! —মেজদা (শরৎচন্দ্র)

(ড) জীবনে এই প্রথম বাধাহীন, গণ্ডিহীন, মুক্তির উল্লাসে তাহাদের তাজা তরুণ রক্ত তখন মাতিয়া উঠিয়াছিল...

—অচেনার আনন্দ (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

(ঢ) আমাদের ভাগ্যদেবতা বিনা অনুমতিতে আমাদের এ গাড়িতেও চড়ে বসেছেন। —ভানুসিংহের পত্র (রবীন্দ্রনাথ)

(ণ) কিন্তু কী অমায়িক ছিলেন এই জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী।

—লুই পাস্তুর (চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য)

প্রঃ ২। নিম্নলিখিত চরিত্রগুলি তোমার পঠিত কোন্ গদ্যাংশে বা পদ্যাংশে আবির্ভূত হয়েছে তা রচয়িতার নাম সহ উল্লেখ কর :

রূপ, সনাতন, জীব, দুর্গা, ছিনাথ, কেষ্ট, দ্বারিকবাবু, গগনবাবু, নেপোলিয়ন, হুগো।

উঃ। রূপ, সনাতন ও জীব—ত্রিরত্ন (কালিদাস রায়)। দুর্গা —অচেনার আনন্দ (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। ছিনাথ—মেজদা (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। কেষ্ট—দুই বিঘা জমি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। দ্বারিকবাবু, গগনবাবু—মেজদা (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়); নেপোলিয়ন, হুগো—লুই পাস্তুর (চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য)।

প্রঃ ৩। 'মধ্যাহ্নে' কবিতাটিকে কি জাতীয় কবিতা বলা যেতে পারে ?

উঃ। নিসর্গমূলক কবিতা।

প্রঃ ৪। কবিতাটি কে লিখেছেন ? ঐ কবির লেখা অন্য কোন কবিতা পড়েছ কি ?

উঃ। অক্ষয়কুমার বড়াল ; হ্যাঁ, শ্রাবণে।

প্রঃ ৫। 'হাট' কবিতাটিকে কি জাতীয় কবিতা বলা যায় ? কেন এই শ্রেণী-বিভাগ তা দু' একটি কথায় বুঝিয়ে দাও।

উঃ। রূপক কবিতা। মানবজীবনের সঙ্গে হাটের সাযুজ্য কবি দেখিয়েছেন।

প্রঃ ৬। 'ভানুসিংহের পত্র' রবীন্দ্রনাথের কোন্ গ্রন্থের অন্তর্গত ? ভানুসিংহ কে ? তিনি কোথা থেকে কাকে এই পত্র লিখেছিলেন ?

উঃ। ভানুসিংহের পত্রাবলী ; রবীন্দ্রনাথ ; ব্রুকসাইড, শিলং থেকে ফণীন্দ্রনাথ অধিকারীর কন্যা রানুকে এই পত্র লিখেছিলেন।

প্রঃ ৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কোনো রচনা কি তুমি পাঠ-সংকলনে পড়েছো ? ঐ রচনাটি হরপ্রসাদের কোন্ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ?

উঃ। হ্যাঁ, পড়েছি—সমুদ্র পথে। ঐ রচনাটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা 'বেণের মেয়ে' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

প্রঃ ৮। 'লুই পাস্তুর' প্রবন্ধটির রচয়িতা কে ? উক্ত প্রবন্ধটি লেখকের কোন্ বইতে আছে বলতে পারো ?

উঃ। লুই পাস্তুর প্রবন্ধটির রচয়িতা চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। এই প্রবন্ধটি লেখকের 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী' থেকে গৃহীত হয়েছে।

প্রঃ ৯। 'দিবসের ভাগে টানিয়া খুলিছে বেণীবন্ধন সন্ধ্যার'—সন্ধ্যা কে ? কে তার বেণী দিনের বেলাতেই টেনে খুলছে ?

উঃ। এইখানে সন্ধ্যা বলতে কোন মেয়ের কথা বোঝানো হয় নি ; দিবা ও রাত্রির সন্ধিকালকে সন্ধ্যা বলে।

কালবৈশাখী সন্ধ্যার বেণী দিনের বেলাতেই টেনে খুলছে অর্থাৎ দিনের বেলাতেই সন্ধ্যা লেগে গেছে।

প্রঃ ১০। কালপুরুষের সুগভীর পরামর্শ।—কালপুরুষ কে? তাহার সুগভীর পরামর্শ বলিতে কি বুঝ?

উঃ। কালপুরুষ বলতে এখানে মহাকালকে বুঝানো হয়েছে। কালবৈশাখীর রুদ্রলীলার মধ্য দিয়েই মহাকাল পৃথিবীর বুকে নব জীবনের বীজ অংকুরিত করে তোলেন।

প্রঃ ১১। 'এটা রেখে দাও, তোমার কাজে লাগবে'—উক্তিটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? মূল গ্রন্থটি কি? লেখকের নাম কি? উক্তিটি কে কাকে করেছেন?

উঃ। উক্তিটি 'মেজদা' নামক রচনাংশ থেকে করা হয়েছে। মূল গ্রন্থের নাম শ্রীকান্ত (১ম পর্ব)। লেখকের নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উক্তিটি পিসিমা পিসেমশাইকে করেছিলেন।

[প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করতে পারেন ঐ পিসিমা কার পিসিমা? উত্তর হবে, শ্রীকান্তের পিসিমা (শরৎচন্দ্রের নয়)।]

প্রঃ ১২। 'একটি কুকুর একটি মেষপালককে তাড়া করছে—মেষপালকটি বাধা দিচ্ছে'—উক্তিটি কোন্ রচনার অংশ? প্রসঙ্গটি কি বলো তো?

উঃ। লুই পাস্তুর; লুই পাস্তুরের স্মরণে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্তির বিষয়-বস্তু এটি।

প্রঃ ১৩। লুই পাস্তুর জগদ্বিখ্যাত কেন?

উঃ। জলাতঙ্ক রোগের কারণ এবং নিবারণের পদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য।

১৪। **শূন্যস্থান পূর্ণ কর।**

ক) ......মেঠো পথ দিয়া

খ) ......উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে......

গ) তপস্যা করিয়া গায়ত্রী......

ঘ) ......দূর্বাদল শ্যাম

উঃ। মূল কবিতা দ্রষ্টব্য। ক—মধ্যাহ্নে। খ—হাট। গ-ঘ—শ্রীরামের অত্রিমুনির আশ্রম গমন।

সহায়ক পাঠ থেকে

।। গদ্য পাঠ ।।

আমাদের মূল গ্রন্থে কি ভাবে গদ্য পাঠ করতে হবে, তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আছে। উদাহরণও দেওয়া আছে অনেক। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নতুন সিলেবাস অনুসারে কেবলমাত্র সহায়ক পাঠ (গদ্য) থেকেই গদ্য পাঠ জিজ্ঞাসা করা হবে। আমরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নির্বাচিত প্রতিটি সহায়ক পাঠ থেকেই কিছু নিদর্শন দিয়ে দিচ্ছি। ছাত্রছাত্রীরা সার্থক গদ্য পাঠের নিয়ম অনুসারে এগুলি পাঠ করলে সাফল্য লাভ করবে।

।। জীবনস্মৃতি ।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃষ্ঠা

॥ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ॥

স্বামী বিবেকানন্দ

॥ রামায়ণী কথা ॥

দীনেশচন্দ্র সেন

।। আচার্য বাণী চয়ন ।।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

।। আপন কথা ।।

সম্পাদনা ঃ

দক্ষিণারঞ্জন বসু

সহায়ক পাঠ

পদ্য হতে আবৃত্তি

সার্থক কবিতা বা নাট্যাংশ আবৃত্তির নিয়মাবলী আধুনিক মৌখিক বাংলা গ্রন্থের প্রথমে বিস্তারিত ভাবে উদাহরণ সহযোগে আলোচিত হয়েছে।

(দ্রঃ পৃঃ ১-৬৯, ৯১-১১৪)।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিয়মানুসারে আবৃত্তি কেবলমাত্র সহায়ক পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আমরা প্রতিটি সহায়ক পাঠ হতেই কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করে ছন্দ বিভাগ করে দেখিয়ে দিচ্ছি। কবিতাগুলির মূল অর্থ প্রশ্নোত্তর বিভাগে আলোচিত হয়েছে। উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীরা প্রয়োজন বোধ করলে তা দেখে নেবে।

॥ কবিতা সংকলন ॥

পাঠ্যসূচীতে ২০টি কবিতা আছে। ছাত্রছাত্রীদের প্রতিটি কবিতাই আবৃত্তির জন্য মুখস্থ রাখতে হবে। আমরা এখানে কয়েকটি কবিতার কিছু অংশ ছন্দবিভাগ করে দেখিয়ে দিচ্ছি। ছাত্রছাত্রীরা ঐ বিভাগ অনুযায়ী থামবে এবং কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ করবে।

ওরা কাজ করে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(দ্রঃ পৃঃ ৭৯—কবিতা সংকলন)

অলস/সময়ধারা/বেয়ে
মন চলে / শূন্য পানে / চেয়ে
সে মহাশূন্যের পথে / ছায়া আঁকা ছবি পড়ে / চোখে
কত কাল দলে দলে / গেছে কত লোকে
সুদীর্ঘ অতীতে /
জয়োদ্ধত প্রবল / গতিতে।
এসেছে সাম্রাজ্য লোভী / পাঠানের দল,
এসেছে মোগল /
বিজয় রথের / চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল / উড়িয়াছে বিজয় / পতাকা।

[গদ্যছন্দে রচিত কবিতাটির প্রতিটি পংক্তির অর্থ বুঝে সেই অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রিত করবে। (দ্রঃ পৃঃ ৩৯) মূল গ্রন্থ]

দুর্ভাগা দেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(দ্রঃ পৃঃ ৭৭—কবিতা সংকলন)

হে মোর দুর্ভাগা দেশ / যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে / তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে / বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে / তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে / তাহাদের সবার সমান। (৮ + ১০)
[কণ্ঠস্বরে কারুণ্য ও দৃঢ়তা একসঙ্গে ঝরে পড়া চাই।]

জাতির পাঁতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(দ্রঃ পৃঃ ১২০ – কবিতা সংকলন)

জগৎ জুড়িয়া / এক জাতি আছে / সে জাতির নাম / মানুষ জাতি,
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত / একই রবি শশী / মোদের সাথি।
শীতাতপ ক্ষুধা / তৃষ্ণার জ্বালা / সবাই আমরা / সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলি / ডাঁটো করে তুলি / বাঁচিবার তরে / সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও / বাসর বাঁধি গো / জলে ডুবি, বাঁচি / পাইলে ডাঙা
কালো আর ধলো / বাহিরে কেবল / ভিতরে সবারি / সমান রাঙা।
[৬ মাত্রার ছন্দ]
[কণ্ঠস্বরে একই সুরের রেশ থাকবে, কেবল প্রতি পর্বে অল্প থামতে হবে—দ্রঃ পৃঃ ৩৮ মূল গ্রন্থ]

বাংলা মা

নজরুল ইসলাম

(দ্রঃ পৃঃ ১৬৩—কবিতা সংকলন)

(আমার)—শ্যামলা বরণ / বাংলা মায়ের / রূপ দেখে যা, / আয় রে আয়
গিরি দরী / বনে মাঠে / প্রান্তরে রূপ / ছাপিয়ে যায়
ধানের ক্ষেতে / বনের ফাঁকে / দেখে যা মোর / কালো মাকে,
ধূলি-রাঙা / পথের বাঁকে / বৈরাগিনী / বীন বাজায়!! [৪ মাত্রায় ছন্দ]
[কণ্ঠস্বরে ছড়া পড়বার ভঙ্গী থাকবে—অনেকটা নাচের ভঙ্গী]

রানার

সুকান্ত ভট্টাচার্য

[কবিতাটি মূল গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। দ্রঃ পৃঃ ৩৪—মূল গ্রন্থ]

শ্রাবণে

অক্ষয়কুমার বড়াল

(দ্রঃ পৃঃ ৬৯—কবিতা সংকলন)

সারাদিন একখানি / জল ভরা কালো মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া / আকাশ ;
বসে জানালার পাশে / সারাদিন আছি চেয়ে—
জীবনের আজি অব/কাশ। (৮ মাত্রার ছন্দ)

(আবৃত্তিকারের কণ্ঠে বর্ষার পটভূমিতে কবির যে নীরব ঔদাস্য তা' ফুটে ওঠা চাই)।

চাঁদ সদাগর

কালিদাস রায়

(দ্রঃ পৃঃ ১৪৭— কবিতা সংকলন)

দেবতা মন্দিরে ভরা / সিন্দুর চন্দনে গড়া
বাণী তীর্থে উচ্চে তুলি / শির
তুমি দেবতারো বড়ো / এ যুগের অর্ঘ্য ধরো
বন্দি সাধু চন্দ্রধর / বীর। [৮ মাত্রার ছন্দ]

[কণ্ঠস্বরে এমন গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলতে হবে, যার মধ্য দিয়ে চন্দ্রধরের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাবে]

॥ কথা ও কাহিনী ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(পাঠ্যসূচী অনুযায়ী 'কথা ও কাহিনী'র প্রতিটি কবিতাই আবৃত্তির জন্য মুখস্থ রাখতে হবে। ভালো আবৃত্তি করতে গেলে কবিতার মূল অর্থ বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। কবিতাগুলির মূল অর্থ আমরা প্রশ্নোত্তর বিভাগে আলোচনা করেছি। এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতার ছন্দ বিভাগ করে দেওয়া হলো)।

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

(দ্রঃ পৃঃ ১১—কথা ও কাহিনী)

"প্রভু বুদ্ধ লাগি / আমি ভিক্ষা মাগি"
ওগো পুরবাসী / কে রয়েছ জাগি—
অনাথ পিণ্ডদ / কহিলা অম্বুদ-
নিনাদে !

সদ্য মেলিতেছে / তরুণ তপন
আলস্যে অরুণ / সহাস্য লোচন
শ্রাবস্তীপুরীর /গগন লগন
প্রাসাদে [৬ মাত্রার ছন্দ]

[কবিতার শুরুতেই আবৃত্তিকারের কণ্ঠে অনাথপিণ্ডদের অম্বুদ-নিনাদ অর্থাৎ মেঘের আওয়াজের মত গাম্ভীর্য ফুটে ওঠা চাই ; সঙ্গে সঙ্গে থাকবে প্রার্থনার আভাস।]

প্রতিনিধি

(দ্রঃ পৃঃ ১৬—কথা ও কাহিনী)

বসিয়া প্রভাতকালে / সেতারার দুর্গভালে
শিবাজী হেরিলা / এক দিন—
রামদাস, গুরু তাঁর / ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার
ফিরিছেন যেন / অন্নহীন। (৮/৮/৬ মাত্রা)

[সম্পূর্ণ কবিতাটিই এই ছন্দে রচিত। আবৃত্তি বিলম্বিত লয়ে অর্থাৎ কণ্ঠস্বর টেনে টেনে করতে হবে।]

ব্রাহ্মণ

(দ্রঃ পৃঃ ২১—কথা ও কাহিনী)

অন্ধকার বনচ্ছায়ে / সরস্বতী তীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য ; / আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম মাঝে / ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ ভার / করি আহরণ
বনান্তর হতে ; / (৮/৬ মাত্রা)

[আবৃত্তিকার কণ্ঠস্বরে যথোচিত দৃঢ়তা নিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করবে]

মস্তক বিক্রয়

(দ্রঃ পৃঃ ২৬—কথা ও কাহিনী)

কোশল নৃপতির / তুলনা নাই,
জগৎ জুড়ি / যশোগাথা
ক্ষীণের তিনি/সদা শরণ/ঠাঁই
দীনের তিনি/পিতামাতা। [৭/৫/৫ মাত্রা]

[খুব সহজ সুরের কবিতা। কবিতাটিতে অনেক সংলাপ আছে। সংলাপ উচ্চারণের সময় কণ্ঠস্বরে কথা বলার ভংগী আনতে হবে।]

পূজারিণী

(দ্রঃ পৃঃ ৩১—কথা ও কাহিনী)

নৃপতি বিম্বি/সার
নমিয়া বুদ্ধে/মাগিয়া লইলা
পাদনখ কণা/তাঁর।
স্থাপিয়া নিভৃত/প্রাসাদ কাননে
তাহারি উপরে/রচিলা যতনে
অতি অপরূপ/শিলাময়ী স্তূপ
শিল্প শোভার/সার। [৬ মাত্রার ছন্দ]

[আবৃত্তিকারের কণ্ঠস্বরে প্রার্থনায় আকুতি ফুটে ওঠা চাই! কবিতাটিতে কয়েকটি চরিত্র আছে—ঐ চরিত্রগুলির মুখের সংলাপ আবৃত্তিকারের কণ্ঠে এমন ভাবে প্রকাশ হওয়া চাই যেন চরিত্রগুলির পার্থক্য ধরা পড়ে।]

অভিসার

(দ্রঃ পৃঃ ৩৭—কথা ও কাহিনী)

সন্ন্যাসী উপ/গুপ্ত
মথুরাপুরীর/প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন/সুপ্ত—
নগরীর দীপ/নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ/পৌর ভবনে,
নিশীথের তারা/শ্রাবণ গগনে
ঘন মেঘে অবলুপ্ত। [৬ মাত্রার ছন্দ]

[কবিতাটির অধিকাংশ পংক্তিতেই গাম্ভীর্যপূর্ণ কিছু শব্দ আছে। সেগুলির যথাযথ উচ্চারণ করতে হবে। সংলাপের ক্ষেত্রে যেরকম কণ্ঠস্বর আবৃত্তিকারের কণ্ঠে থাকবে, যেখানে প্রকৃতির রুদ্র রূপের বর্ণনা আছে সেখানে তার পরিবর্তন চাই।]

দেবতার গ্রাস

(দ্রঃ পৃঃ ১৪৩—কথা ও কাহিনী)

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা/রটি গেল ক্রমে
মৈত্রমহাশয় যাবে/সাগরসংগমে
তীর্থ স্নান লাগি।/সংগীদল গেল জুটি
কত বালবৃদ্ধ নরনারী/; নৌকাদুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে।/ [৮/৬ মাত্রা]

[কবিতাটি বেশ করে পড়ে বুঝে আবৃত্তি করতে হবে। অর্থ অনুযায়ী কণ্ঠস্বর

বিশ্রাম পাবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ভাবটি পংক্তিটির শেষে সমাপ্ত না হয়ে পরবর্তী পংক্তি পর্যন্ত যাতায়াত করছে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে আবৃত্তিকার আবৃত্তি করবে।]

জুতা আবিষ্কার

[দ্রঃ পৃঃ ১৬৪—কথা ও কাহিনী]

[এই কবিতায় জুতা আবিষ্কারের কাহিনী হাস্য ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে।—যেখানে বিখ্যাত পণ্ডিত, রথী-মহারথী বুদ্ধির দৌড়ে পরাজিত হলেন, সেখানে সামান্য একজন চর্মকার জুতা আবিষ্কার করলো। !

কবিতাটি পাঁচ মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দের।—কবিতাটি বিলম্বিত লয়ে টেনে টেনে আবৃত্তি করতে হবে। সংলাপাংশ নাটকীয় ভঙ্গিতে আবৃত্তি করতে হবে। অর্থানুযায়ী আবৃত্তিকারের কণ্ঠ হাস্য এবং ব্যঙ্গের ছোঁয়ায় যেন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আবৃত্তিকারকে মনে রাখতে হবে হাস্যমুখর বর্ণনার ক্ষেত্রে সে নিজে যেন হেসে না ফেলে।]

কহিলা হবু/শুন গো গোবু/রায়,
কালিকে আমি/ভেবেছি সারা/রাত,

মলিন ধুলা/লাগিবে কেন/পায়
ধরণী-মাঝে/চরণ ফেলা/মাত্র

তোমরা শুধু/বেতন লহ/বাঁটি,
রাজার কাজে/কিছুই নাহি দৃষ্টি।

আমার মাটি/লাগায় মোরে/মাটি,
রাজ্যে মোর/একি এ অনা/সৃষ্টি।

শীঘ্র এর করিবে প্রতি/কার,
নহিলে কারো/রক্ষা নাহি/আর।

।। মায়ামুকুর ।।

কাজী নজরুল ইসলাম

[ভূমিকা অংশের জন্য এই গ্রন্থের কবিতা সংকলন (পৃঃ ৬৯) বা কথা ও কাহিনীর (পৃঃ ৭১) আবৃত্তি অংশ দ্রষ্টব্য]

ছাত্রসঙ্গীত

(পৃঃ ১)

জাগোরে অরুণ / জাগোরে ছাত্র/দল
স্বতঃ উৎসারিত / ঝর্ণাধারার / প্রায়—
জাগো প্রাণ চঞ্চ/ল ।।
ভেদ বিভেদের / গ্লানির কারা / প্রাচীর
ধূলিসাৎ করি / জাগো উন্নত / শির
জবাকুসুম / সংকাশ জাগো / বীর। [৬ মাত্রার ছন্দ]

মায়ামুকুর

(পৃঃ ২)

তোমার মনের / মায়া মুকুরে কি
দেখেছ নিজের / মুখ,
যে মায়ামুকুরে / নিজেরে দেখিতে
এ বিশ্ব উৎ/সুক। [৬ মাত্রার ছন্দ]

চল্ চল্ চল্

(পৃঃ ৬)

চল্ চল্ চল্ !
ঊর্ধ্ব গগনে / বাজে মাদল
নিম্নে উতলা / ধরণী তল
অরুণ প্রাতের / তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে / চল্
চল্ চল্ চল্। [৬ মাত্রার ছন্দ]

জাতের বজ্জাতি

(পৃঃ ১৩)

জাতের নামে বজ্জাতি সব/ জাত জালিয়াত / খেলছে জুয়া।
ছুঁলেই তোর / জাত যাবে ? / জাত ছেলের / হাতের নয় তো / মোয়া
হুঁকোর জল আর / ভাতের হাঁড়ি / ভাবলি এতেই / জাতির জান,
তাইত বেকুব, / করলি তোরা / এক জাত্কে / এক শ' খান!

[৪ মাত্রার ছন্দ]

প্রলয়োল্লাস

(পৃঃ ২৭)

[আধুনিক মৌখিক বাংলা গ্রন্থের ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

ভাঙার গান

(পৃঃ ৪৫)

কারার ঐ / লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল / কররে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল-পুজোর / পাষাণ-বেদী। [৪ মাত্রার ছন্দ]

অভিশাপ

(পৃঃ ৭৪)

(আমি) বিধির বিধান / ভাঙিয়াছি, আমি / এমনি শক্তি/মান
(মম) চরণের তলে / মরণের মার / খেয়ে মরে ভগ/বান। [৬ মাত্রার ছন্দ]

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

(পৃঃ ৭৬)

দুর্গম গিরি / কান্তার মরু / দুস্তর পারা/বার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে / যাত্রীরা, হুঁশি/য়ার [৬ মাত্রার ছন্দ]

এ মোর অহঙ্কার

(পৃঃ ৮১)

নাই বা পেলাম / আমার গলায় / তোমার গলার / হার,
তোমায় আমি / করব সৃজন / এ মোর অহংকার। [৬ মাত্রার ছন্দ]

পূজারিণী

(পৃঃ ১২)

মাগো তোমার / অসীম মাধুরী
বিশ্বে পড়েছে / ছড়ায়ে,
তোমার আঁখির / স্নিগ্ধ লাবণী
ঝরিছে গগন /গড়ায়ে। [৬ মাত্রার ছন্দ]

শেষ প্রার্থনা

(পৃঃ ৯৩)

আজ চোখের জলে / প্রার্থনা মোর / শেষ বরষের / শেষে
যেন এমনি কাটে / আসছে-জনম / তোমায় ভালো/বেসে
এমনি আদর / এমনি হেলা
মান অভিমান / এমনি খেলা,
এমনি ব্যথার / বিদায় বেলা
এমনি চুমু / হেসে,
যেন খণ্ড মিলন / পূর্ণ করে / নতুন জীবন / এসে। [৬ মাত্রার ছন্দ]

॥ গাথা মঞ্জরী ॥

কালিদাস রায়

[ভূমিকা অংশের জন্য এই গ্রন্থের কবিতা সংকলন (পৃঃ ৬৯) বা কথা ও কাহিনী (পৃঃ ৭১) আবৃত্তি অংশ দ্রষ্টব্য]।

লালাবাবুর দীক্ষা

(পৃঃ ১)

সিত মর্মরে খচি' / বিরাট দেউল রচি
আর্ত আতুর তরে / খুলি দানসত্র,
গড়িয়া অনাথশালা / সার করি ঝোলামালা
ভক্তগণের নামে / লিখি দানপত্র,
লালাবাবু বৈরাগী—/ গুরু করণের লাগি
সারা পথ ভরি ভেট—/ উপহার পুঞ্জে,
বাবাজী কৃষ্ণদাস / যেখানে করেন বাস
একদা এলেন সেই / নিভৃত নিকুঞ্জে। [৮ মাত্রার ছন্দ]

জামার প্রাপ্য

(পৃঃ ৮)

ধনীর বাড়ীতে/জন্মতিথিতে/কবির নিমন্ত্রণ,
দেখিলেন কবি/তাঁহারে কেহ না/করিল আপ্যা/য়ন।
রুখু শুখু কেশ/বড় দীনবেশ/তালিগারা পিরি/রান,
ফিরিলেন কবি/কিছু নাহি খেয়ে/পেয়ে শুধু অপ/মান।
[৬ মাত্রার ছন্দ]

কৃষ্ণার প্রতিহিংসা

(পৃঃ ১৯)

সাঙ্গ কুরুক্ষেত্র রণ/সর্বশ্বান্ত বিজয়ী পাণ্ডব
অশ্রুসিন্ধুতলে মগ্ন/সাফল্যের আনন্দ উৎসব।
দগ্ধ করে যুধিষ্ঠিরে/এ জয়ের নিদারুণ জ্বালা,
রণলক্ষ্মী পরায়েছে/কণ্ঠে তাঁর কণ্টকের মালা। [৮।১০ মাত্রা]

ক্রীতদাস

(পৃঃ ২৪)

বোগ্‌দাদ পথে/করেন ভ্রমণ/লোকমান পণ্‌/ডিত
জীর্ণ-বসন/শীর্ণ শরীর/কদাকার কুৎ/সিত।
নিজ পলাতক/ক্রীতদাস ভেবে/ধনী এক নাগ/রিক
গৃহে নিয়ে এসে/তাঁহারে প্রহার/করিল অত্য/ধিক। [৬ মাত্রার ছন্দ]

বাবরের মহত্ত্ব

(পৃঃ ৪০)

পাঠান-বাদশা/লোদী
পাণিপথে হত।/দখল করিয়া/দিল্লীর শাহী/গদি,
দেখিল বাবর/এ জয় তাহার/ফাঁকি,
ভারত যাদের/তাদেরি জিনিতে/এখনো রয়েছে/বাকি। [৬ মাত্রার ছন্দ]

ত্রিরত্ন

(পৃঃ ৬০)

এল দিগ্‌জয়ী/দিগ্‌গজ বীর/পণ্ডিত ব্রজধামে,
যেন রণমদে/মত্ত দন্তী/পঙ্কজ বনে/নামে।
অশ্বমুণ্ডে/উড়ায়ে ঝাণ্ডা/চারণ ফুকারি/চলে,
চতুর্দোলায়/পণ্ডিত দোলে/বিজয়মাল্য/গলে। [৬ মাত্রার ছন্দ]

কুরুক্ষেত্র

(পৃঃ ৭৮)

দুর্ভিক্ষের/দারুণ প্রকোপে ছারখার হ'ল/দেশ
সহিতে না পারি/দেখিতে না পারি/প্রজার দারুণ/ক্লেশ
নৃপতি সংবরণ।
পশিলেন বনে/তপস্যা তরে/ত্যজিয়া সিংহাসন। [৬ মাত্রার ছন্দ]

সাবিত্রী বাই

(পৃঃ ৮৮)

বেলভাডি গড়ে/সাবিত্রী বাই/হুঙ্কারি কয়/"রাঘব রাও,
লুণ্ঠন করে/কারা চলে যায়/সন্ধান নিয়ে/মোরে জানাও/
নিরীহ শান্ত/গ্রামবাসীগণ—
তাদের অন্ন/করে লুণ্ঠন
কোন দস্যুরা/গর্জিয়া চলে/পথরোধ কর/ত্বরায় যাও।"
[৬ মাত্রার ছন্দ]

প্রকাশভঙ্গী ও বাচনভঙ্গী

মৌখিক পরীক্ষায় প্রকাশভঙ্গী, বাচনভঙ্গী ইত্যাদির জন্য ৫ নম্বর নির্দিষ্ট করা আছে। এই নম্বরের সম্পূর্ণটা কি ভাবে পাওয়া যেতে পারে তার বিস্তারিত আলোচনা আমাদের মূল গ্রন্থে [আধুনিক মৌখিক বাংলা] আছে। (পৃঃ ১৬২-৬৩)। ছাত্র-ছাত্রীরা উক্ত অংশটি মনোযোগ সহকারে পড়লে প্রার্থিত সফলতা অর্জন করবে।